

অলকা

“যতোঋতং ত্রয়মুৎপত্তাঃ পানপা নিতাপুত্ৰা

হংসশেষী রচিতদর্শনা নিত্যপথা মলিষ্ঠাঃ ।

কেকোৎকষ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যাস্বৎকলপা

নিত্যজ্যোৎস্না প্রতিহততমো বৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ ॥”

—মেঘদূত ।

প্রথম বর্ষ]

কামুন, ১৩২৮

[১ম সংখ্যা]

সূচনা

পূজাপাদ ৬রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়
একবার মাসিক পত্রের আয়ুত্বান হিসাব
করিয়া ঠিক করেন যে, বাঙ্গলা দেশের শিশু
যেমন শতকরা ৫০টি স্ত্রীতিকাগারেই ভবলীলা
সংবরণ করে, বাঙ্গলা সাহিত্যে মাসিক পত্রও
শতকরা ৯৫ খানা জন্মিয়াই য়ে। “অলকা”
বাঙ্গলা সাহিত্যের মাসিক পত্র, তবে আশা
এই—ইহার জন্য বাঙ্গলার বাহিরে; তা'
ছাড়া বরাহমিহিরের মত মানাই ভাল,—

দ্বাদশ বর্ষ না কাটিলে শিশুর কোষ্ঠীনির্ণয়
বিড়ম্বনা মাত্র।

“অলকা” নিজের কথা শুনাইবে।

বাঞ্জে কথা বা কাজের কথা বলিবে না।

“অলকা”র উদ্দেশ্য “কান্তাসম্বিত্ততরোপ-
দেশযুজ্জ”—কান্তার ভায় রসহৃষ্ট দ্বারা
পাঠকে নিজ প্রতিপাত বিষয়ের প্রতি
আকর্ষণ করিবে। এই উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়,
যদি “অলকা”র জন্ম সার্থক।

আগমনী

[বঙ্গদেশ]

ভরে, মরণ এসেছে দেশে !

সুখ ভূষিত শুই চেয়ে আছে

কিমনী গোপীর দেশে ।

মস্তকে জটা-কটপটি দোলে,

আপক-চন্দন-বাগানে ফোলে,

হস্তে-বাঁধে, শাশী-বোনে

নাচন বেলে-বাঁধে ।

কহে-গোপী-দেশে ।

কোন-অসকার-অকমিত-বাণী

কোন্-মরণ-মাজি ;

কিনেব-লাগিয়া-মস্তক-জর

হেন-চিৎকর-মাক !

বিরতি-কর-না-মরণ-মাজি,

অকমিত-এক-প্রবল-দেশী,

সমস্ত-বাক্যে-এ-বিশেষ-অশ্রি-

মাজি-বাক্য ।

এ-মরণ-মাজি-বিশেষ-করি

অমরণ-অকমিত-বাক্য ।

এ-মরণ-মাজি-বিশেষ-দেশী

অকমিত-মাজি-বাক্য ।

এ-মরণ-মাজি-বিশেষ-দেশী,

এ-মরণ-মাজি-বিশেষ-দেশী,

এ-মরণ-মাজি-বিশেষ-দেশী,

এ-মরণ-মাজি-বিশেষ-দেশী ।

কাঙন, ১৩২৮]

স্বাগমনা

কেদী তরুণীর হিয়ার কমলে

কুটিল নিচোরা নাম ;

যেব তরি বুঝি ভোগেছিল কা'র

কি গোপন অভিলাষ ।

কনক দণ্ডতলা গৃহ জরি

কা'র হাণ্ডকার উজ্জ্বল প্রমত্তি

কৌম উত্তম পণ্ডিত কনকী,-

অশিষ্ট তরুন কাম ।

আর কে বিদ্যা, পদ্য ত সে বদ্বি

ভাষা র কবিতা কাম ।

প্রিয়তার মিলন চাখিছে চোখে

বসন্ত মায়ার কাম ।

বয়সা লোভে প্রমত্ত পদ্য,

যে চাক চপ পতি ব কুরাগ,

মুখে দিবে তোর সখি দণ্ড,-

সুদীর্ঘের হাণ্ডকার ।

বসন্ত-মরণ পলক বদ্বি

কনক দণ্ড গৃহময়,

কৌমের কোণে, কবিতা কাম

মিলন-স্বাগমনা ব্যক্তি ।

মাতা অলকা নিয়ে আর টানি,

দগনে ভবনে হোক জ্বালাজ্বনি,

অটল প্রেমের বিদ্রোহ-স্বাগি

গাহ গোরব-নাড়ি ।

বাকালী সাহিত্যের গতি

[অধ্যাপক শ্রীমন্তেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এম্-এ]

কবিশূন্য বাঙ্গলার কবি-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মিলন" লিখিয়া তাহা বাস্তবে পরি-
কৃত করিবার জন্য "বিষভারতী", হান্সেনের
প্রচার প্রতী হইয়াছেন। এতদিন তিনি ফুলের
চার করিয়াছেন, ফুলের স্বপ্নে ও গুহ্যেই মুগ্ধ
ছিলেন, এখন দেখিতেছি তিনি কলাকাজী
হইয়াছেন। শরৎবাণুরও 'বাঙ্গলার কথা'র
এই ফুলের আঁকাঙ্ক্ষাই দেখি—কেননা ইহা
রাজনীতি, সমাজনীতি। "শ্রীকান্ত" পুনরায়
দেখা দিয়াছেন। তবে তাঁর "কেন্দ্র-প্যাণ্ডনা"
শৌর্য হইবে কবে? ওরিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
স্বদেশীয় তৎকালী সপ্তগ্রাম ও বৌদ্ধধর্মের কথা
তদ্বাদিহা এখন ঢাকার সংস্কৃত সাহিত্যের
আলোচনার ব্যস্ত হইলেন। এমন কি 'কোয়ারা'
'পাগলা কোয়ারা'র রসস্বষ্টির পর ললিতবাবু তত্ত্ব
কথায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, বাং রসধারার
বাঙ্গালী সাহিত্য সজীবিত, আজ তিনি
বহির্মুখের ক্যালোচনার স্মৃতি ও গতির
পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু অ্যন-
সের কোয়ারা কি আর খুলিবে না?
সাহিত্যিক এখনও যে সেতার আশা রাখে।
কবী শ্রীমন্তেন্দ্রনাথ পাণ্ডাভা ও ভারতীয়
কবিতা কলমের সমালোচনা করিতেছেন,
সাহিত্যিকের বাক্যনির্ভর আভ্যন্তরীণনাথ
প্রকাশ্যেই কথ্যবিষয়, তবে কবালী সাহি-
ত্যের সর্বত্র ললিতকরেন। রাখে রাখে
'তত্ত্ববোধিনী' ও 'ভারতী'তে তাঁদের দেখা
গই। এই বেশ পুরাতন কথা।

বাঙ্গালী মানিকের দিকে তাকাইলে
প্রথমেই চোখে পড়ে "সবুজ পত্র"। এ বৎসর
গরম বড় বেশী ছিল, কাল্লের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
ও আষাঢ়ের পাতাগুলো পীত হইয়া বরিয়া
গিয়াছিল। সমগ্র বর্ষার রস সঞ্চয়ের পর
প্রাণে যখন সবুজপত্র দেখা দিল, মনে
হইল সবুজ আর শুকাইবে না। কিন্তু
কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ শেষ হইল—
সবুজ আবার অন্তর্জান হইয়াছে। এই
মানিকখানিই বাঙ্গালী সাহিত্যের "Nine-
teenth Century"। যে পরে প্রমথ চৌধুরী,
সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী ও অতুল গুপ্তের
অতুলনীয় প্রবন্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনের
খাদ্য যোগাইয়া আসিতেছে—অকালে তাহার
অবসান হইলে যে সাহিত্যের সমুদ্র কতি হইবে
সে বিষয়ে অগুমান সন্দেহ নাই।

তার পর চোখে পড়ে "এবাসী"।
প্রবাসের কীটকায় এবাসী আজ দেশে
ফিরিয়া বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। "এবাসী"
শুধু ফুল ফুটিয়া সন্তুষ্ট নহে, কাবের কথা
বলিতেছে। গত বৎসর হইতে "মহিলা
মজলিস" ও "ছেলেদের পাতাডী" বোগ
করিল। মানিকখানি সঙ্গীতের আশ্রয়ের
জিনিষ হইয়াছে। "ভারতবর্ষ" গল্পমাগন—
শরৎ বাবু ইহার বিশ্লেষকরী। "ভারতবর্ষ"ও
অনেক নতুন চিন্তা বহন করিতেছে। "উল্লিখিত"
প্রভৃতি প্রবন্ধে বাঙ্গালীর অর সঙ্কায়ের
উপায় বলিয়া দিতেছে। "মানসী ও কবিতা"

তেছে না। তবে আশা আছে একদিন
তাদের—

—“তাব পাবে রূপের মাঝারে অক্ষ
অসীম পাবে সীমার নিষিদ্ধ সখা।”

কিন্তু নারীর মাঝে নতুন দাড়া পাইতেছি
—মনে হয় Bernard Shaw's manly
woman দেখা দিচ্ছে। শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী,
শ্রীমতী রমলা ও শ্রীমতী সত্যাবালা বিদ্রোহের
ধ্বজা উড়াইয়াছেন। গত আশ্বিনের
‘ভারতবর্ষ’ বার্নি পড়িলেই বুঝিতে পারি যে,
নারীর মুখে ভাষা ফুটিয়াছে—দাম্পত্যের
বস্ত্রের ভাষা হুসু ভাসাইয়া ছুটিয়াছে তাদের
জালাময়ী লেখনী। হৃৎ, বেশনা, অপমান
বস্ত্র তীর হৃৎ, তার প্রকাশ ও তত ভীষণ, এ
যেন আত্মক্লেশের প্রস্রবণ। রশ্মিয়ার কণা
ভাবিলেই তাতা বুঝিতে পারি। দাম্প-
ত্যের অ-স্বাক্ষণের আন্দোলন, বাঙ্গালীর
নয়ঃশুভ্রের আবেদন—নারীর অধিকারের দাবি
ধেখিলেই বুঝিতে পারি Genesis
আসল। কবির অমর বাণী কেবলই কাণে
বাজে—

বারে তুমি নীচে ফেল তা তোমারে
বংশবৈশ্যে নীচে।

পক্ষান্তে রেবেছ বারে সে তোমারে
পক্ষান্তে টানিছে।

অজ্ঞানের অন্ধকারে

আড়ালে ঢাকিছ বারে

তোমার মঙ্গল ঢাকি পড়িছে সে খোর
ব্যবধান।

সত্যই ও আশঙ্কাজনক হাতে আমাদের
অদঃশতন আনিয়াছি। আজ এই চারি জন
শিক্ষিতা নারীকেই যে কল্যাণে বসিতে চাই-

তেছেন তার মধ্যে অনেকখানি ফাঁকি আছে,
আর আছে ঘেঁষ, ঘেঁষ ও বাধা। কিন্তু একটা
বড় জিনিষও আছে সেটা হিন্দুসমাজে নারীর
উপযুক্ত আসন পাইবার উদ্যম আকাঙ্ক্ষা।
এই রাগর, বেগের মধ্যে হয় ত অনেক
অসত্য আছে তাহা স্বাভাবিক। আমাদের
তর্কবিপ্লবজেরা বিবাদমান অবস্থায় বিকল্প
হট্টন যে ভাষা ব্যবহার করেন, তার তুলনায়
নারীর এই প্রকাশ সংযত। তাঁহারা অনেক
কথা বলিয়াছেন—কাণে বড় কটু লাগিতেছে
কেমনা কথাটা শুন। কিন্তু শিক্ষার প্রসারের
সঙ্গে সঙ্গে নারী যে নিজের প্রাপ্য অধিকার
সমাজের নিকট কাঁচিয়া লইবেন ইহাতে
ফেরান সম্ভব নাই। ‘বঙ্গদর্শনের’ নবীনা
ও প্রবীণাকে মনে পড়ে—সে শূন্য ছিল
ভৈরবী, আশাবরী, কিন্তু রমলা, জ্যোতির্ময়ী
ও সত্যাবালা যে শূন্য তুলিয়াছেন তাহা এক-
কাণে দীপক। আশা আছে এই আশ্রিত
সমাজের সার্বজনীন রান্না পুষ্টিরা একদিন
মন্ত্রারের বধনে বাঙ্গলার পনাজ নতুন ঐ
ধারণ করিবে।

তার একদিকে ছর বাজিতেছে পতিতার
প্রতি কল্যাণ—তীব্র প্রেম। নবীন সেনের
‘আমার জীবনে’ (১ম ভাগ) এই কল্যাণের
স্বপ্নপাত, এবং “নারায়ণের” বৃক্ষে পণিকা-
তদের প্রতিষ্ঠা। শরচ্চন্দ্রের ‘চন্দ্রমুখী’ (দেবদাস)
নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের ‘বিলাস’ (নাটক)
নরেশ সেনের চাঁপা (স্তম্ভ) আর ক্ষীরোদ
বাবুর চাঁপা (পতিতার সিদ্ধি) পতিতার
প্রতি সমবেদনায় পূর্ণ। সমাজ পতিতার
প্রতি যে ঘৃণা দেখাইয়া বাহ্যরী লম্ব,
পতিতা ততটা ঘৃণার পাত্রী নয়। এটি

ভারতেই এমন একদিন ছিল যখন এই পতিতা সমাজের হাতেই রাজকন্ডার শিক্ষা ও culture-এর তার দেওয়া হইত (বাৎসরিক যুগে তাহার খবর পাই)। বসন্তদেনা কথা কহেন সংগে, কিন্তু রাজকন্ডার রাজ-কন্ডা বা ঋষিকন্ডা কথা কহিতেন প্রাকৃত (সংস্কৃত নাটকে তাহার বর্ণেই প্রমাণ পাওয়া যায়)। সেই গুণ চারুকণ্ড বসন্তদেনাকে পক্ষ পক্ষীপ্রেম প্রদান করিতে সক্ষম হইন নাই। Otto winninger-এর মৌলিক গবেষণার ফল Sex and character বইখানা পড়িলে বুঝিতে পারি কেন শুধে Pericles ও Socrates Aspasia-এর গুণে আনন্দ পায়।

কিন্তু সেখানে একটা অসমক ভাবনা। গৌরবের পরামর্শ ফুটে, জীবনঃ জুলাদপি এত পোকা কথা। নরনারী যে অকণ্ঠে যথোপযুক্ত না কেন, যেদিন মনেব মন্দিরে সেবতা আশ্রয়—সেদিন বিদগ্ধন চিত্রামণির অভিনয় হয়। কিন্তু বিদগ্ধন ও চিত্রামণি কি ভগ্নতে হুল্লভ নয়? Watson একটা কবিতার ফাইলোজেন একজন পরজন্মকান্তরা পতিতা একজন হৃদয়হীনা স্ত্রীর চেয়ে বড়—এ কথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু পতিতা সমাজকে বরণ করাও ত চলে না। জানি নর্দমা ছদ্ম বস্ত্র হইলে অইলিকা ভূমিসাৎ হয়, কিন্তু নর্দমার উপকবিতা স্বীকার করিলেই তাহাকে ত বরণ করিতে পারি না। পতিতা সমাজ রানি বহন করিয়া সমাজকে সাঁচাইয়া রাখিয়াছে—এই Safety valve না থাকিলে সমাজের অবস্থা কি হইত বলা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া পতিতার পূজা চলিতে পারে না। হতভাগিনী

Mary Magdalene-এর প্রতি করুণার খণ্ডের ব্যবহার আমাদের মরণ বাণী হইয়াছে। কিন্তু কই Mary Magdalene-এর পূজা হয় না, পূজা হয়—Madonna। জানি David is the man after God's heart, কণাছিন্ন দায় বড় হে। কিন্তু তাই বলিয়া Davidকে প্রেম দিতে পারি না। কিন্তু নব্যতন্ত্রের লেখকরা পতিতার বহুলা এমন করে নাহিতোছেন, এমনভাবে এই—সদ্য উক্তো পূজাধিনি দ্বিগুণ যাবত পাইক পূজিকা-এর মিক। পতিতার বড়ই লোভনীয় বসন্ত হইয়া উঠিতেছে। ইহা নাহিতোর পক্ষে কবিতা, সমাজ-ব্যবহার অতিকূল। সাহিত্যকে এই 'পতিতা-প্রীতি'র হাত হঠতে বন্ধ করা অসম্ভব প্রয়োজনীয়। আর দীর্ঘ মনে করেন—যে পতিতার উদ্ধার প্রয়োজন, সময়ে সময়ে তাহাদের কথাও মনে করা উচিত। তবে প্রথমে যেন ঐটি পরিষ্কার করা হয়—পতিতার 'পতিতা' কবিতা ও কবিতা গল্প বিবাদী, Maurice Maeterlinck-এর Mary Magdalene এবং গিরিশচন্দ্রের 'বিদগ্ধন' এ বিষয়ে আশ্রয়, যেখানে সেখান পূর্ণমণির সংস্পর্শে কাচা ও হীরকে পরিণত হইয়াছে।

এই পতিতার প্রীতির মূলে একটা কথা আছে—সাহিত্যে বস্তুত্ব বা Realism-এর স্থান। এই সব লেখকেরা Emil Zola নাম কবিতা লোহাই দিগুন যে তাঁরা কবিতা কবিতার নিষ্ঠুর ছবি তুলিতেছেন। করানী দেশে এই লড়াই কত লড়াই হইয়া গিয়াছে, বাংলা দেশেও প্রথম জেঁদুরী ও অগ্যাপক রাধাকমলের বস এতনও ছলি

[illegible]

সেখিতেছি আমাদের দেশের বন এখন
এক জীবনের আশ্রয়। বাকিইয়াছে যেমন
হইতে কেরা অসম্ভব। এই Crossingএর
মূলে নানা পথ, আমল কেরা পথে চলিবে ?
রাজনীতিক্ষেত্রে, নবায়ন, সাহিত্যে নববর্ষ জীবন
হইয়া উঠিতেছে—ইহাকে নবজ্ঞ করিতে
হইবে, প্রেমের পথ হাফিজ। প্রেমের পথ
বাহিয়া নইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে
নবদীপ উদ্ভাসিত হইলে এই বাত প্রতিকার।
এই মানা মতের নববর্ষের মধ্যে 'স্বদেশ-পু
জা' দেখা যাইক ইহা চকান পথ বাহিয়া
গয়।

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের ভূমিকা

[অধ্যাপক শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম-এ]

(১) সূচনা

পাঠক বন্ধে 'প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন' নাম শুনিয়া মনে না করেন আমি কোন অভিনব দর্শন প্রণালীর স্বরূপাত করিতেছি। প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন মূলত জিনিষ নহে, ইহা ভারতীয় চিন্তা রাজ্যের একটি অতি প্রাচীন এবং দৃষ্টি সঙ্গী। কালের বিচিত্র গতিতে আজ ইহা অপরিচিত প্রাচীন ইহা সেও এক দিন ইহার প্রভাব যে ভারতীয় সাধন কেন্দ্রের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা 'আমাদের সভ্যতার বিশিষ্ট ধারা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে হৃদয় তাহে পর্যালোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহারা প্রত্যভিজ্ঞা-বাদের মহৎ সহজেই ধারণা করিতে পারি-
 যেন। নিগম ও আগম, অথবা বেদ ও ভক্ত, ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি, এখানে সে বিভা-
 রের প্রয়োজন নাই; কিন্তু এ কথা ক্রম সভ্য-
 যে এই বিশেষ ও আগমের মধ্যেই ভারতবর্ষের
 সনাতন সাধনার বীজ নিহিত রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতকে "নিগম কল্লতরু"র "পলিত
 ফল" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—আমায়
 মনে হয় এক বর্ণনা আংশিক সত্য, কারণ
 ভাগবত যেমন নিগমের, তেমনই আগম, কল-
 তরুও "পলিত ফল"। শাকুরাজী আমকে
 বাহ্যে কুহুমিত, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাই পরি-
 পক রসবহুল ফলরূপে পরিণত। সেইজন্য
 প্রত্যভিজ্ঞা শিষ্যের আগমের শৈবাম্বার,

সামুদ্রত রূপ স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন
 করিয়া সৌভীদ্য বৈষ্ণবগণ 'অচিন্ত্য ভেদান্তের
 রূপ' অপূর্ণ দার্শনিক সিদ্ধান্তের অবতারণা
 করিয়াছেন। সঙ্কম, যামিনী বিজয় প্রভৃতি
 আগম এবং তৈত্তিরীয় সংহিতা প্রভৃতি নিগম
 সমুদ্র মধ্য পূর্বক কাশ্মীরীয় শৈবগণ সেই
 প্রকার 'ঐশ্বর্যবাদ' রূপ প্রোচ্ছল স্বরূপার
 আবিষ্কার করিয়াছেন। উভয়ই ভারতীয়
 সাধনার গৌরবস্তম্ভ।

(২) নামকরণ

'প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন' নামটি যে খুব পুরাতন
 তাহা নহে। কাঞ্চাকাচার্য সর্বদর্শন সংগ্রহে
 এই নামটি সঙ্গপ্রথম প্রয়োগ করিয়াছেন
 এবং আমরাও তাহারই অনুসরণ করিয়া এই
 নামই গ্রহণ করিয়াছি। প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন,
 ঐশ্বর্যপ্রত্যভিজ্ঞাবিশিষ্ট প্রকৃতি প্রাচীন
 গ্রন্থের নামকরণে প্রত্যভিজ্ঞা শব্দের ব্যাক্যার
 আছে বটে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তাহা ভাষ্য
 বৈশেষিক প্রকৃতির মতন দার্শনিক সিদ্ধান্ত
 বিশেষের স্বাক্ষর নহে। স্তর নামকরক গোপাল
 তাণ্ডারকার বলিয়াছেন যে কাশ্মীরীয় শৈব-
 গণ হই 'ভাগে বিভক্ত—প্রথম, স্পন্দ শাস্ত্র;
 দ্বিতীয়, প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্র। স্পন্দ শাস্ত্রের
 প্রত্যয়ক ইহা শুণ্ড এবং প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্রের
 প্রত্যয়ক সোমানন্দ। এই বিভাগ ঐতিহাসিক
 দৃষ্টিতে কিরূপে সত্য হইলেও বিচার দৃষ্টিতে
 দাঙ্গিমূলক। কারণ স্পন্দ ও প্রত্যভিজ্ঞা

প্রতিনিধিক গ্রন্থে অবাক হই একটি বিষয়ে
কিঞ্চিদাত্মক যত্নভেদের অভাব থাকিলেও
উভয় শাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত ও আলোচনা
প্রণালীতে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। সুতরাং
প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন শব্দে 'স্বপ্ন' ও প্রত্যভিজ্ঞা
উভয় মতই বুঝাইয়া থাকে। প্রাচীন সাহিত্যে
'জিক দর্শন', 'মাহেশ্বর দর্শন', প্রভৃতি নাম
বিশেষ প্রচলিত ছিল, কিন্তু মাধবাচার্য্যের
অনুসরণে এখন প্রত্যভিজ্ঞা নামই অধিকাংশ
স্থলে প্রচার লাভ করিয়াছে।

(৩) প্রত্যভিজ্ঞাসম্মত অদ্বৈতবাদ

বহিঃ আগম এবং উপনিষদে দ্বৈত,
অদ্বৈত, সৈতাদ্বৈত প্রভৃতি সকল প্রকার
দার্শনিকবাদেরই মূল স্বরূপকে দেখিতে
পাওয়া যায়, তাহাপি অধিকারভেদ এবং কতি
বৈচিত্র্যবশতঃ কোন কোন প্রধান কোন
একটি বিশেষ সিদ্ধান্তের প্রাধান্ত অঙ্গীকার
করিয়া প্রবর্তিত হইয়াছে। শঙ্কর, রামানুজ,
মাধব প্রভৃতি আচার্য্যমণ্ডলীকৃত উপনিষদ
ও শাস্ত্রের ভাবমহিমা কুলনা পূর্বক আলোচনা
করিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহা
অবশ্য সত্যবতঃই হইয়া থাকে। সকল
প্রকারের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের ইতিহাসেই
ইহার সূত্রান্ত আছে। আগমের কাহা প্রমাণ
যেই প্রকার কাশ্মীরীয় শৈবসাম্প্রদায়িক অদ্বৈত-
বাদই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই বাদের
মাধবাচার্য্য প্রদর্শন করিয়া তত্ত্ব একটি অস্তিত্ব
দর্শন শাস্ত্রের নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।
ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে এই অদ্বৈত
সিদ্ধান্ত ইন্দ্রবাসুদেব নামে প্রসিদ্ধি লাভ
করিয়াছে। আচার্য্য্য অস্তিত্ব ওপ্ত এই
সিদ্ধান্তের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাতা।

(৪) অদ্বৈতবাদের প্রকারভেদ

আচার্য্য্য গোড়পদী মাণ্ড্যাকারিকায়
এবং আচার্য্য্য শঙ্কর শারীরক স্তত্র ও উপনিষ-
দাদির ভাষ্যে ব্রহ্মস্বত্ববাদের যে ব্যাখ্যা
প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন আনুমানিক সাধা-
বগতঃ তাহাই অদ্বৈতবাদ শব্দে একমাত্র
অর্থ বলিয়া পরিগৃহীত হয়। বর্ণা ব্রহ্মা, ইহা
সমীচীন সিদ্ধান্ত নহে। অদ্বৈত প্রহ্লাদ নামে
প্রকার, ব্রহ্মবাদ তাহারই অন্তর্গত মত বিশেষ
মান। শ্রীকৃষ্ণ, রামানুজ, বরদ প্রভৃতির
সিদ্ধান্ত খণ্ডি অদ্বৈত মত নহে, এ কথা নত্যা-
নুচিত। খণ্ডি অদ্বৈতবাদে ভাবমহিমা দর্শন
শাস্ত্রের ইতিহাসে কোন যথেষ্ট বিবরণ ছিল
না।

লৌকিক অদ্বৈতবাদী ছিলেন। বুদ্ধদেবের
'জয়দ্বাদশী' এক নামটি ছিল, এ কথা অমর
সিংহ আপন কোষ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।
'সিদ্ধান্ত কথোপকথন' নামক গ্রন্থে বচ প্রকার
বিশেষতঃ অঙ্গীদর্শন নামে বিশেষ বৌদ্ধ
প্রকারের দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধীয় যতাবলীর
বর্ণনা আছে, এবং এই সকল প্রকারের বিবরণ
মত পদার্থ কালে মৌল্যাত্মিক, বৈদ্যাত্মিক,
যোগাঙ্গী ও আধ্যাত্মিক এই চারিটি প্রধান
শ্রেণীতে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাপি সকল
মতেই যেভাবেই হোক আধ্যাত্মিক প্রবর্তিত শূন্য-
বাদে গাঢ় বোধিচিত্ত বিবরণকার স্পষ্টাক্ষরে
স্বীকার করিয়াছেন—

'স্তিম্ভাপি কেশনাভিরা শূন্যতাবয়লকণা।'
এই শূন্যবাদ কঠোর অবদ্বৈতবাদ—সৎ, অসৎ
প্রভৃতি কোটি চকুটর হইতে বিনির্মূলক করিয়া
এবং বুদ্ধির সহায়তার মাগার্জুনাদি আচার্য্য্য-
এবং এই শূন্য তত্ত্বকে বৈদ্যবিকল্প হইতে সর্বতো-

ভাবে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস বহু শতাব্দীয়া আপন রক্ষা-
বৈতবাদেব অল্প বিজ্ঞানবৈত অথবা শূন্যবৈত
সিদ্ধান্তের নিকট গতি। মুসলমানের 'সুন্নাতি'
শব্দদর্শনে মায়াবর্ণে স্থানলাভ করিয়াছে।
শব্দের মায়া যে প্রাচীন আশ্রয় হইতে
দার্শনিক হইতে বিদ্যমান। বিদ্যাক্ষেত্রে তাহা
স্বীকার করিতে হইবে। অধ্যাপক পুস
(Poussin) বেদান্তের মত মতের ভূমিকা-
মতক আলোচনা প্রসঙ্গে গৌড়শাস্ত্রাবিবাহ
বৌদ্ধ ভাবের প্রচার প্রদর্শন করিয়াছেন।
দর্শন শব্দ বোঝাচার ও মাধ্যমিক মত বর্ণন
করিয়াছেন, তাহাও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।
উদ্ধৃতি, বিতৃষ্ণিত, এমন কি মতের পদ্ধতি, মতের
কারণে বুদ্ধিগত মতের বোঝাচার ও
শব্দ মতে এক পদ মতের বর্ণনা। তবে
এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে।
ভাবভেদে বৌদ্ধমতের কিছু মতন নহে।
যাহারা মনে করেন শব্দবাদ নাগালুপ-প্রবর্তিত,
পূর্বে প্রাচীন মত ছিল না। যাহারা মত-
মতের মত উপনিষদাদি আলোচনা করিলে
এবং আগমের প্রাচীনতা বর্ণনা বিচার করিলে
বুঝিতে পারিবেন। নাগালুপ কোন মত-
সিদ্ধান্তের প্রবর্তনা করেন নাই। পূর্বে মত-
অস্পষ্ট এবং ভাষা দ্বন্দ্ব ছিল তিনি তাহা
স্পষ্টীকৃত এবং প্রণালীবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন
মাত্র।

বৈদ্যাকরণশব্দক অদ্বৈতবাদী ছিলেন।
ব্যাকরণবীকার মতকল্পে প্রকাশ করিয়াছেন
যে, ব্যাকরণের সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদ। ব্যাকরণ
মতে অদ্বৈত চিন্তা শব্দত্বই অদ্বৈতের মূল
কারণ, ইহা এক এবং অভিন্ন। কিন্তু

দগ্ধদ্বাদশ বোঝার অদ্বৈতবাদী। ইহাদের
মতে মতের মতমত এক এবং অদ্বৈতীয়।
এই বৈদ্যাকরণশব্দক বৈদ্যাকরণ এবং পূর্বে
শব্দক আলোচনা করিবাব ইহা জ্ঞান নহে।
তবে এই শব্দ সিদ্ধান্ত হইতে স্পষ্টই বুঝিতে
পারা। তাহা প্রাচীন কালে অদ্বৈতবাদের
নাম। প্রাচীন দর্শন — অদ্বৈতের সঙ্গে
শব্দবৈত মতের মতমত, অদ্বৈত, অদ্বৈত
মতের বিভিন্ন প্রকারের অদ্বৈত সিদ্ধান্ত
এখন প্রণীত ছিল।

দর্শন মত আগম — বেদান্ত মত — উভয়ই
অদ্বৈতবাদী মত। অদ্বৈতবাদী মত — অদ্বৈত
কোন মতমতের কারণ নহে। বৈদ্যাক
সিদ্ধান্ত মূলস্থান পদমতের উপনিষদ এবং
শব্দবৈত দর্শনিকের মত মত, অদ্বৈত, অদ্বৈত
এবং শব্দিক সিদ্ধান্তে অদ্বৈতের প্রাচীন
আগম দর্শন এবং শিববৈত, অদ্বৈত, পরম-
দর্শনমতের প্রভাবিত বর্ণমালা। বৈদ্যাক, বৈদ্যাক,
অদ্বৈত, বৈদ্যাক, অদ্বৈত, অদ্বৈত, অদ্বৈত
দর্শনমতের মত মত, অদ্বৈত, অদ্বৈত, অদ্বৈত
প্রাচীন মতমতের মত মত, অদ্বৈত, অদ্বৈত, অদ্বৈত
দর্শন মতমতের মত মত, অদ্বৈত, অদ্বৈত, অদ্বৈত
এবং ব্যাকরণ শিববৈত মত উদ্ভূত।
জীববৈত সিদ্ধান্তে শব্দ মত মত। অবশ্য
প্রাচীন মতমতের অদ্বৈত নবা প্রকাশ
বিদ্যমান আছে।

(২) প্রজ্ঞাবাদ ও উদ্ভূত মতমত

বৈদ্যাকরণ

অদ্বৈত, গৌড়শাস্ত্র মত মত, অদ্বৈত
প্রজ্ঞাবৈত মত মত, অদ্বৈত, অদ্বৈত, অদ্বৈত
ব্যাকরণ মতমতের মত মত, অদ্বৈত, অদ্বৈত, অদ্বৈত

মধ্যে। প্রসঙ্গের মাধ্যমে ১৭ ও ১৮ এই
 দুইটি হইতে বিলম্ব এবং অনির্জনীয়
 প্রমাণ প্রদীকার করা হইয়াছে। কিন্তু
 শৈবাচার্য্যের বলেন, ইহাতে কেহ ভুল হয়
 নাই। কারণ পরমাধুর্ভূত মায়ার বধন তুল্য,
 তখন ব্যাক্যের ভূমির সত্যতা অথবা মিথ্যার
 ভূমির অনির্জনীয়তা বস্তুতঃ প্রত্যেকেরই বৈত-
 ত্ত্বের স্পর্শ করে না। এ কথা সত্য। কিন্তু
 তাহা হইলেও অবৈতত্বের সাক্ষ্যে মানে, যে
 সাক্ষ্যের হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই
 যে জীব জড়াত্মক বিশ্ব বৈচিত্র্য, ইহার উত-
 কি? মূলে বধন এক সময় জ্ঞানতত্ত্ব তখন
 এ বৈতত্বের হয় কেন? আর কতাব
 কাছেই বা হয়? অজ্ঞানের আশ্রয় কে,
 জ্ঞান কে? দৈর্ঘ্যাদি ঘটনার অনাদি ও
 পরমপারিত্যক বস্তু প্রবাহের অনাদি। এত
 প্রকার বিবর্তীত্বক অনাদি প্রবর্তমান ব্যবহারের
 অধিষ্ঠান বা অধিকরণ মাত্র। ইহার কর্তৃত্ব
 বা স্বাতন্ত্র্য কল্পিত, বাস্তব নহে। কল্প কর্তৃক
 করে কে? জীব অথবা দৈব—এই দুই।
 পরমাধুর্ভূত এই দুই দাবতীয় স্বর্গে তাহাতে
 আরোপিত বা অধ্যস্ত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ
 প্রমাণ হইতে প্রবর্তন বা দৈবত্বের কি প্রকারে
 যে হয় তাহা বুঝা যায় না। প্রবর্তনকে
 জ্ঞানাদি বলিয়াই চূর্ণ করিয়া থাকিতে হয়।
 অজ্ঞানের প্রবৃত্তি কোথা হইতে ও কেন
 তাহার উত্তর নাই। স্বপ্রকাশ চিরভাসব
 জ্ঞানমাত্রকে কল্পনা, কল্পনাকল্পের কোথা
 হইতে উদ্ভূত পরিচয় করে। জ্ঞান অমনই
 অবশ্যভাবে তাহার অপর কল্পনা বা প্রকাশ
 অথবা অবকাশ হইয়া পড়ে নাহি। কিন্তু
 অজ্ঞানের প্রবর্তনিকার বধন বস্তু মায়ার
 তখন তাহা কিহে। ইহারই দ্বিতীয় দাবতীয়

মধ্যে অজ্ঞান করিয়া আবিষ্কার করিবার
 চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

দৈর্ঘ্যাদি প্রবাহের অজ্ঞান আছে, মায়ার
 আছে—কিন্তু তাহার প্রবৃত্তি আকস্মিক নহে।
 উহা আশ্রয় স্বাতন্ত্র্যমূলক অর্থাৎ স্বকো-
 পরিণীত রূপ। নতুন মন জ্ঞানিরাই মায়ার
 প্রকারে অভিনয় করে, পরদেহেরও তেমনই
 আপন ইচ্ছা মায়ারই মায়ার ভূমিকা গ্রহণ
 করেন। তিনি স্বতন্ত্র আপন স্বরূপ চাকিতে ও
 সমর্থ, খলিতে ও স্বর্গ, অথচ যখন চাকেন তখনও
 তাহার অনাবৃত্তরূপ চূড়ান্ত হয় না। অজ্ঞান
 তাহারই স্বাতন্ত্র্যশক্তির বিলম্বিত মাত্র। যেমন
 নবিত্তদেব আপন সৃষ্টি মধ্যে আপনাকে
 আচ্ছাদিত করেন, এ-ও সেই প্রকার। অথচ
 আচ্ছাদিত করিতেও দ্বিধা অনাবৃত্তিতও
 থাকেন। কারণ তাহা না হইলে স্বেচ্ছা
 প্রকাশ করে কে? এই রূপ বিবর্তনচিত্র
 আপন স্বরূপেরই বিশেষরূপ। মায়ার
 জ্ঞানপর, তাহাই প্রত্যক্ষ অভিনয়ের হেতু।
 আশ্রয়মাত্র আশ্রয় সূত্র কিহে? ইচ্ছাই
 সভ্যকর্ম। লক্ষ্যবাদী যে এ স্বরূপ একেবারে
 মানেন না তাহা নহে। অজ্ঞান যে আশ্রয়ই
 শক্তি তাহা তাহাকেও প্রকারে করিতে হয়।
 তবে দৈববাদী বলেন, ইহা স্বাতন্ত্র্যমূলক,
 স্বাতন্ত্র্যাত্মক, কর্তৃত্ববহুল, প্রবর্তনীয় বলেন ইহা
 স্বতন্ত্র মূলক কিংবা অধিষ্ঠান চৈতন্যাত্মক, এই
 বানাই প্রধান ভেদ। অর্থাৎ শাকর বেদান্ত
 মতে জ্ঞান স্বাধীন, সচ্ছিন্ন, এক, সত্য,
 নিরঞ্জন, নিরঞ্জন, অনাদি, অনন্ত, শাকর,
 সৃষ্টি দ্বিতীয় মায়ার হেতু, জ্ঞানাত্মক, সচ্ছিন্ন,
 স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন—কিন্তু তাহার কর্তৃত্ব
 নাই। কিন্তু জ্ঞান সত্য অবৈত স্বতন্ত্র

বিশ্বই আশ্রয় করায়। জ্ঞান ও জিহা তাঁহার নিকট এক, সাধারণ জ্ঞানের জিহাই জ্ঞান, আশ্রয় জিহা জ্ঞানের দণ্ড, এক তিনি কর্তৃত্বের বলিয়া তাঁহার জ্ঞানই জিহা। এই জ্ঞান ও জিহা উভয়টার নাম ইচ্ছা। তাই তিনি ইচ্ছাময়, অথবা ইচ্ছাশক্তি প্রকটমান, অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যময়। ঐশ্বর্য, বিশ্বই পূর্ণবস্থা প্রকৃতি এই স্বাতন্ত্র্যই রই নাশাস্বর।

জাগ্রতমগত আত্মা সর্বদাই পরকৃত্যকারী—ইহা তাঁহার অসাধারণ স্বভাব। সৃষ্টি, বিস্তার, সংকোচ, অগ্রগতি এবং বিলম্ব—এই পাঁচটিকে পরকৃত্য বলা হয়। শাকরমতে ব্রহ্ম এতৎকৃত্যের নহেন। সেই ব্রহ্ম ব্রহ্ম-বাসে আশ্রয় স্বরূপ তেমন নাই বলিয়া আত্মা সত্য হইয়াও অসংকর। মহেশ্বরামানন্দ লিখিয়াছেন—“ভক্তি হি অদ্বৈত মাগ্রহেণোপ-পাদ্যমান মপি দ্বৈতকল্পান্বেষাধিরোহতি, যদত্র সত্যাসত্য ব্যবস্থা ভেদোপাশ্রয় কল্পনায়াং ভেদেনবাক্যেণ দ্বৈতভঙ্গ্যাদা পূর্ববসাদিব্যমনি-বার্জ্যম্।” জিজ্ঞাসন যোবতর অদ্বৈতবাদী, সে অদ্বৈতবাদের নিকট সত্যাবস্থা সিদ্ধান্ত যেন জ্ঞান বলিয়া বোধ হয়, যেন হয় যেন শাকর মতে দৈবতাত্ত্বিক বস্তুতঃ বর্জিত হয় নাই। সংবিহ্বল্যে আছে—

“দৈবতাদভ্যন্তর্যকল্পমপ্যসংকল্পমাত্মনো
তদুদ্বৈতে বত পৰ্যাবল্যতি কৃতং যাজ্ঞঃ-

হুত্বি যাজ্ঞা।

এতে তে পরমেস্বরাদিনির্মলঃ কল্যাণি-

কল্যাণি-

শাকরমতে আত্মা সর্বদাই পরকৃত্যকারী

মাকরমতে

যেন এই জ্ঞান শাকর বেদান্তেই বর্ণিত
ভীত হইয়া, এই বস্তুতে আত্মা দৈবতাবস্থা
স্বতন্ত্র্য অসংকর। উহা বিচারে দৈবত
কোটিতেই আত্মা পড়ে। জাগ্রত মতে
অদ্বৈত শাকর আত্মাই-এই নিজা নামরূপ।
শাকর বস্তুতঃ সত্য ও আত্মাকে অনিশ্চয়তাব
বলিয়াছে। বলিয়া বস্তু অদ্বৈত ভাবের
ইংকর প্রকারিতে চিত্ত করা হইয়াছে ততই
যেন পূর্ণত্বের প্রকাশে জ্ঞান, পূর্ণত্বই।
তিনি মাঝকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে
পারেন নাই। তাই তাঁহার অদ্বৈতভাব সমস্ত
মতক (active), মতামূলক (mixed
or reconciliation or elimination),
অসংকল্পিত কিংবা একমূলক (all embracing
one) নহে। জ্ঞান স্বতন্ত্র্য, ব্রহ্মাশ্রিত,
অথচ এক সত্য কিন্তু বিচার দৃষ্টিতে যার
সদস্য বিরুদ্ধ। কিন্তু মাঝকে স্বীকার
করিয়া তাহাকে ব্রহ্মময়ী, নিজা, সত্যস্বরূপ
বলিয়া নামিলে এক ও মাঝের একরূপ হইল।
এই একরূপ মাঝকে তাঁর কহিয়া রা
কুচ্ছ বোধে নহে, তাহাকে জাগ্রতই বলি
বোধে—মেঘে বৃষ্টিপতি আকৃত হইলে আমরা
বলিয়া থাকি মেঘে বর্ষাকে আচ্ছাদন করি-
য়াছে—কিন্তু এ মেঘ নিজেও কি বর্ষা হইতেই
প্রসূত নহে? মেঘ কি স্বর্গেরই মহিমা নহে?
সুতরাং বর্ষাও মাঝ, মেঘও তাহাই, বস্তু
আত্মাই শক্তি। জাগ্রতমগত তেমনই
এক হইতেই আত্মা হইয়া, তাঁহারই সত্যস্বরূপ
আত্মাশ্রয়। কহে, আত্মা এই বস্তু
জাগ্রতমগতই। জাগ্রতমগতই
জাগ্রতমগতই বস্তু নিজেই বস্তু নিজেই

এই অধীক্ষিত মস্তিষ্কার সাক্ষ্য
কলমে অব্যাহত রাখিতে যখন একান্ততঃ
চেষ্টা পাইল না। কারণ তিনি অনাবৃত-
রূপ। তাই বলিতে হয়, এইই তাহার
আবরণ, আবার তিনিই তাঁর উল্লীলক।
তিনি ছাড়া আর কিই বা আছে? ব্রহ্ম ও
মায়ী একই বস্তু—ব্রহ্ম সত্তা, মায়ী মিথ্যা,
এ কথা বলিলেই প্রকারান্তরে বৈজ্ঞানিক
আসিয়াই পড়ে। যে অবস্থায় মায়ী না।
এ অবস্থায় ব্রহ্ম ও মিথ্যা—কেন না, মায়ী
মিথ্যা অস্তিত্ব করিতে গেলেন মায়ার স-
্বীকার অপরিহার্য, আর মায়ী স্বীকার
করিলেই সে অবস্থায় যে ব্রহ্মবোধ বা
মায়ী কল্পিত বস্তু। একথা বৈজ্ঞানিক ও
নানানভাবে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে
মায়াকে সত্য বলিয়া খুসি হইল ব্রহ্ম ও মায়ী।
মায়ার বৈচিত্র্য অনুসারে এই এক-বস্তুও
বিচিত্র হইবে—অর্থাৎ সকল বস্তুই সমভাবে
সত্য। তখন জগতের মাণ্ডলীক পদার্থ—ব্রহ্মরূপে
প্রতিষ্ঠিত হইবে—সকলই, যে সত্য, সকলই
যে বিশ্বয় ও আনন্দময় তাহা উৎপত্তি হইবে।
‘সর্বং ধর্ম্মং ব্রহ্ম’ এই উগনিবদ শাস্ত্রাভ্যাস
সার্থকতা লাভ করবে। মায়ী মিথ্যা
তৎপ্রযুক্ত জগৎকে ত্যাগ করিয়া নহে,
তাহাকে সাক্ষ্য ব্রহ্মলীলা ও তাহার বিকাশ-
রূপে অস্তিত্ব করিতে, আনন্দন করিতে
পারিলেই তবে জীবনের সার্থকতা সম্পন্ন
হয়। পক্ষি মতা, হস্তীর জীব ও লক্ষণ ও
সত্তা—মিথ্যা মনে, তাই সর্বই বস্তুতঃ মিথ্যরূপ।
বৈচিত্র্য একেই বিনাশ; তেজ অভ্যন্তরই
আত্মপ্রকাশ, সত্যরূপ মরীচি মালা শিবরূপ
হওয়ার আগমারই চরমমাত্র—অন্ত কিছ

নাহ। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের “তব প্রকাশ বদ
বিকল্পবোঃ” কথাই যথার্থ অস্বীকার করি-
বার একথা বুলা বাইতে পারে যে আলোক
ইতিহাস বর্ণনবশতঃ অন্ধকারের আবির্ভাব হয়,
যাওয়ার অন্ধকারই বর্ণনদ্বারা আলোকে পর্য-
বসন্ন হয়। তাইই নিত্যসংযুক্ত, ব্রহ্মরূপ সময়স
তাবাপন্ন—যখনে প্রাধান্তের বিকাশ হয়, সেই
প্রাধান্ত অনুসারে ব্যাপনেশ হয়। আগম
শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত। পূর্ববর্তীতে প্রকৃতি
কিবা প্রকৃতি হইতে পূর্বব একান্ততঃ পৃথক
নহেও, হইতেও পারে না। বাহ্যারা তাহা
করেন তাঁহারা শুধু logical abstraction
এর দ্বারা তব বিশ্লেষণ করেন মাত্র। বস্তুতঃ
সংখ্যার প্রকৃতি পূর্বব বিবেক অর্থও পৃথক-
করণ নহে, তাহার প্রমাণ সাংখ্যকারিকা
ও যোগভাস্যো স্পষ্ট পাওয়া যায়। সে
আলোচনা সমস্তের করিবার ইচ্ছা রহিল।

স্পন্দ শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—
“ইতি বা বস্তু ন্যকিঞ্চিৎ জীভাক্ষেপাদিনঃ অর্থঃ।
স পশ্যন্ত গত্যন্ত বৃত্তো জীবমুক্তো ন সংশয়ঃ।”
ইহাও তাৎপর্য্য এই যে, জীবমুক্ত সকল
জগৎকেই আত্মজীভা অর্থাৎ আত্মশক্তির
বিশ্রামরূপে নিরীক্ষণ করেন, তাহার যোগা-
বস্থা কখনও ভয় পায় না। ভেদ ও অভেদ,
স্বাধীন ও নিরোপ ইত্যেধের মধ্যে সামান্য দর্শন
হইলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না—
কারণ তাইই এক রকম। ইহাই শিবশক্তির
সামরাজ্য বা চিদানন্দলাভ। ইহাই জীবদান-
বাদের বিশিষ্টতা।

(৬) প্রত্যক্ষিত দর্শনে জ্ঞান ও সত্যের

সামঞ্জস্য

এই অবস্থায় আর একটি বিশেষ

বোধদায়ক (খঃ ২০০-২০১) বিবাহিত
বলিয়াছেন—

বৈতন্য মোহায় বোকাও প্রাপ্তে

বোধে মনীষা।

ভক্তির কলিকাতা হৈল হৈল তদানি পুনঃ

জ্ঞাতে সমবসি নৈব বৈতন্যমুতোপমম্।

মিত্রায় বিবাহিত্য জীবিত্য পরমাখ্যনোঃ”

অবৈতন্যভক্তি কি এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ

কি প্রকারেই হইবে সে বিবরণ এখানে দিয়া

জন। নারায়ণতীর্থ তাঁহার চরিত্রাঙ্কন

নামক শাস্ত্রাঙ্কনের ভাষ্যে এই ভক্তির

বিস্তারপূর্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং শাস্ত্র

বহু স্থলে ইহার প্রসঙ্গ আছে। হিন্দুরা এই

জ্ঞানধর্ম আছে (২০ অধ্যায়, ৩৩-৩৫)

প্রকাশ সার পরমতত্ত্ব অপরোক্ষ রূপে অর্থাৎ

ভিন্নভাবে সাধাৎকার করিয়াও সৌন্দর্য্য বান

পরম ভক্ত প্রীতির সহিত তাহার সেবা

করিয়া থাকেন। সেবা করিতে গেলেই

সেবা সেবক ভাব চাই, অদ্বয়বাস্তব এ

জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভবপর? তাহা বলি

হইয়াছে—ভেদ ভাব অবলম্বন করিয়া সেবা

করা হয়, ইহা অবশ্য অস্বাভাবিক, অসম্ভব

নহে। পরম ভক্ত সামান্যতর, সেখানে ভেদ

ভেদ নাই—সেটা পরস্পরকার সন্ধিহীন। তাহা

এ ভেদ আবরণ করিবার প্রয়োজন কি? এ

প্রয়োজন আর কিছুই নহে, কেউ ভেদ

ভাবের স্বরূপ—

“ইহং (অর্থাৎ পরম) পদম্ প্রোক্তভাষকং।

ইহং কৈবর্তিকমসীদ্যং কৈবর্তিকমসীদ্যং। ৩১।

কৈবর্তিক স্বরূপতো অর্থাৎ পি দ্বাবয়বমদন।

বিভিন্নভাষ্যাত্মক্যং সৌন্দর্য্যভাষ্যাত্মক্যং পটঃ।”

ইহা ইহাতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানানুভবও

ভক্তি থাকিতে পারে। ইহা কৈবর্তবর্গীয়

বলিয়া ভক্তি, অজ্ঞানমূলক বৈতন্য বা সাধিন

ভক্তির মতন স্বার্থানুসন্ধানাত্মক নহে। অবৈত-

ভক্তির পক্ষেও একটা ভেদ আবশ্যক—ইহা

কল্পিত এবং জ্ঞানপূর্বক। আর এক কথা,

জ্ঞানের পর যে অবৈতভক্তি সকলেরই আগিবে

এমন কথা নহে। যাহার হৃদয় স্বাভাবিক

ভক্তিপ্রবণ তাহাদেরই অবৈতভক্তির উদয় হয়,

জ্ঞানার্থীর ইহা হয় না।

কিন্তু উদিত হউক আর নাই হউক চব্বি

জ্ঞান ও ভক্তি একাকার হইয়া যায়। যাহাকে

জ্ঞান বা স্বাভাবিকতার বলা হয় তাহা

জ্ঞানের সীমা ও প্রেমের ও চরম—এই জন্ত

ইহা সমন্বয়ভূমি। এখানে তর্কই উভয় শোভ

প্রদর্শিত হইয়াছে।

দাস্যাত্মক ভক্তিই ত্রিকদর্শনে অঙ্গীকৃত

হইয়াছে। ভগবান্ প্রভু, পিতা অথবা গুরু—

ভক্ত দাস, পুত্র অথবা শিষ্য। শুধু ত্রিকদর্শন

নহে, শৈবগম মতেই এই ভাবের প্রাধান্

হই হয়। বীরশৈবাদি মতেও এই সিদ্ধান্ত

স্বীকৃত দেখা যায় *। শাক্তগমের মতঃ

এতদগিয়ে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না।

তবে পিতৃভাব স্থানে মাতৃভাব সেখানে করিত

হয়, এই মাত্র বিশেষ। কিন্তু এই ভাবভেদের

মাধ্যমাত্মক্যই মূলভূত, তাই ইহারই প্রাধান্

কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। বলা বাতুল্য, ভক্তির মূল

তত্ত্বই যে দাস্তভাবান্বিত তাহা স্বীকার করিতে

হইবে। শাস্ত্রভক্তি ভক্তির স্বরূপ অবস্থা মাত্র,

একটু বিকসিত হইলেই তাহাতে দাস্তভাবের

রসন লাগিয়া যায়। অবৈত হইতে বৈতের

* জটয়া—মণিবেদকৃত “অনুভবতঃ”।

কিন্তু এই ভাবেই উঠে। বিকাশ যতই হইতে থাকে, এ রকম আর কখনও ছাড়ে না। যেকোনো জাতীয় বৈষম্যসম্প্রদায় প্রকৃতি মণ্ডলীতে সঙ্গী বাইসলা ও মাধুর্য্য ভাবও আদীকৃত হইয়াছে তথাপি একথা সত্য সর্বভাবেই মূলভূত হইয়াছে—অনুভূত আছে। ভূতবৃত্তিতে মনঃসংস্কৃতিতে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি ক্রমে পৃথিবীর আকর্ষণ হইয়াছে—রসবিকাশের সেইরূপ পাল হইতে দান্ত, দান্ত হইতে সঙ্গ ইত্যাদি ক্রমে উত্তরোত্তর রসপটী সিক্ত হয়। আকাশের নিম্ন রূপ এক - বায়ু উৎপন্ন হইলেই শব্দ উৎপন্ন হয়, তা ছাড়া তার নিজস্ব স্পন্দ বিকশিত হয়। এইরূপ ক্রমঃ এক একটি স্তরের বুদ্ধি পাইতে থাকে ও পূর্ব পূর্ব স্তর অনুভূত হইতে থাকে। তাই পৃথিবীতে শব্দভূতের স্তর আছে, তন্মধ্যে শব্দাদি চারিটি ভাবের সমাগত সামান্য স্তর। যাহা বিশেষ স্তর। অন্য স্তর ভাবের ক্রমবিকাশের বুদ্ধিতে উঠবে। তখন ভাবের বিশেষ স্তর নির্ভী দ্বারা অনুভূত হয়, অর্থাৎ ভাবের অগ্নি স্তর সেবার তখন উদ্ভূত উঠে। যাহা শব্দ ও দান্তের উত্তরের স্তর অনুভূত হয় এবং তদন্বয় অপরোচক বিকশিত হয়। এই প্রকারে সামান্যমধ্যে প্রকৃতির রসের স্তরই অর্থাৎ নিম্ন, মধ্য, অসংস্কৃত ও লোকন বর্তমান আছে, অর্থাৎ তদন্তরিত ভাবের বিশেষ স্তর বা অসংস্কৃত স্তর উদ্ভূত হয়।

জিকর্মণ হইয়াছে তক্তি মানিয়া তক্তির গোড়াকার তহই মানিয়া লইয়াছেন। আর শুধু মূলই-বে মানিয়াছেন তাহা নহে, তক্তির ক্রম-কল যে ক্ষণে প্রেম তাহাও আভাসে

হইয়াছে, করিয়াছেন। এইরূপ মনে রাখিতে হইবে এই ভুক্তি অজ্ঞানমূলক বৈজ্ঞানিক প্রকৃত নহে। ইহা পরিষ্কৃত অর্থে অবস্থা, অর্থাৎ এক হিসাবে পরিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক বটে—তবে ইহা অলৌকিক, "বৈজ্ঞানিক", এই বিশেষ। তাই এখন একাধারে জ্ঞান ও ভক্তি, চিত্ত ও আনন্দের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ইহারই নাম শিবশক্তি র সাধারণ। এই রসভূতই একাধারে চৈতন্যের পূর্ণ সামঞ্জস্য। এই রস 'ব্রহ্মা-নন্দ' হইতে বিদ্যমান এবং বিশিষ্ট—ব্রহ্মানন্দে পরিণত নাই, সঙ্গ নাই, অস্তিত্ব নাই, জড়তা নাই, বস্তু রসে সবই আছে, অর্থাৎ অলৌকিক। পূর্ণাঙ্গমাত্র চমৎকারই রসবোধ—ইহা - ভক্তদের মধ্যেও অলৌকিক ভেদ থাকে, নতুবা আশ্রয় হইতে পারে না। তবে এ ভেদ লৌকিক ভেদের মতন নহে, ইহা বৈজ্ঞানিক মাত্র। অভিনব গুণাচার্য্য যেমনি ভাবে দীক্ষা অভিনব ভারতীতে রস-ভূত এই প্রত্যভিজ্ঞা মনঃসংস্কৃতি আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে বসন্তরূপ অনেকটা পরিষ্কৃত উঠে।

এইরূপে মনে হয়—এই রস কি শাস্ত্রের মত বৈজ্ঞানিক বস্তু নহে। আশ্রয় পূর্বক এক পরিমাণে তাহাতেই এ প্রকার সমাধান হইতে পারে। তক্তি শব্দটিকেই মূল দান্ত ভাব থাকিবে। শাস্ত্রভাবকে তক্তির বীজভাব বলা হইতে পারে বটে। কিন্তু ইহা পরিষ্কৃত ভুক্তি নহে। দান্ত বোধ না করিয়া পর্য্যাপ্ত, নিতেন্দ্র একটা জনক বস্তুর সঙ্গে অভিন্ন জমিয়াও তদন্তরিত বলিয়া বোধ না করা গিয়াছে, তক্তিরাজ্যের আরও বীজভাব শাস্ত্রভাব তাহারই সমাপ্ত করে।

এই যে অনন্ত কাল ইহা নিজেরই আশা ভিন্ন
অপার কিছু নহে। এই যে ব্রহ্মভাব হইতে
শাক্তসম ও তদনন্তর হাক্তির আবির্ভাব
হইয়া থাকে, থাকে কিংবা, হাক্তানিতে সে
ব্রহ্মভাব অনন্তর থাকে—অথবা তাহারই
উপরে শুদ্ধ আত্মকৃত সত্ত্বের লহর ধোঁয়া।

অতীত চাপা থাকে—আলোর বৃকে
আলোরই লহর নাচিয়া বেড়ায়। এই
লহরই “উজ্জান” বা রস। তাহার বৈচিত্র্যই
জীবারিষ্ঠার। এ লহর শুদ্ধরূপে চির অর্ন্ত-
মান, তাই বৈষম্যবর্ণের জায় শৈবগণ নিত্য-
জীবা মানিয়া থাকেন। তাই কেমনকি
শিবকে “কৈলাসাসিদ্ধি নিত্যপ্রবর্তমান প্রমোদ
নির্ভরজীভাময় লোকান্তর প্রভাব বিস্তার-
রিত্রে” * বলিয়া স্তবচিত্তামণির টীকাতে বর্ণনা
করিয়াছেন।

কিন্তু ভক্তি যে রসরূপ তাহা কেহ কেহ,
বিশেষতঃ আনন্দারিকগণ, স্বীকার করেন না।
কাব্যপ্রকাশকার মর্ষট, রসপ্ৰকাশকার
শক্তিভর্য্য জগদীশ প্রভৃতি আনন্দারিকগণ
ভক্তিকে প্রায়কোটিতে নিকোপ করিয়াছেন।
কিন্তু ইহাতে কোনই বিরোধ নাই। সাহিত্য-
সামর্থ্যী অত্যন্ত দূর দেখাইয়াছে যে, স্বীকার
“অথেষ্টা সর্বভূতানাম” ইহাতে “সো মদভক্তঃ
স মে প্রিয়ঃ” পর্যন্ত বাক্য হইতে জানা যায়
যে মুখ্য ব্যক্তি জীবন্তেরই নামান্তর।
জীবন্তকে বিবেকে বিভারপ্যাবানীও সেই কথাই
বলিয়াছেন—“জীবন্তঃ হি প্রোক্তা বিহৃতভক্ত
কথং”। এই ভাবে দেখিলে ইহা কতটা
শাস্ত্রসম্মত অনুভব হইয়া পড়ে। আনন্দ-
রিকগণ সেই ভক্তিকে যতদূর সম্ভব
*

স্বীকার করেন না। অর্থাৎ মুখ্য ভক্তি যে
রস সে বিষয়ে আনন্দারিকগণ অসম্মত নহেন,
তবে তাহা শাস্ত্র রস হইতে ভিন্ন একথা
মানিবার হেতু নাই। অপর পক্ষে, ভক্তগণ
যাহা বলিয়া থাকেন তাহাও সত্য। তাহার
বলেন— ভক্তি যখন অদ্বৈত আনন্দভাববিশয়ক
বৃত্তিবিশেষ, তখন তাহার রসরূপ স্বীকার করা
বাঞ্ছনীয়। সাহিত্যসাধকের টীকাকার স্ঠাপনে
বলিয়াছেন যে, ভক্তি মুখ্য ও গৌণ, বা পরা
ও অপরাভেদে দ্বিবিধ। অমকারশাস্ত্রে মুখ্য
ভক্তি শাস্ত্রসম্মত অতীত ও গৌণভক্তি তাব
মাত্র। ভক্তিশাস্ত্রে শাস্ত্ররস নিজের ভক্তি-
বিশেষ, মুখ্য ভক্তি রসরূপ।

শান্তিনা ও নারদ আগুন ভক্তিরূপে,
মধুসূদন সরস্বতী ভক্তিরসায়নে ও জীর্ণপ
গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির রসরূপ
উপপাদন করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে সে সব
আলোচনার প্রয়োজন নাই। এখানে ইহা
বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের
আচার্য্যগণ ভক্তিকে রস বলিয়া স্বীকার
বরিয়া অধ্যাত্মরাজ্যের একটি গভীর তত্ত্ব
প্রদীপিত করিয়াছেন। উপলক্ষ্যার্থী তাহার
শিষ্যতাজীবনীর প্রথম ক্ষেত্রে (১) বলি-
য়াছেন—

অস্মি ভক্তি-বিশ্ব-রসায়ন বয়োদ্রাঘাঃ।*

অধিতীরা অপি নরা অধিতীরা অপি প্রভো ॥
পরাজিতর ইতাই বৈশিষ্ট্য যে, এ অধ্যায়
দ্বিতীয় না থাকিলেও দ্বিতীয় থাকে। নদীর
জীর্ণরূপ এই অর্থাৎ আত্মভেদভেদ ভেদের
প্রচার করিয়া নিয়াছেন। তাহার
করেন যে এই ইহা সেই নিখা হইবে তাহার
পূর্ণ সত্যের একরূপ মাত্র দেখিয়াছেন।

অন্তঃ কীটনা খেলও, ইচ্ছামূৰ্গ হইলেও
সেই একের কোলে ছই থাকিতে পারে
যদিও সে ছইও একেরই শুদ্ধতা ব ভাষা
প্রসাধন। 'ন'থ বেদ্যস্বরে কেন ন শ্যোহ-
লোকক: স্থিতঃ। বেদ্যবেদক সংকোভেহ-
প্যসিদ্ধতৈ স্থাপনঃ'। অন্তমুখাবস্থায় সর্ব-
বেদের উপশম হইলে এককরূপে বাহার ক্ষরণ

হয়, জ্ঞান ও বেদকেই সংকোভে বৈচিত্র্য
প্রশংসিত করণ তাহাওই সমাবেশিকা-
বলতঃ দেখিতে পান। যিনি বিবর্তীত,
তিনিই ভু-বিখাখক—অথ উভয়ই সমকালে;
ই জ্ঞান ও তত্ত্বি যেখানে সমরস বিবর্তীত
বিখাখক সমজাত্যেই সেখানে প্রকাশমান।
জ্ঞানভেদেব সত্যরূপা এখানেই। ইহাই
জ্ঞানবাদের বিশিষ্টতা।



মহাজ্ঞা

[জ্ঞানরসের দেবী]

দেই ত মানুষ, পুরুষের জাত ;—পোঁষে যার বক্ষতরা,
গৌবন যার অক্ষয় তেজে বার্থ করেছে। হু জরা !
চলেছে জগতে মতোর পথে—নিভাঁ নিরে শীঘ্র তুলি
জন্মের তরে অশ্রের দাস হয় নি' নে জন কখন ভুলি !
জন্মভূমির অনুসঙ্গে যোগী, কঠে' গালস দেশের কাজে,
পারিত্য যার অশ্রুতরণ, আশ্রয় দীনের সাজে !
হায় শ্রমজাত শিল্পে সোহাগ, মোটা কোঁপীনে যে শ্রীত,
কমতায় নয় খর্ব্ব কখন,—যে নম্র দুর্কিনীত
করে নিজ কাজ নিজেরই হু হাতে, জুড়্য মনিব উকাই নিজে—
বা কিছু সকলই নিজের স্বার্থে, পরশে সরসে শক্তি বীজে।
মহা মানবের মহিমায় যেবা মহিমামিত ধর' পড়ে,
স্বাধিকারে সদা অধিকার যার, প্রবাসী যে নহে গণন করে ;
মানুষ হইয়া মানুষেরে কড় করে না সে মীচু পার্থ লালি,
সম্মান সবার মান মর্যাদা—অন্তরে যার রয়েছে জালি।
করকের বলে কুমণ্ডলে যে অজয় অমর প্রেমের রাজা—
নিপাথ কাহারও মহা অপমান কুম্বল প্রলী কহিল সাজ।

বন্দীর গৃহ-অন্ধির দার, শৃঙ্খল তার-অলঙ্কার,
 শীঘ্রম প্রহার কঠোর হার, নির্যাতনেও নিষিদ্ধকার ।
 দণ্ড যে নহে অগ্নি সহনে, শত্রু যে নহে অত্রোঘাতে,
 মরণ যে নহে সিদ্ধ সন্নিবে, জ্ঞান যে নহে অজ্ঞাবাগে ;
 নিন্দা, কলুষ, কলুষ, ধারে ধারে না করিতে কলঙ্কিত,
 ইত্যারিরোধী সত্যাক্রম, অজ্ঞাচারেও নহে যে ভীত,
 অহিংসা যার ধর্মম গার, তত্ত্ব সাহার চরম তাগ ;
 মরম-যন্ত্রে বাজে নিশিদিন পোনের বেদনা তুংখভাগ,
 আত্মার বলে আত্মজয়ী যে, পরমাত্মার চরণে পান,
 জীবে প্রেম যার জীবনে বত, সমান যে হোখে বনী ও মান ।
 দেশাত্মবোধ-ভাবন চিত্তে বিরজিত জ্যোতি কমান বলে,
 প্রতিশোধ ল্পাশ পোষে না যে কদে, দোষে না যে কদ
 বিরোধী বলে ।
 অস্পৃশ্যের স্পর্শে বাহ্যে শুচিতার বিদ্ধ হয় না হানি,
 জাতি-ভেদ-ভাষা-ভাষাজেত ল'য়ে জাতি-জীবনে দেয় না গানি,
 সাধনা-সাক্ষর পরিচিন্তা শুধু হার্দে থাকে মুক্তিলাভ,
 কাম্য বাস্তবের অসংকেত হিতৈশ্বর্য-মুক্তি সাম্য প্রাপ্তি,
 বিশ্বাস যার শিখ-নিখরী নিন্দে-ভেদে দণ্ড দণ্ড প্রাপ্তি,
 ভক্তি যার শরিত্ব মলে বসে, অসংকেত বেদনাকান্দ
 তমোহীন বেদ্য হৃদয় তুল্য, শব্দ-বসি যার সাহিত্যকান্দ,
 বাধা অসংকেত অসীম পর্যা, শৌণ্ডিক যার সঙ্গততা ;
 জটিল অটল পদ্য-পদ্যের অসংকেত সমান সঙ্গত মতি,
 বক্তৃতা-বক্তৃতা বাক্য-বাক্যের অসংকেত অসংকেত পতি ।
 নিখিল ব্রহ্মণী জন্ম-যাহার, বিশ্ব-মামব সাহার ভাই,
 সুরল উদার অসংকেত যার, অসংকেত বিদ্ধ নাই,
 আত্মনার দেব, সূর্য, চন্দ্র, প্রজা,—খোলসা যে নিজের স্বীকার করে,
 আত্মসময়ে পাপি বিনাশেও হও বে দেয় নিজের পরে,
 বহু-কিরণ জাতি-মর্মেয় মিত্রন সাহার পতাকা তলে,
 বিরোধ-ভুক্তির সাহায্য লবে, শত্রু—মিত্র—সাহার বলে, A B

শাপিত অঙ্গির ফলকেব মৃত বলকে বাহির তীক্ষ্ণ তেজ,
 স্মিত প্রশান্ত উজ্জ্বল মুখ, কীমে গুহ্য শাস্তি 'কেজ'।
 ঈজিতে যার কোটি মৃত প্রাণে স্পন্দন পুন হ'য়েছে স্তব,
 সেই মহাক্সা অজের আত্মা আত্মজয়ের মন্ত্র-গুরু।
 অখিল ভুবনে প্রসারিত যার শ্রেষ্ঠ-সুগভীর আভিমান,
 বিশ্বের হিত—কল্যাণ ধ্যানের সমাহিত কার্য ব্যক্তি বন ;
 বুদ্ধ, নানক, কি মহেশ্বর, দীশুর বহুগুণ অরণ্যে যাহ—
 মরণ-বিজয়ী শঙ্করচরণ চরণে তাহার নমস্কা ।

আমার চীন যাত্রা

(প্রথম)

[শ্রীকেশবদেব বসুচন্দ্র বসুচন্দ্র]

হংকং পরিদর্শনটা পদব্রজে কবিবারই
 পরামর্শ ছিন্ন হইল। - পোষ্ট অফিসের পণ
 ঘরা গেল। হংকংয়ের রাস্তাগুলি জেন্দন
 প্রশস্ত নহে, পাছাড়ের উপর সেটা সড়কও
 নহে ; তবে পরিষ্কার, এবং বড় রাস্তাগুলি
 ছইধারে ছুঁপাখ দিয়া আঁটা। ঘোড়ার বা
 গরুরপাড়ির গোলমাল নাই,—বিক্‌সাই মান
 রক্ষা করিয়া থাকে। রাস্তার একদিকে
 বাক্স, পোষ্টপিস, সওদাগরী আগিল, ছোট্ট
 প্রকৃতি সাহেবী দৌঁবে শোভা পাইতেছে,
 অপর দিকে চীনাঙ্গের দোকান। দৈনিকটার
 খেল কলিকাতার আধাবাজার, চীনাবাজার,
 টাইলী ও মুর্গীহাটার একীকরণ ঘটাইছে,
 কিন্তু পারিপার্শ্ব্যে ও শিল্পমাঝে তাহাদের
 অপেক্ষা ঘোঁট।

এটা পাছাড় হইলেও বায়গিরি নয়,
 এখানে মুক্ত থাকিলেও তাহার দোভা

কংকংয়ের পোষ্টপিসের। ইহারে
 উৎসাহ বিশ্বাস করিতে পারিলেই উদারতার
 মধ্যে পাওয়া যায়। পথেব ধারে পোষ্টপিস
 পাহারা নিজেদের পোষ্টের কথা তাহারই
 পোষ্ট নিশ্চিতে সমপণ করিয়া, বাড়াহাড়া
 হইয়া বাজারে প্রবেশ করা গেল।

হংকংয়ের বাজারটা একটি প্রকাণ্ড পাকা
 ইমারত ; দীর্ঘে প্রবেশ প্রায় ছই বিঘা জুয়া
 আচ্ছাদ্য করিয়াছে। চারিদিকে সু-উচ্চ
 গেট, মধ্যে তিনটি প্রবেশের বিভাগ। একটিকে
 কপি, আলু, বেগুন, মটরশুঁটি, শাকসবজী ;
 একটিকে বিবিধ ফলমূল ; অপরটিকে পিঁয়াজ,
 রসুন, জাড়া, লুঙ্গা, হলুদ প্রভৃতি মশলা,—
 সেই একটা বিভাগগুলি পরিপূর্ণ করিয়া
 রাখিয়াছে। এরূপ বিচিত্র ফলমূলের সমাবেশ
 ও প্রচুর্য্য কুত্রাপি দোখ নাই। প্রবেশ ও
 কপিপুর্বে পরিচিত কসের মধ্যে

[illegible]

কতকগুলি কারণে পানের অয়োজনটা বড়ই তীব্র হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা জাবিতেছেন তাহা নহে, —এই কল কলময় দাছো প্রাণ হাতে করিয়া, ক্ষুধিত্তি কিনিকটুকু পর্যন্ত কাহারও ছিল না। জাপানে এমন প্রকৃতিটা মধ্যে মধ্যে উদ্ভূত হইয়া একটা অস্থি আনিয়া দেয়। তত্বে আন কাণ্ড কড়কু গগনৈ দিন শুভবান হইতেছিল। এতদ্বারা পানটাই সমান বসন্ত বসন্ত। তখন আমাদেব মধ্যে ছ' একটি পানের পোক ছিলেন। তাহা চটক, একটি কুপসে পোক দুইটি চীন পান বোচিতেছে। অতঃপর, তখন তাহাদের নিকট উপস্থিত হয় গল, এবং দরদর না করিয়া এক জন পান খাওয়া দিবার অনুমতি দেওয়া হইল। তাহারা দুইটি কুপি বাসি করিয়া পাননির খাওয়া, — “যশাই” তা কুপি বাগায় যেন, চেহারা তুলবে না।” অল্পদূর ভায়া বলিলেন— “তা পোকের পোক তুচ্ছ কর’ পরে খাব, তুচ্ছ না পোক পানে চুপ করেই প্রাণ লাগিয়ে ও, তা পানটিকে, রিক্ত ভাবে ছাড়িয়ে এ পানিরা আন যোগি দিহ’ স্মরণার্থী কাবনা দিল। তাহারা এ বিলি কর্তব্য করিতে হইল। এক্ষণে আমার চীন পণ্ডিত পৌছিবে না। তাহা হলে কিন্তু কোন কঠিই অনুভব করিলা না; এতই যোগায়েম যে, দন্তের নিকট থাকা খুবই বিনীতভাবে প্রার্থনামূল্য করিল। অতঃপর অপরীগুলি কীভাবে নহে, —চীনে কতক বটে। উত্তর চীনে পান পাওয়া যাবে না, সুতরাং উদ্দেশ্যের উপযোগী আয়োজন লওয়া হইল। প্রত্যেক পানটি এক পয়সা হিসাবেই পড়িল।

এই শিবসংদেশে উদ্দেশ্যে পানি কীটরী, লক্ষ্যগর প্রভৃতি নগরে পানি বানাইয়া বাণ ক্রিয়া থাকেন। কীটরী স্বাস্থ্যকর, বিকৃত বসতি এবং মনোমুগ্ধতা। নহর হইতে তাহা অর্জিত হয়। উত্তরে, এর নিম্ন হইতে প্রায় সাত ক্রোড়, অষ্ট মাইল চায়া। নহর ও অন্যান্য নীলদেশে পৌছিবে না। পৌচ্চ ট্রামে (Tram-tram) যাওয়াই হইল। প্রতি দশ মিনিট অন্তর, প্রায় ৩০ জন আরোহী, তাহা পান হইতে একখানি গাড়ি উঠে যেতে উঠে হইতে একখানি গাড়ি নিয়ে নামি গেল। পানিতে পানি পানি গতা অত্যন্ত এবং প্রধানত তীরের সাহেব (Tire) সাহেব তাহাদের পান ও অপরগণ পানচালিত হইতেছে। পানি বাস্তবিক পক্ষে হয়। তাহাতে তাহার Single tram অথচ দুইখানি গাড়ি, তাহা সমস্ত হাওয়া মনপথে তাহাদের দক্ষতা হয় সেখানে একই পাশ পাটি ইবার গবে বা Sidin এর দ্বারা আছে। একখানিকে সেই Sidin এর দ্বারা অপরখানিকে পথ ছাড়িয়া দিতে হয়।

আমার সহযোগী সফলতা বৈদ্যকালে “বনে ফোটা বাটা দিওনা” বাক্যে প্রায়শ্চিত্ত গৌরব লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তাহারা এই Tram-tram এর সাহায্যে শিবসংদেশে পৌঁছবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। আমি তাহাদের সাহায্যে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তত্বে বলিলাম— অজিহান-বাপদেশে উত্তর চীনে চলিয়াছি, যদিও যথেষ্ট কষ্ট হইতে পারে, তাহা সশ্রমে

বিষয়টা সিদ্ধাপূরে—নিজেদের মজরে
 ফেঁদে নাই, কারিগর সেখানে ঘোরাফেরাটা
 খাতির সাহায্যেই সমাধা হইয়াছিল। কিন্তু
 হুকুম সহজে, পলকজোড় লুপন কালে, কি
 ইংরাজ, কি খানি, কি কাপানী, কি চীনা,
 কি, জঙ্গরাট, কি গারোবা, কি বোঝাইয়া
 সকলকেই বেসকাবোজি, মর্যাদা ঢাকা
 পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেনে, জাহা, জাহাজের

আমিও আসছি, এক সময় জামুগুড় পারের
অমনি ত আমার মজারককে গিয়া ধরতে পারি
না, আমার এই গল্পকু ভাঙিয়া গেল। একটা
স্বাধীনতা আন্দোলন গিয়া। আমার জামুগু
না হয়, আমারের বাক্যের সরকার হয়ে গেল
খেতে পারে অমন।”

“কিন্তু তুমিও রাগ করে একটা হত জ্ঞান
করিল—কেবল আমারের জেলের ছেলে, কি কি
কি গুর একটা হুকুম হয় না?”

“আমার আর হুকুম নেই তবু কি,
বাক্যে ভগবান আমারে রেখেছেন তার আর হুকুম
কিসের? নইলে কি অমন সোনার আমাই
যায়।” বলিয়া তিনি একটা বৈদ্য মজল
চোখেই দেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

“লাতি।”

“কি মা?”

“আমি বলি, তুমি একখানা তোর গুণকে
চিঠি লেখ, তিনি এসে এখান থেকে তোকে
নিজের কাছে নিয়ে যান।”

“আমি কোন্‌দিন আছি, কোন্‌দিন নেই
—তোর ছবির বজার দাকা উচিত।”

“আমি যাব না।”

“তবে মর। তোর বা পুত্র তাই কর।
হতভাগাটা গেল কোথায়? মানিকিয়া বলি
ও মানিকিয়া।”

বলিতে বলিতে তিনি মানিকিয়ার ঘরের
সম্মুখে গিয়া দেখিলেন, একটা কি বহনকার
মায়ায় চাকিয়া গিয়া সে উঠিয়া আসিল।

“হতভাগাটা কোথায় রে?”

মায়ায় হইয়া ধরয়া কিছু কক্ষের সে কছিল,
“হি হবে তাকে নিয়ে তোমার? সে অনেক

কি জানি।”

“আমি কতক কক্ষের জামার আঁকার
মিলনে।” মায়ায় ধরয়া ধরয়া বলি।

“আমি এসেছি না।”

মায়ায় ধরয়া হাতকুইয়া মায়ায় ধরয়া কাঁতা
হইয়া ধরয়া চাকিয়া মায়ায় ধরয়া হাতকুইয়া
টানিতে তাহাকে বাহিরে আনিলেন। গলা
ধরয়া মায়ায় ধরয়া দিতে মায়ায় ধরয়া হাতকুইয়া
কহিলেন, “বেশ একটা মায়া, মায়ায় ধরয়া।”

মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া।

মায়ায় ধরয়া চুল মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া
ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া
মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া

কিছু বিরক্তভাবেই মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া
মায়ায় ধরয়া, “কি মায়ায় ধরয়া?” “না, তুমি মায়ায়
কর।” মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া
মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া
মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া

মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া
মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া
মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া

মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া
মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া
মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া
মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া

মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া
মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া
মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া
মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া মায়ায় ধরয়া

সুখের ক্ষেত্রে উভয় দিকই সম্ভব।
কিন্তু পরমকক্ষে, অসম্ভব হ'ল করিয়া
পালিয়া থাকিয়া শেষে কষ্টরূপে জটিল
কল্যাণ।

হুসেইন কোমিউনিস্ট হ'ল কিনা।
“একটা কাজ করবেই তো। সব খেটো চুক
মিটার।”

“হুসেইন ভবুও কোন উত্তর করিল না।
“আমার কাছে বাকী পাঠিয়ে দাও, তা-
হলে দুইমুণ্ড নিশ্চিন্ত হও, আমিও ছাদন ছাড়া
ছাড়িয়ে বাছি।”

“কি লিখে দাও না, আমার কোন আপত্তি
কোন।”

“তা হুসেইন আপত্তি থাকবে কেন?
একটা লগাইই বই তো নই।”

হুসেইন কি চেনে একটা প্রত্যক্ষ দিব্য
কাজ চলাই করিয়া উঠিতোছিল কিন্তু সাক্ষাৎ
হুসেইন।

“আমি বাপের বাকীও দাব না। প্রথমেও
থাকিবো না।”

“তবে কোমার আরে?”

“যেহে বাকী।”

“সেটা একটা বিশেষ কিছু মন্ত বড় কাজ
নই, একমিনিটেই হতে পারে। আমাদের এ
উপায় আছে, করতেও পাবি।”

বিজ্ঞানভাষ্যে পায়ে উল্লস লুটাইয়া পড়িয়া
হুসেইন বাকীও উঠিল, “কেন বলাও?”

“তুমি বললে কেন?”

“তুমি বলাও কেন?”

“কেন বলাই?”

“কেন বলাই?”

“কেন বলাই?”

বিবাহের প্রথম মোটে কয়েকদিনের মধ্যেই
কতিপয় দিন সে যে একটা বিবাহের কার্যক্রম
শুটি করিয়াছিল, তাহা ছিল কল্যাণ কল্যাণ
এখন সফলভাবে, একটা নিজস্ব বাড়ি
হুসেইন কেন একটা করিয়া থাকতেন। তা
ছাড়া, অপর একটা নতুন জালে আবদ্ধ হির
পরিচ। শ্রুটি করিয়া তাহা, আবার সেই ভয়
ভূপের মকিবানে ঈশ্বর একটা অভিনব স্থি
কর।

“তুমিই তো আমার বাথার তুলেছিলে
আমি যে বেকশ্বা, আমি যে নিজস্বা, সে তো
তোমারি অস্ত্রে। এখন পায় খেৎলালে আমি
আর কি করবো।”

সে আর পাঁচবছরের কথা। ক্ষেত্রে সে
বাস্তবিকই বড় ভালবাসিত। মাকেও সে
ছাড়িয়া থাকতে পারিত না। বিবাহান্তে কল
শবার বাত্রে নববধূকে সে যথেষ্ট উপদেশও
দিয়াছিল। মায় সেবা কি করিয়া করিতে
হইবে, ক্ষেত্রে তাহাও কি চক্ষে দেখে
হইবে - সে অনেক কথা।
মোটো দশ বৎসব বয়স। তারপর কল্যাণ
দেওবাকে সে যখন খেলাব সার্থী করিয়া বসিল,
মায় কাছে কাছে দবারাজি ছারার মত কাজে
অকাজে ঘুরিতে লাগিল, সে তখন আওবিস্ত
আমির দিয়া, প্রতিমুহুর্তে অনাবশ্যক মুক্তি বদলা
টয়া, প্রত্যেক সকল বন্ধন হইতে ছিন্ন করিয়া
আনিয়া নিজের স্বকনে দৃঢ় করিতে গিয়াছে।
মায় বুদ্ধিতে পারে নাই, রাজিক একটা তুচ্ছ
প্রলোপে হুসেইন গুলু গুলু করে কতটা গুলু
শোথই পরিণত হইতেছিল।

“আমি করেছিলাম ক বেশ, তুমি না হলেই ত
পারতে।”

“আমি কি জানি না কেন?”

“কেন তুমিই হোলে?”

“তবে হও না কেন?”

গভীরভাবে অস্থিরতা উদ্ভব হিল, “তাই হতে হবে।”

হুয়ের বাহির হইয়া গেল। মার ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, “তুমি মারি না আজ যমুত দিনটা কিছু খাওনি?”

“পোড়া পেটের ক্ষেত্রেই তো সব ভুলতে হয়—ভাবচি না খেয়ে কদিন যায় দেখি।”

মার পারের কাছে, বিছানার বসিয়া, হাত বুলাইতে বুলাইতে হুয়েল জিজ্ঞাসা করিল, “আমার উপর রাগ করচে না?”

“আমার আবার কে আছে যে রাগ করবে?”

“কেন আমি কি কেউ নই?”

“পেটের ছেলেমেয়ে আবার কে কবে আপনার হয়েচে?”

হিসাবের খাতাটা ও টাকাগুলো মার পারের কাছে ফেলিয়া দিয়া হুয়েল কহিল, “তোমার দুটি পারে পড়ি না, আর কখনো এমন করবে না। কেতুকে আমি কালই ভাঙি করবার বন্দোবস্ত করছি। ওঠ, থাকে চল। লতি, মাকে খাওয়া তো।”

বৌদিদির ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রতিধ্বনি কহিল, “তখন থেকে তো মাকে বলচি, থাকে না তো আমি কি করবো!”

“আজ এই খাতাখানা আর টাকাগুলো মার কাছে ফুলে রাখ।”

কাত্যাবনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেতু খেয়েচে?”

লতিয়া উত্তর দিল, “সে, হ্যাঁ এই মান-কিয়ার কাছে গিয়েছে।”

“কেনে আন?”

কেতুকে আনিয়া যা খাওয়াতে বসিলেন। সে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া মানিকিয়ার কাছে গুঁতে বাইরের দরজা কিছু ব্যস্ত ছিল। কাছ জোখাও কলসীতে জল নাই দেখিয়া লতিয়ারনী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “টাই কবে রে এক গেলান জল দিতে হয়, তাও কি কাকর পোড়া চোখে চেকেনি। একটা লোক না খেয়ে মরচে, আর সকলে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বুসলেই হোলো।”

কেতু কহিল, “আমার খেতে বসে তোরা পায় না।”

“তা পাবে কেন? হতজগা হয়ে অয়েচ বে?”

গোপেশ্বরকে ছাড়াইয়া আসিয়া পিসিয়া কহিলেন, “কি হয়েচে মেজবো?”

“কি হয়েচে? চির! খেতে বসিয়ে এক কোঁটা জল কোথাও পাচ্ছি না।”

“আমি দিচ্ছি।”

অন্ধকারে হাতড়াইয়া একরাশ জল আনিয়া কেতুর পাতের সামনে পিসিয়া বসিয়া দিলেন। কেতু জল লইয়া এক চুমুক খাওয়ায় তাহার মুখে কি একটা গড়ের মতন তৃপ্তি প্রকট হইল। বলিল, “একবার আবেঁচি ঘরোয়া না, জলে কি হয়েচে।”

আলোর কাছে পাতটা উলুত করিতেই সে দেখিল একটা কি ময় পোক—চিরা ভট ভট করিতেছে। লম্বা তখন মার ঘানে কলো হইতেছিল।

যা বলায় কহিয়া উঠিত অন্ধকার

শিখরী কক্ষপাখীর বুখখানীর প্রতি চাহিয়াই
 সে নিতমস্তকে একেবারে কিছুই যেন হয় নাই
 দেখাইল শেষ পর্যন্ত নীরবে বহিয়া গেল।
 কহিল, “আমি তো তল একটুও খাটান মা।”
 রাজলক্ষীর দিকে কবায়চক্ষে একবার
 চাহিয়া কথায়নী কহিলেন, “একবার দেখেও
 দিতে নেই মলটার কি মরণবাচন আছে,
 জিজ্ঞাস্য কি?”

রাজেশ্বর কাণায়নকে কহে পাওরাই
 গরিল না।

“বাবু চলে—তোমার কামাতে কোথাও
 চলে যাই। সেখানে মা-ব্যাটার ন্যায় থাকবো,
 আমি ভিক্ষা করে এনে তেঁকে পড়াবো।”

“না, মার্কিন্দা।”

“তবে শীগগির শীগগির মানুষ হয়ে নে না
 বাবু।”

“তাই হবে।”

“তোমার শরীরের কষ্টের দরকার, আমি
 মাইনের টাকা থেকে দব দেবো—তুই পড়
 বাবু।”

(২)

শ্রীশঙ্কর উল্লেখের ধারে চন্দ্রশেখর তাঁর
 শুল্ককারে ক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এতৎ
 কর্তৃক কাছার তাঁত পড়ি গলে চমকিয়া চাহিয়া
 দেখিল। শ্রীপ্রতাপকল্লভের প্রফেসার মস্তার
 বিবৃতিজন্য লাহিড়ী। ক্ষেত্রে ব্যক্তি পায়ল
 না, একই বেষ্পর্শ তাহার গোপা কিনা।

লাহিড়ীবাবু কহিলেন, “তোমার নাম
 কল্লভ মৈত্র, না?” ক্ষেত্রে শুধু তাঁহার
 স্মরণেই ক্ষেত্রে দৃষ্টি নিবন্ধ করিল।

“তুমি কল্লভমবাবু চাহি। একটু ক্ষে
 পড়চো—তোমার তাইও তো তোমার সঙ্গে
 পড়ে? হুঁ তোমার পড়া তেমন হয় না—
 সাজা জাচো, ঐ যে বাঙা দেখতে পাচ্চ, না
 না এসো, আমার সঙ্গে এসো।” বলিয়াই
 তিনি ক্ষেত্রে গাএবান দবিয়া চলিলেন।

ক্ষেত্রে মরণবাবু মঃ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে
 চলিল। বাড়ী পৌছিয়া কামারী জাঙ্গল নথ
 কোলকে বৈঠকখানা খুলিয়া নিচে বাসায়
 ক্ষেত্রে দিকে কিরিয়া কহিলেন, “বৌসো।
 নথ, দো দেখা চা—বাঁচর কুচ বিসকুত এঁচ
 কলদি লাত শো। জাখো, এবাংনে এখন
 কুবনে পাচন এসো, এবাং দুয় কুব না।
 বাঙাতে কাউকে বলবার দরকার নেই, তুমি
 বা হুবিধে বোব করবে, বুকেচ? তোমার বা
 কিপু? ডা, অক্ষেত্রে মরণবাবু কামি বলে দেবো।
 চানবে আন তোমার কুড়, কেমন? অমু না
 একবার এঁচক এসো তো মা।”

মরণবাবু একটি দ্বারা বছরের মধ্যে
 আসিয়া ঠিক দাবাশেরই মত বিস্কুত চকু
 পাইয়া তাঁহার চেহারের সত্যতার উপর হাত
 দাঁড়া দাঁড়াইল। লাহিড়ীবাবু চোলা পুঠ,
 লাহিড়ী হুঁচিও বেগীর চোলা কহিলেন,
 “না, এই তোমার ক্ষেত্রে। দেখে যেন আমি
 পদ কোনো সময় বাড়ী না গাবি, তোমার
 দাদার কিছু বস্তু না হয়। এতৎ লাত, তুমি
 কি মরণ উত্তর কিছু জানো না? এঁচি মরণ
 “যেখা চা কোরে কললে দেখাচ। লাত
 দাদা তো পেরে। না, বিস্কুতের চিন্তা
 টিপার উপর খাখো হো অমু।”

“বাবা, শুধু বিস্কুত কেন দাদার কল্লভ

আনালে, ওপরে মা নিজের হাতে খীর-
মোহন, আরম্ভেশ, খাজা-টেরী কোরেছেন,
আমি জানি। মাকেও ভোক জানি।”

“বাড়ি মা যাও তোরিবা ত্রো এখন কখন-
দিন মা। আমি তো একটা নিদ্রা বাক্য,
তুমি খিটখিট করানটে জানি।”

ফেব্রুয়ারি মাসের কাক পানপাতি তাম
মরিয়া দিয়া সে একটি ই বস্ত্রঃ কবি-
লাগিল। মা কলিবা উদ্বিগ্ন, “নাথ দান, খারব
চোলে তুমি, লজ্জা করায় তোর।”

বড় কাঠি অক্ষ চাপিয়া সে কছিল “না মা
লজ্জা তে। করিনি।”

কোয়েলার আশ্রিত, কইরের জাননা দিয়া
দেখান পোড়ো চুটিয়া আশ্রিতা অমল তামি
হাত মাল।

“দেখা, বাবা মাজ আপনান তরু একটা
বড় মজার জিনিস কোর। দেখেচেন দেখাবেন
কাজন।”

কবর তুকিয়া ক্ষেত্র, কবিলা ব এক বিলাস
নামপাতি। একটি পলিকার বাক্যক অল-
নারীয়া ক একত্ব টুকিয়ে ব কোটি এল-
খানি টেরিল, ছোট মনবাতি, ওয়া, মৌরিকার
এক পাশে এসে টি বিলিমালায় অজ্ঞানকে
একটি মৌল, বাকোনি ক একটাল তরু সমাপ,
কলমদান, কৌচের মোহন, কলমাপজিল।

“এ সব কেন?”

“আপনার। কল খোদ আবার মোকা
বই-টাই বয় আনতে বড় তরু হয়, তাই বা-
এনে রেখেছেন—আমি বিকাল সেড়া-
বেড়াতে এসে পড়ি যাবেন। খাজা আনুন।”
আবার সে তারিখ হাতমাল।

মা আসিয়া কহিলেন, “আজ এসেছে,

একটু বনা, হাওয়া খুব, তা মা টোম-টোম
প্রিয় নিরে বেরাচে।”

“তাঃ, বাবার বর দানকে দেখানো মা
বাই?”

“তা দেখানোর পাগলী, দেখান—এইমাত্র
এলো একটু জিরু।”

“না, লাল বাড়ী থেকে তো আসে, দেখান
বই হাতে নেই, অনেক জিরায়চে—না দান
তুমি জিরো নি?”

“দুশ বোকা মোর। মা বাবা, তুমি
বোলে—না, একখানি পাখা নিয়ে আর।”

ক্ষেত্র আনখানি ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিয়া
আজ্ঞা গেল। বস্ত্র ফিরিল না।

মা কহিলেন, “কিহে পাখা আনতে কি
বুড়ো হয়ে গেছি?”

পলিকার আশ্রিত হইল। আশ্রিত আশ্রিত,
“কিহে আমি আনব না, যাও!”

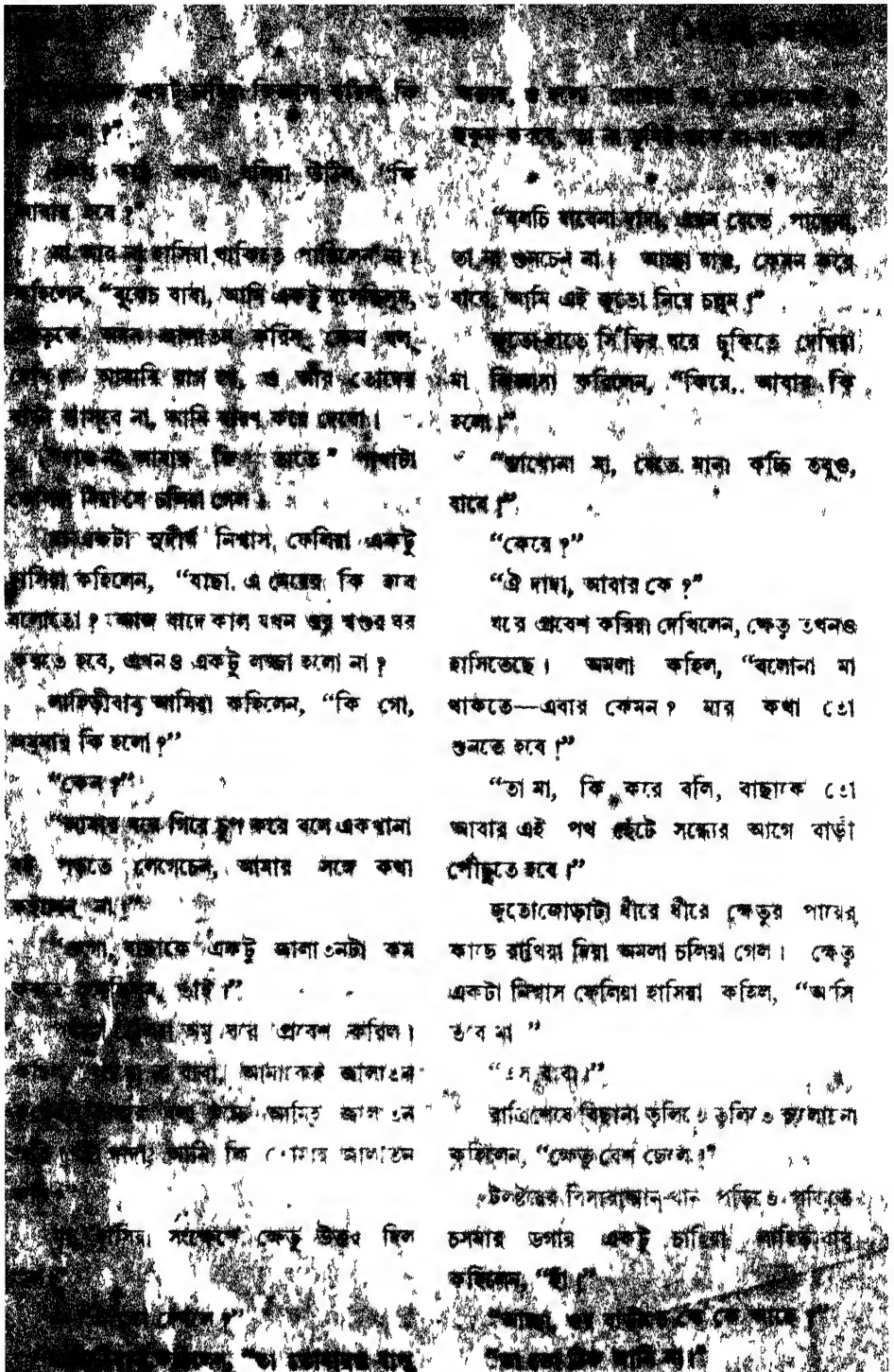
“নাও বাবা, পাগল কোয়েল—কি দেখাবে,
দেখান। বি দাবার আগে শুধু মখে চলে
যেও মা বান, ববন যেন পাত।

অলসে ছাণ তুকিয়া দিশান্তে না করিয়া
কো-বই-টাই বয়। কহিল “চ ন দান, মা
বড় চট, দান বড় ভালো।”

তামি মা কহিলেন, “বিরে রে মোক কি
কয়ে হবে, ভেবে পারেন।”

একখানি পাখা ছিটয়া অমল কোয়েল
পানি করিতেছে দেখিয়া মা কহিলেন, “কিহে,
আজ যে বড় বড় হয়ে?”

অমল কোম উত্তর কহিল না। বাড় বীড়
করিয়া সে বাতাস করিতে লাগিল। “আজ
তো খাজা, এ মেয়ের কি হবে? একটু-টাই
হাস, একটু-টাই আভিমান।” দেখে মখ তুমি



না জানেন নিশ্চয়।

“তা তো নিশ্চয়।”

“জানিনা আর জানিনাবাই তো প্রব বড়

কি?”

“আই কি?”

“ওর এক মেজ-ডাই আছে না?”

“হ্যাঁ, আছে তো।

* “সে কি করে?”

“সেও গড়ে।”

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

“বাছার পড়ায় খুব মন।”

“হু, মাথাও বেশ।”

“আজা অশীর্বাদ করি যেন ভাল হয়।”

“খুব ভাল কান্না পাশ হান।”

“বড়ী ত কি কেউ ওকে দেখে না?”

“বোধ হয়।”

“কেন এত লোক আছে তাবা কি
কবে?”

“তা তো জানিনা।”

আবার কিছু সময় কাটিল।

“ওরা মৈত্র না?”

“হ্যাঁ।”

“ওবে তো বেশ হয়।”

লাহিড়ী বাবু চাহিয়া দেখিলেন।

“কি বলচো?”

এবার শব্দভাষায় স্ফলার্চনা করিলেন, “না,
বলচি—অমর সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না?”

বিস্ময়ভরনায় লাহিড়ী বাবু করিলেন,

“কারণ সন্তান কি হয় না বলচ?”

“কেন, কেনের সঙ্গে অমর বিয়ে।”

বইখানা আবার টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া

লাহিড়ী বাবু করিলেন, “কি করে বলে আমি

বললাম না। তবে পড়তে আরও ভাল হয়।

যেবে। এই কতকই কি আমি বলি তোকে

এনেছিলুম। যাক, আর কখনো কখনো কথা

বুঝে এনে না, মনেই মনে নিজে না। কেন

কি, তাববে, লোক কি বলবে?—কিন্তু

পান, হাইয়া আখার গিনি, বাড়িতে বসিয়া

গেলেন।

স্ফলার্চনা করিলেন, “তবে অমর”

ওবে অমর তাবে মিশতে পাও কেন?”

“বোধ হয়, মাছে চোখ গিলবে বলে।”

“সাগের কথা এত কিছু নেই কিন্তু এতটা

গাল নয়।”

বইখানা আবার টেবিলের উপর রাখিয়া

দিয়া লাহিড়ী বাবু করিলেন, “আখো” এত নীচ

মন বেখো না। কেন, তাতে কি হয়েছে?”

“এতে নীচ মন কিসের দেখে? তুমি

পুত্র মাতৃষ, মেয়েমানুষের কি বুঝবে? মেয়ের

এক একটা দিন কাটতে, আর হাড়গোড়

সব বুকের মধ্যে সঁধিয়ে যাচ্ছে, সে থবর রাখো

কি? বড় হচ্ছে তা জানো?”

“জানি বৈ কি। বিয়ে দিলে তিন হেলে

মাও হোতো।”

“যাক, আর কিছু বলবে না, রকমারি

হয়েছে। তোমার ছাগল, তুমি লোকের দিকে

কেটো।” বলিয়াই তিনি রান্নাঘরে চলিয়া

গেলেন।

“এই যে, এসো বোসো। নাথ, কলখারার

জানো তো কে।”

নাথ একখানি রেকাবিজে। কিছু দিষ্ট ও

কল আনিয়া কেতুর সমুখে রাখিয়া দিল। অমর

আসিল না।

লাহিড়ী বাবু করিলেন, “তোমার প্রাণের

দেখে আমি অনেক লোক হাট কেতু।

এখনি করে বেগুনালি পাত্রে
কিছু তিসনে পাশ জো করবেই,
কিছু তিসনে কাট করেও পারে। কচুচ,
কিছু তিসনে কাটাতে হলে, এই টাইমসেন
কিছু তিসনে, জিউকন, গ্রানারে, প্রেডেড,
কিছু তিসনে সেলেই হলো, তারপর অল্প সর্ষ
কিছু তিসনে করে। অল্প কিছু এনেচ ?”

“এনেচি।”

“কই হাও জিউ কনাপটা টেনেছিলো ?”

“হী, যেটাও এনেচি।”

“বেল, বেশ, বেশ। সে অকটা কসুতে

পেয়েছিলো।”

“হ্যা।”

“বেশলে হ্যা! আমি তো কবাব
তোমাকে বলে আসছি কোরশনগুলা
কচুচ: আ হাওড টাইমস পড়াব। বতরুণ
না তার প্রত্যেক শব্দই মান ডেকনিটল
বুঝতে পারো, প্রোসিড কবাব না। অনালস
এও অনটল হাউস ডন, তুমি কোনো বিহারই
শিগুর হতে পারো না। আর জিউব
হুচ মাপ, ফ্রিটি—অন্ন মনে রাখবার মত
আর কিছু নেই, ইউ উইল নেভার ফেল ইউ
আজ্ঞা, শিবাজীর জীবনটা ম্যাপের সঙ্গে
বোঝাও তো কে?”

মানচিত্রের সাহায্যে চরিত্র গণনা চলছে,
কিছু তিস কচুচের জিনিষাই হুলাচনা আসিরা
কচুচ: হাওড টাইমস পড়াব। বতরুণ
না তার প্রত্যেক শব্দই মান ডেকনিটল
বুঝতে পারো, প্রোসিড কবাব না। অনালস
এও অনটল হাউস ডন, তুমি কোনো বিহারই
শিগুর হতে পারো না। আর জিউব
হুচ মাপ, ফ্রিটি—অন্ন মনে রাখবার মত
আর কিছু নেই, ইউ উইল নেভার ফেল ইউ
আজ্ঞা, শিবাজীর জীবনটা ম্যাপের সঙ্গে
বোঝাও তো কে?”

মানচিত্রের সাহায্যে চরিত্র গণনা চলছে,

বাবু কালশন, হ্যা, বাবু কালশন, হ্যা।

এমন প্রত্যাহই কেউ পড়িতে পার, কিছু
কচুচ: হাওড টাইমস পড়াব। বতরুণ
না তার প্রত্যেক শব্দই মান ডেকনিটল
বুঝতে পারো, প্রোসিড কবাব না। অনালস
এও অনটল হাউস ডন, তুমি কোনো বিহারই
শিগুর হতে পারো না। আর জিউব
হুচ মাপ, ফ্রিটি—অন্ন মনে রাখবার মত
আর কিছু নেই, ইউ উইল নেভার ফেল ইউ
আজ্ঞা, শিবাজীর জীবনটা ম্যাপের সঙ্গে
বোঝাও তো কে?”

কেউব বুকখানা কে কেন থাকিরা থাকিরা
কচুচ: হাওড টাইমস পড়াব। বতরুণ
না তার প্রত্যেক শব্দই মান ডেকনিটল
বুঝতে পারো, প্রোসিড কবাব না। অনালস
এও অনটল হাউস ডন, তুমি কোনো বিহারই
শিগুর হতে পারো না। আর জিউব
হুচ মাপ, ফ্রিটি—অন্ন মনে রাখবার মত
আর কিছু নেই, ইউ উইল নেভার ফেল ইউ
আজ্ঞা, শিবাজীর জীবনটা ম্যাপের সঙ্গে
বোঝাও তো কে?”

নিশ্বাস ফেলিয়া মানকিয়া বলিল, “আমি
কদি লেখা পড়া জানতাম বাবু।”

“না হলে কি হলে ?”

“আমি সমস্ত পড়াই নোব বাল দিত
পাবতাম।”

সুদূব অতীত একটা কথা স্মরণ করিত
কনিত সে অল্পমান করিল, “হী, নাগকথা
মান পাড়াচ বাবু?” তাড়াতাডি তাহার জীর্ণ
টুকটা খুলিয়া আনক হাতডাইয়া একটা
মোড়ক বাতির কবিতা আনিল।

“আমাব বালটনা। এক সরাসী আমার
এইটে দিরা বলেছিল, তোর ডাকে পরাস,
তাব সব কাজ সকল হবে। এটা সিদ্ধি কবচ—
বাবু পর।”

বলেটনা তাব ছেলে। বাড়ীর ছেলের মত
তাহাকে কেজখরের পিতা মাছুব করিতোলে।
এষ্টে স পাশ করিয়া সে বখন হুচ মাপ, ফ্রিটি—
অন্ন মনে রাখবার মত আর কিছু নেই, ইউ উইল
নেভার ফেল ইউ আজ্ঞা, শিবাজীর জীবনটা
ম্যাপের সঙ্গে বোঝাও তো কে?”

“না, মরিয়া! তুমি, তুমি, তুমি যোগে যেতে
না কিন্তু সে বেবল কথায়, সিনা। তুমি
অমায়িক তার চেয়েও বেশি।”

এবার ওপর বসিয়া, দুইজনেরই আশ্রয়
করিলেন, “ঐ যে, মানসিকতার কারণে, মাটল
ঘরে ঘরে যে! অজ্ঞান, মানসিকতা কি হোর
পড়া কল দেখে? জিজ্ঞাসা করে বসে? ঐ
জ্ঞো এক ছেলে, এক হাতে সমান চতুর্থা
চাপড়টা আটকে বাজে, তার অঙ্গ হাত বই
ঘরে পড়া জিজ্ঞাস কর তও ছাড়িয়ে না। পড়া
জ্ঞো আবার মান কথায়, কি? হস্তগত
মান-ইজ্ঞত কিসের? এখানে কোন ধর্ম
বলে থাকলে তো পড়া আশ্রয় নিখুঁত হবেনা
—বা শীগৃগির, বা বশিট, হোরো কান্ড পড়া
জিজ্ঞাস করে নিগে না।”

পিসিয়া কহিলেন, “আগে ওতখন তুমি-ই
হুরো, তখন তুমি-ই কেন তেজে নে মা গগা।”

“অত ডাকাডাকি কখনো সত্য জ্ঞান
নেই—গোপীর মত। তুমি জিজ্ঞাসা করেও
তো যেতে পারে। অজ্ঞান পড়িয়ে নাও।”

পিসিয়া হাজার পাছাপটে মনস্তাত্ত্বিক হাত
বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, “অজ্ঞান কথ আশ্রয়
বা। ঐ তো ডাকতে।”

হঠাৎ কাণ্ডারনী হাজার হস্তধানা পথিয়া
হিড়হিড় করিয়া টানতে টানিতে কুণ্ডলের
হুরর মধ্যে পুরিয়া। এ কহিলেন, “মত ভাল
কথার কেউ নয়, তারাই—অজ্ঞান হাতে ফেলে
কিনা জ্ঞানো।”

—“এতক্ষণ আস বসিল না বসিল?”

কেতু কেন উত্তর দিল না।

“এতক্ষণ আস বসিল না কেন? তুমি?”

কেতু তখন নিকট

“কি, কখনো হোরো?”
হুরের হাতকে তান করিয়া টানিয়া
আনিয়া দাঁড় করাইয়া দাখিল।

“কই কি পড়া যাতে, জিজ্ঞাস করে।

কেতু তখনও বইখানা হাতে কলম
করিয়া দাঁড়াইয়া।

এক চক্ষু মারিয়া, অজ্ঞানকে বিদায় করিয়া
দিয়া হুরের করিল, “আমি কি তোমার
ককমের চাকর?”

দৈনিক আহার ব্যাপারটা কোন প্রকারে
সারিয়া গিয়া নিশীথ রাতে দৈতকপানা ঘরে
উপর হুরা-পড়িয়া ক্ষেতু চরল শিশুটির মত
কুঁপিয়া কুঁপিয়া কাঁদতেছিল, মানসিয়া হাজার
হাত মরিয়া তুলিতে গেল। সে উঠিল না।

মনদভাজে তখন পান সাড়া ও আলপ
চালতেছিল। হুরের পুস্তক পাঠে নিমগ্ন
অথবা প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠ।

“সাঁতা বোদি, আশ্রয় হাত—সান্দা হাত
কনবে।

“হী লো হী, মোহাণ তো কত? আর
একটু গল্প হোক।”

“না, আব গল্প নয়—তোমার কি, তুমি
তো শুভে চলে।”

“অমন শোয়ার পোড়া কপাল?”

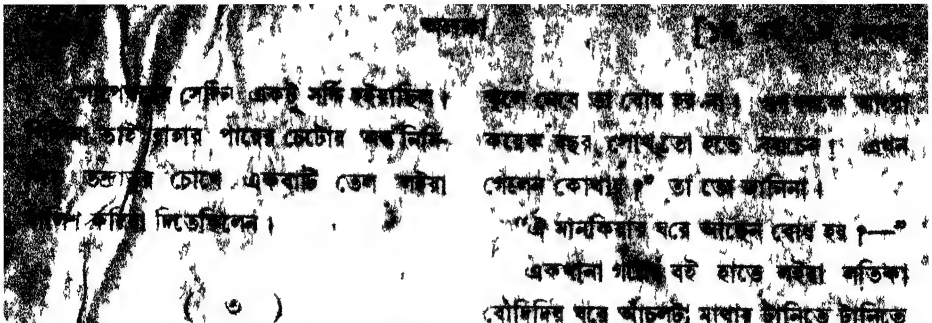
“নাও গো বাও, তুমি বড় মিথ্যাক।”

“মিছে কথা কইচাঁকি সাঁতা বোদি, এক
বার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভজন করে আয় না
লো?”

“নিশ্চয় জোগ আছেন। আমি, বাজি
রাখো।”

“আজ্ঞে সাঁতা-সাঁতা বাজি।”

“বাজি, তুমি-ই।”



সেইসময় সেদিন একটু সুবিধা হইয়াছিল।
তাই তাহার গায়ের চোটার কতকটা
তক্তার চোরে একবার তেল দিয়া
পাল করিয়া নিজেছিল।

(৩)

কিন্তু হালি হুড়াইরা সুরেশ্বর আসিয়া
কহিল, পিসিমা, আমাকেই শুধু ছাড়া না আর।
তোমার গুণের ভাইপোজিক যে আমিট কেবল
সেকনডের দেখি — তা নয় — কলেজের
প্রিন্সিপ্যাল মিটার মূর কি লিখেছেন, এই জাখো
— পিসিমা চিঠিখানা সে তাহার গায়ের কাছে
ফেলিয়া ছিল। চিঠিখানা খানিকটা ভলেব উপর
পড়িয়া গিয়াছিল, পিসিমা ছাড়াভাড়া তুলিয়া
লইলেন। আঁচলে মুছিয়া সুরেশ্বরের হাতে
দিয়া কহিলেন, “তা আমি আব ওর কি বুঝব
কি হয়েছে?”

“হবে আবাব কি জন্ম যেতে হবে, তাই
হতাং আফিসে মনে পড়াতে মিটার মূরকে চিঠি
লিখে জানতে চেয়েছিলেন—ওদেন পাসে স্টেজ
ঠিক আছে কি না? এখান থেকে নিয়ে গেলে
জন্মের ফুলে ভর্তি করবে কিনা, আর এক জামিন
দিতে পারবে কিনা। স্টেজের জবাবে লিখেছেন,
আপনার কেজ্জাইক আমি কোনো মতে
ছাড়বোনা, যে কাট হবার মত ছেলে। তাকে
বসি নিতাই নিয়ে যান, রেজিষ্টার আমার
বিশেষ বাল্যক, তাঁকে লিখে জন্মতেই তার
জন্ম এই ফুল থেকে পরীক্ষা দেখার বন্দোবস্ত
করা দিতে পারি। তবে ছোটভাইটি, অর্থাৎ
হিমা, কেতাকে আপনি অনারসে নিয়ে যেতে
পারেন—সে যেমন ছেলে তাহে পাসে স্টেজ
পূরো জরুরি হবে এক, শেষ সব কোনো

ফুলে যাবে তা বোঝা যায় না। আর অন্যক আফিসে
করেক বছর পোখতা হতে পারেন। এখন
সেকেন কোখাই?” তা জেজানিয়া।

“এ মানিকমার ঘরে আছেন বোধ হয়?”

একখানা গাছের বই হাতে লইয়া লতিকা

বৌদিদির ঘরে আঁচলটা মাখার জন্যেই টানিতে

চুকিতেছিল। সুরেশ্বর কহিল, “লতি কেতুকে

ডেকে আনতো?”

“সে কোখায় জানি না।”

“ঐ হয়ে—”

“আমি দেখলুম নেই।”

“তুই যানা একবার।”

“নেই বলচি, তবুও—”

লতিকা কেতুকে ডাকিয়া আনিয়া। হাতে

তাহার ইতিহাস আর একখানা ভারতবর্ষের

কাণ্ড মানচিত্র।

“কি হচ্ছে আপনার? নিন্ প্রিন্সিপ্যাল

মশায় কি লিখেছেন, দেখুন?”

কেতু মাপখানা মুক্তিয়া পত্রটি আছোপান্ত

পড়িল, ব্যাপার কি ঠিক যেন তার বোধগম্য

হইল না।

“দেখচো কি? বাও, বছর তিনেক যখন

ঘোল-ই খেতে হবে, সার্টিফিকেট নিয়ে এসে

বাড়ী এসে জাবর কাটো, পোক্তো তো হতে

হবে! বছর-বছর বিদ্যা শুদে অতকগুলো

টাকা মাইনে স্তজতে তো পারবো না—

হোমসাইড তাতে ভাল। অনেক খেটেচো,

কিছু জিরেন্ তো চাই?”

পিসিমা তাহার গায়ের মাখার হাত বুলাইতে

বুলাইতে বলিলেন “আহা, তাতে আর হয়েছে
কি জুরো? কেল হওয়ার চেয়ে পাকা হবে
একবারে ও কাট হয়ে যাব করবে। সুকসেই

কি আর সন্ধ্যার হতে কখনো ফেরে না
হাস্যে চলেতে দেখে, কোনটি বাতাসে
কচি-বসে চলেতে শিখলে চলেতে ফেরে না
হতেও হৌ কতদিন যায়। কেবলো ফেরে না
বন্ধন পাশ করবে একবারে কচি-বসে

“সে আর এ জন্মে নয়।”
ওর জন্ত একটা নতুন ইতিহাস
উঠবে।

“না, তুমি ধোয়-দেয়ে যে যান্না
দিয়ে এসে গুয়েচ?”

“বাকসে খিদে পোয়া, খাও?”

“ক্ষেত্রে যে এখানে থাকা?”

“আজ আর তাব খেতে নাহ।
যা যা, নৌ হয়ত বাস আর
কবিসনে বসটি।”

“নাও, চাবি দাও।”

“আমি জানিনা কোথা।”

“তুমি জাননা? এ কে?”

“আমি ফেরে না।
কবিসনে!”

“তবে কি ক্ষেত্রে কখনো
করে থাকতে বসি?”

“আমি বসে না।
পরে যেখান থেকে ভিজে পড়ি
পূরতে হবে, সেখান
অভ্যাস করুক।”

“কি বাজে বকচো।
চিঠি দিয়েচো কি হয়েচ?”

“তবে আবার কি
কোটেলা?”

“আমি বেশী বকতে পারি না।
আজ রাতে না চাবি দাও।”

কিন্তু আরও কিছু কিছু
হাতদিগে ধরে গেলি।
যদি দিগে কবিতা, আমি
উচোখ বসে চলে যাব।

মিসিরা আসিয়া কহিলেন,
কবচা সেকবো, চাবি দাও।

চারি গাছটা ছাড়িয়া
উপবেত কেলিরা দিয়া কাত্যায়নী কহিলেন,

এই নাও, ধনের মত সব খেলাগে

“বাকসে খাও।”

ক্ষেত্রে খাওয়া বসিলে তাহার
টিব গোছা সমস্ত প্রকাণ্ড
উড়াইয়া দিয়া কহিলেন।

“কান্দায়া
মনেব ছাট গুলি কি কবে উলচে।”

“বাবুয়া, খা।”

“না।”

“এই আমার রয়েছে জাখ।”

“না।”

“তুহ না খেলে, আমাব মুখে কচবে?”

“কিহে নেই।”

“কিহে কি থাকে?
কততে নেই।”

“না।”

“লক্ষীবাবুয়া খা।”

“না।”

কাছে বসিয়া গারে হাত
জিজ্ঞাসা কহিল,
কোথায় বাবুয়া?”

“আছে।”

“কই, দেখতে পাচ্ছি না?
—আচ্ছা, বাবিনা বাবুয়া?”

“না।”

“তবে আমিও কবিয়ে
কবিয়ে কবিয়ে কবিয়ে

কিছুক্ষণ বিশেষ করিলেন, হাতে ডাকার
একগোছা ফলস কাটি।

“কই বই ফলসে কই?”

মানকিয়া উঠিয়া পড়িয়া বইগুলার উপর
বিস্মিতা পড়িল। বলিল, “তা সে গুলোর উপর
এই আক্রোশ কেন? আমাকেই দিও না।
আমি যে ভোখ দেখতে পারিনে।”

“সর বলছি।”

“করবো না।”

“আধ, ভাল হচ্ছে না, মানকিয়া।”

“কেন, আমাকেই পেঁজাও না, তবে
চেরে ভাত আর কি হবে?”

“আলসানে, ছেঁড় দে শীগগির।”

“কেন, চড়ে মবার চের একেবারে নিকেশ
করলেই ভো হয়।”

“ছাড়ো।”

“না ছাড়বো না, কি কববে, কবো।”

অলস কাটিগুলো বাক্যে বেলিয়া দিয়া
কাচায়নী ক্ষেত্রে চাচপানা ধারণা দ্রুত টানিয়া
লইয়া ফেলিল। শুল্লার পরে চাকরা কহিলেন,
“উপোষ করে শুতে গেছে এই বড়? নাও
কালামুখে উল্লেব ছাই কিছু ছোক।”

“বৌদে যা কোনো জিনিস একেবারেই মুখে
করচেন না, কুমি গিয়ে একবার বলোনা?”

“আমি আদার বাপসি, আহাজের পরেই
দরকার কি ভাই?”

“হাত, হাতী রাখ বৌদি। একবার গিয়ে
বলতে ভোষার কি হয়েছে?”

“আমি পবাক মানুষের মেয়ে তিনকলে কেউ
বো—একলও নিকেশ, পেঁজাও নিকেশ,
আমি আদার বাপসি, আহাজের পরেই
দরকার কি ভাই?”

“কেন, হাতী রাখ বৌদি।”

“তা হ্যাঁ জামিনা, তবে এই থেকেই ভো
বহু হয়।” আমি কিছু করলে ভোষার
দাদার চোখে সেটা চুনালি যে। আমার করলে
আমার ক-মহলব চাকরি, রাগিলে প্রকাশ হয়ে
পড়বে অতঃপর দরকার কি বাবা। চুপচাপ
বাই দই, একপাশে গড়ে থাকি। তার চেয়ে
মাগে বলো বা, তিনি ও স্নেহের কাবা-কানন
ছেঁড়ে যেখানে দোয়াস্তি পাবেন যান।”

“তোমাকে পারা দায় বৌদি।”

“বল পাওয়া দায়।”

চাচা মথখানা গভীর করিয়া লিতি বলিল,
“ভাল লাগেনা বাবা। বাই, আমিই দেখায়ে।”

“বাপ করিস্নে ভাত, শুনে বা।”

লিতিকা গাড়টিন না। মাকে আসিয়া
কহিল, “আচ্ছা, পাবে না মা?”

“না।”

“কেন, কি হয়েছে কি?”

এর চেয়েও হবে আবার কি। যুগল
গেল, কটা ছাশালের মত দিবাযান্তির বাৎরাচ্চি,
কাচায়নী মত দর নিয়ে পেটে পোরবার ডাঙ
বসে আছি—এর চেয়ে আর কত কি আছে।

“ভাতা, চকো।”

“আনি যাব না, কেন মিচিমিচি সময় না
করিস্নে?”

“তাহলে আদিব হাত পেলে খাওয়া এক
করবো।”

“বো, কদলে। হাত আদিব আনির কি?”

হাত বসাবকই কুককটে অতুরূপা কহিল,
“আখা, বোন খাড়া বাড়ীর মধ্যে অলুফা ভাল
লাগে না—যা চুকতে হবে না; যাও, আল
গিয়ে মাকে খাইয়ে এসো।”

“কেন, হাতী পরোপকার?”

“পাঠ্য-পুস্তক তোমার মাথা । বাজিতে না
হয় কেনে পড় আছেন, আর তোমার লজ্জা করে
না যদি এনে নাক সরসে তেল দিয়ে তুতে ?”

“কেন, তুমিও তো বিদ্বান মোবত করছিলে
সেপলম ।”

“কেন কবছিলুম, আমার খুশি আমি কর-
তিনুম । তুমি যদি এইমাত্র না বাও, আমাকে
আর পাবে না !”

“কেন, পতন ও মুক্তি হবে না কি ?”

“ঠাট্টা করাত লজ্জা করে না ? আমার
তা হবে কেন, তোমারই উপযুক্ত হ ।”

“বাঃ বেড়ে ! আর কাছে গিয়ে এসকল
প্রকৃতি একবার দেখিয়ে এলে না কেন ? তা
হলে ভালো ছেলের মত উপস্থিতি তুমি পেতে
সমর্থ হ ।”

“ওঃ এম চেয়েও যে আমার বিপদা—”

কিন্তু আর বলা চতুর্থ না । বক্তৃতা
বীভৎসমুখে টেবিলের কোনটা ধরিস। বসিয়া
পড়িয়া সে যতদূর পাবিল চৌকাস কবিতা করিল,
“মাও, আমার মনও গেছে বাও !”

“মা আমি দোষ করছি, বাও !”

“হ্যাঁ না ।”

“আর কখনো কববে, না, মা !”

“তুমি করো বা না করো, তাতে আমার
কি, আর আমার ?”

“অফিস আর এ দফতর জন্ম দাবে না ।
কেতু এইখানেই পড়বে । আমি তাকে এক-
জামিনে পাঠিয়ে দিতে দিবে দেবো, তাহলেই
হোলো ?”

অল্পস্বপ্না বড় কাজে বাস্ত ।

লুটি করিল, “আচ্ছা, বৌদি, জেঁমার
আজেল কি বলো তো ? এই ভালতাল মলা-

১০০ কতিতে বসেচ ।”

“না ভাই, মেজাজকে কি না করিয়ে
বসে কতিতে আছে ?”

“তা তোমার কববার কি দরকার ?
কিঃ না হয় শুদ্ধো করে দিচ্চা ।”

“আহা, এই যেটেবিলে নাকমুখে শুভ
বেচনী একটু ঘুমতে গেছে, আমি তো বসেই
আছি— তাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন ?”

“নাও, আমি কাণে দিচ্চি ।”

“না ভাই, এ তো হয়েই গেছে—কি বা
কাপড়গুলো বেশ হয় শুকিয়ে গেছে, তুমি
কেল্গে যা ।”

“বেকাল হিন্দি বাজিতে না বাজিতেই
উনানে আগুন পড়িয়া গেল । দেখা দাঁপিয়াই
লুটি ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এক
বৌদি, এবি মধ্যে তোমার যে বড় কাপড় কাচা
হবে গেল, উনান আগুন নিলে যে ?”

“তিনটে হয়েচে, এখনি তো ঠাকুরপো যা
আসবে, পড়তুম বেচাবীরা সিন্ধে ছটকট
ববে বাড়ী ঢোকে—ভাণ্ডি তখনা গরম গরম
লুচি কব লাখি । তুই ওই আলুভাজা ছোট
করে কাচলে রাখ তো ভাই, ছোটঠাকুরপো
কুরিভাজার মত মচমাচে আলুভাজা পেতে বড়
ভালবাসে । আচ্ছা, আমিই নিচ্ছি, গরম-গরম
হয়ে গেছে—তুই ততক্ষণ কিছুটা বার কর ।”

সন্ধ্যা কিছু পূর্বেই তাকে বিয়া অল্পস্বপ্না
জিজ্ঞাসা করিল, “আজ কি ব্যাটা চলেই না ?
আমাদের তো সকালের জুই হয়েচে, তাই
গরম মিশিয়ে নিলেই হবে—আলুকপির একটা
ভালনা করি, দুবাটি চাল আর এক ছোটবাটি
একবাটি ভাল নিলেই তো হবে ?”

যাকে সকলকে জিজ্ঞাসাইয়া দাবি করিয়া

অন্য একজন অল্পবয়সী কবি "হাস্যে মানকিয়া" করেছিল "আজ্ঞা"। "সেই হাঙ্গামে পড়ে এসেছে— এই পাতলা একমাত্র তৈরিক পোশাক বিছান করেছিল সে।" "তাই যবে হো গাল" কবি হোরিকপালা তোলা রংগে—আচ্ছা আমি এখন কি।"

হোরিকপালা আনিয়া ভাল কবিয়া বিছান পাতিয়া সে কহিল, "হুজুরপো, মে শো। আচ্ছা, এই কথা সিঁদুপিন করচে, কামড়ে ছিঁড়ে খেয়ে কেমনে রে।" "শারি বাটাস্মি কেন? এই বে কড়ি রয়েছে, আমি আটরে দি।"

চুটো পান আনিয়া মানকিয়াব হাতে দিয়া কহিল, "পান পানুনি বুকি মানকিয়া? কে আর দেখে বল? এখনি ভুলে গেছি! পোড়া পেটে তো খেতেই শুধু শিখেছি এই নে—খা দিদি। হুজুর খেয়ে অবধি কত গা খুলোচ্ছে, আমায় তো বাপু ধরে উঠে চুটো পান না হুণে দিকে ঘুম-ই আসে না, সব ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়।"

একরাতি ভেল লইয়া ছাবি কনের মাথায় তাড়াতাড়ি চড়াইয়া দিয়া অল্পকথা কহিল, "না, আপনার একটু ঘেন কাসি হয়েছে দেখলুম— একবার লাটী এগিয়ে দিননা, এইটে মালিস করে দি।" নাকটা শুকনো থাকলে ঘুমের বাধাত হবেনা, শরীরটাও বেশ স্বাচ্ছন্দ্য হবে।"

পিসিমার ঘরের ঘোরটা টবং তেলিয়া অল্প কথা জাকিল, "পিসিমা, মোরটা একবার খুলুন না।"

"কেন বোমা?"

"কিছু না—আমার মরণ আর কি! হাকুর-হো পানকিয়া অল্পকথা আনিয়া একটা দেশ-লাইয়ের পানকিয়া ভুলে গেছি।" "উঠতে হবে

না, বোকা কবিরাজ!..." "আজ্ঞা, একটু হাত বাড়িয়ে নি।"

লাটকা হাকুরপা অল্পকথা পায়ে পায়ে ছায়াব মত। নীরবে খুলিয়া দেয়ালে জেঁপে। হাসিয়া কহিল, "কি কথা ক'রো? পানকিয়া কখন?"

"সে হবে পানকিয়া, এখন তা আর—চুটো পান মুখে দে একটু পানকিয়া কবি।" "ও, ভাল কথা মনে পড়ছে! তুই—আমার পানকিয়া এক-বারে তবা হয়নি, শাড়িতে ঢেলে দরকার হয়, আমি আসি।" "তুই হাকুরপা পানের বোটাগুলো ছাড়া, ফেনিমন পানকিয়া—হুজুর মাকে বোটা না পেলে আমার ঘুম হবে না।"

"শোনার ঘুমের মুখে আশুপা!"

"হোব মুখে পানকিয়া পড়ুক।"

কলশবার বাধা খুলিয়া ছায়াব চিঠিগুলো বাড়িব কবিয়া জাকিয়া পাড়া বসিয়াছিল। যখন সে পত্রগুলি পায়, এখন তাহার মধ্যে যে এটা অর্থ নিহিত ছিল, সে বাকিতে পারে নাই।

অল্পকথা ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি লো হাকুরবি, আজ যে তোরা বড় পাতাটি-পরাষ্ট পাওয়া বাচ্ছে না? যদি এই নিরিবিলিতে কবচিস্ কি?"

গাড়াগাড়ি চিঠিগুলো বাস্তব মধ্যে পুরিয়া আঁচলে বাধা চাৰিছাড়া লাগাইতে সে কহিল, "বড় হুজুর-না হুজুর হয়ে, তাই শুচোছি।"

"তা বন্ধ করলি রে। শুচা না। বে আমি শুচিয়ে দি।"

"না থাক—" কহিয়া সে চাৰি লাগাইয়া আঁচলটা পিঠের উপর ফেলিয়া দিল।

বোধ হয় অল্পকথা আপনটো কিছু খুলিত পারিয়াছিল। এমনি নিরিবিলিতে ফেলিয়া দিল

संस्कृत-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-११०००७
 एक प्रति ज्ञान हस्तिया मंडल, बनारस

三、

一、

স্বদেশের ভাইয়ের বিবাহ। জমিদার
কর্তাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পুত্র ও
মাতা শিখিরাছেন। লতিকা সম্বাদা করিয়া

“किं वादेन वाकि ?”

11

না কেন

“ভাল লাগে না।”

“ভয়ের বিয়ে, ভাল লাগে না।”

“সব বেচে-বরতে লুপ্তে স্বদেশের পক্ষে, তা
হলেই হোকো—” বলিয়া হঠাৎ গায়ে জাঁকল
টানিয়ার মাটিতে থং দিয়া আবার কহিল, “তাই
বেন তিনি রাখেন।”

দুখ টানিয়া কেবল হাসিয়া লাগিল। বলিল,
 "বলি আজকাল দিনদিন কি হইতে থাকে গো
 ঠাকুরাণ ? তা, জবাব কি দেবে ?"

“শীত পড়ে আসছে, শীগ্গীর বরফ পড়বে
ছলে ধাবে—এ সময়ে কি করে বাই

“তা ভালো,” সুবিধেই হয়ে গেছে।
 চেয়ে দাঁতি কথাটাই লিখে দাও না?”

“कि १”

দাদাকে ছেড়ে থাকটা আমি

হাও চোখের জল গাণিতে গাণিত
কলিতা উঠিল, "সকলের ভাগো তা হৈল"

[illegible][illegible][illegible]

1980

শ্রী ৩ শ্রী বাবুজি বিঃ দাঃ ভেঃ সিং

১৯৪৭ খ্রিঃ। মে মাসের বিদ্রোহ হতে হতাহতের সংখ্যা-

বলিষ্ঠ না, বাবা বলেছেন যেমন আসে।

সংস্করণ ৩য় : ১৯৬৩ খ্রিঃ

1950

কবি, কবি । নাথটাও আর হুসিন

সেদিন

বসে তো বোম্ব হরনি—

১৯৪৭

কোন একজনকে লানা, তনয় বা ছিঁচ বলা

বিশিষ্ট শোভাযাত্রা : ১৯৭২-৭৩ একবার বসি করলে

ଆମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ।

কর্তব্য : সত্য, চরিত্র।

...পেকেই থাকি কল্লব

ডান হস্তোচ্চল তো ৭ মব

महानगरपालिकाको कार्यालयमा रहेको कानुन विभागले

নোংরা নোংরা চাকি

[illegible]

কিভাবে কদিন কাটানো যায় ?

টিক করে বলে নাও,

১৯৬০

হিসেবে কিসের এক কলহের জলির
নিচেয়ে।

রাঙার কতকগুলি কতকগুলি রাঙে পড়িতে
পড়িতে সে কবির গিরাছে—এত অল্প লোকজন
সে এক বোকা ছিল হয়, সে একেবারেই
জানিতনা।

কিন্তু সত্যের আবিষ্কার স্তম্ভনই বিচিত্র
লইয়া সে যখন বাড়ী ঢুকিল তখন সমস্ত
দরজার একখানা গাড়ী ও বৈঠকখানার কতক-
গুলো বাজ, ব্যাগ। পাশের ঘর হইতে দোরটা
ঝেং ঝুৎ করিয়া ঝিকিত ডাকিলেন,
অম্বরুপা!

“কি বোদি?”

“ঠাকুরপো, তোর ছুটি পায়ে পড়ি, আমার
একটা উপকার কর।”

“কি?”

“এই নোটখানা নে, যেখানে পাস্ কিছু
আগি এনে দে।”

“কেন?”

“কি জানি, যদি দরকার পড়ে।”

হঠাৎ লতিকা কড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া
কেতুর হাত হইতে কাগজখানা ছিনাইয়া লইয়া
কহিল, “বোদি তুমি কি পাগল হলে? ওপরে
শিমিমা, গোপী, মানকিয়া, সব রয়েছে—
তোমার ভয় কি? না কি ব্রহ্ম গুণ হয়ে বসে
পড়েন, দেখছো না? তোমার কি এখানে
করকম করা উচিত?”

“আমি যে বড় গাঙ্গী তাই—”

গোপী কে নয়? অম্বিকি ভজনমতে আনন্দ
হওয়ার খবর কিছু হয়—কলহের জলির
নিচেয়ে হলে যাবে। কলহের জলির

কি? কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে।

“আমি যে বড় গাঙ্গী তাই—”

“গাঙ্গার গাঙ্গার কলহের জলির নিচেয়ে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে, কলহের জলির
নিচেয়ে হলে যাবে কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কি? কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
না? কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
চাওনি, কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে

“ঠাকুরপো, তোর ছুটি পায়ে পড়ি, আমার
একটা উপকার কর।”

“কি জানি, যদি দরকার পড়ে।”

“কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে

“কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে

“কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে

“কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে

“কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে

“কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে

“কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে
কলহের জলির নিচেয়ে হলে যাবে

निष्कर्ष निम्नलिखित ।

विनिष्ठाद्वयक

ଆହାରିଆ କରନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼କାର ହିସା ମାନ୍ୟତା

ବିହାରୀ ଶବ୍ଦ ଗୋପୀ ନୀଳାଦି ବାସିନୀ ବାସିନୀ

ভট্টের দোকান থেকে কিনে এক

ଆଜ୍ଞା ବରଦ ଆମ ତୋ : ଆଜ୍ଞା, ନା, ହୁଅ

কক-ডাক্তারকে টেলিফোন করেছি, এছাড়া

প্রশ্নের বলে । আমিই বাচ্চি, তুই তাকে ওপরের

দেখিয়ে দিস—“আবার বিছাতের মতই

কেন্দ্র গেল।

৮. কলার মিত্র আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি

1950

জানিনা তো—আপনি আসুন, যেজন

বন্ধন আনতে গেছেন।”

উপরে গিয়া সে আর ঘরে ঢুকিতে পারিল

২৭৪ 'সংস্কারবাবু' অন্যান্য ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা

বুদ্ধ, এ অবস্থাটি কতক্ষণ লক্ষ্য করতেন

“নিট পনেরো।”

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

শ্রী নিউ দল

১০. খেঁচের এই লালভাঙা

ও আরও বাকী থাকেন হবেন।

(তাহা হো—বড়ই বেগুনেন্ দেবা
 ...

... कि ...

১৯৪৬-৭ - মালিন কি জমাতে ২০০ টা

স্বাধীনতা সঙ্গীত

কিছোঁ রাঁধি হোঁ

॥ कृष्णाय नमः ॥

“मनः कृत्वा नान्यथा चिन्तयति”

॥४॥ प्राणिनां हि सर्वेषां महानिबन्धः

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

বাবু বলে—

কেউ হুটে গামিয়া কাটিলে!

“বাবু, কেন? হাতের এলেন?”

“হ্যাঁ!”

“বহুকটো ভিতর সে আত, তাই!”

উপার দালা আলোর গন্ধিরের দ্বার খুলিয়ে
নিয়া প্রয়োজিত দেখিলেন, সুরেরর বাবুর ছোট-
তাই সেরেরর অর্ধশরান অবস্থার রকটার
পড়িয়া আছে।

“বাবু, এখানে আগনি?”

কেউ তাহার রক্তকু হুইটা একবার তুলিয়া
তাহার মিকে চাহিলমাত্র, কিছু বলিল না।

“আমার ছেলে- ফাটভিভিশনে পাশ হয়েছে,

বাবু, হাতের এলেন? হাতের এলেন?”

সে কবিতা হুটে গামিয়া কাটিলে! পাশ কর-
লে, হুটে গামিয়া কাটিলে!”

“হ্যাঁ, হুটে গামিয়া কাটিলে!”

“কেন, হুটে গামিয়া কাটিলে?—হ্যাঁ,
হ্যাঁ, সেরেও ভিভিশনে!”

হাত হুটে কবিতা হুটিয়া বাহিরের বন-
কবলটার সে বেকন হুটিয়া কেনিয়া নিবে, হুটে
কান্নার রোল উঠিতে সে চমকিয়া জিজ্ঞাসা
করিল, “ও কে?”

“আমাদের পাড়ার নাথকোল— আহা,
বীধুনিবৃত্তি করে বুড়ো মাকে খাওগাজো,
সংসারে আর দেখবার কেউ ছিল
না, বাবু!”

চুখীর জগৎ

[শ্রীপ্যারিমোহন সেনগুপ্ত]

জীবন আমার কাছে দিনে দিনে হয়ে শুভে বিকশ চুখীর
পাশের ভার।

এ জীবন বহে বহে আমি

পথে পথে কঁদে কঁদে সারা দিবা বাসি।

কিরিত পারি না আর দুয়ারে দুয়ারে

ময়ন - আশারে।

রক্ত বৃকে বোধ জন্ম পুনরিতা বাসি

কৈশিকব্রহ্মের গুণ কপালি প্রাণ

শীঘ্র যেন হই

কেবল জাগিয়া আছে তুমি কোথা হুই নাই ।

কেবল তুমি এ অনন্ত আকাশে

বিনয় হুইসে

বসে আছে নীলিমায় উদ্ভাস্ত মহান

নিজ প্রাণরান

অনন্তের অচপল ছিরাট উল্লাস—

করুণার প্রশান্ত বিকাশ ।

সেথা নাই দ্বন্দ্ব দুঃখ দুঃখের বেদন;

জামারি জীবন

কৈদে কৈদে জলে জলে যায়

জলন্ত বাথায় ।

পাখী গেয়ে যায় গান

প্রফুল্ল রসান

কুতূহল জ্বলিয়া উঠে, আনন্দ দোলায়

স্নাতক নাচিয়া যায় অবাধ খেলায় ।

এ মোর জীবন

কেবল বাহিয়া মরে অনন্ত পীড়ন

মোর দুঃখ-দাগ বিশেষ কোথা নাই পড়ে

অনন্তেবে ভরে

কেবল জাগিয়া আছে অক্লান্ত চরম

একশনি স্বপ্নাকাশে শীতল পবন ।

প্রাণে মনে লায় তাই অনন্ত বেদন

নিরীক আকাশে পাতি বাণিত নয়না

সাহিত্যিক ও সত্য সম্বন্ধে

Thence comes the realism of much good poetry now being written: true, as all genuine realism must be, since it proceeds out of a spiritual conviction, a mental process, and actual craftsmanship—Mrs Sturgeon.

Quoted in New Ways in English Literature.

আমাদের দেশে সাধারণতঃ সমালোচনার অর্থ গালাগাতি, মার্ক দিটকান অথবা বিক্রমের নাম। বিচিত্র জগতের বিশেষ কিছুই নয়। রবীন্দ্র নাথের কাব্য লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই একদল দক্ষ দেশে বিদেশে হইয়া মাথা নাড়িতে থাকে এবং উই মাপ, এডভার মাত্র। এমনই বাড়িতে থাকে যে কবি আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া উচ্চারণের মাথাকে তেঁকে বার উচ্চাই যোগ্য হইয়া উঠে। তাহাও তাঁহাদের বুদ্ধি। অতীত কালের পাতে প্রশংসার লক্ষ্যে যদি কবি থাকে ও অহং শব্দে দিগন্তের পরিধি হরণ থাকে। এই গেল এক দিক।

আর এক দিক শুধু এই। নাই তাহা নয়। ইংল্যান্ড প্রথমেই অক্ষয় পর্বের সচিত সর্বসমক্ষে প্রচার করিত। ভ্রমরসেন যে ইংল্যান্ড কোম কালেই ইবিবাবুর জন্ম নন। (ভবে রবিবাবুর প্রতি ইবিবাবুর মাত্র আদ্যে, কারণ, যদিও ইংল্যান্ডের সচিত্র কখনও ইংল্যান্ড আলোচন হয় নাই তাহাও ইংল্যান্ড কালের যে রবিবাবু বেশ লোক। ইবিবাবুর কবিতা যে কোন সাধারণ কবি ইংল্যান্ড কবিতা

কারেন না—ইংল্যান্ডের পরিচয় মাথার না কি মিত 'মিটিং' জীব স্থান পায় না। তবে ইংল্যান্ড সত্য যে লোকে বড়ই বড়ক রবিবাবুর আদিকার কবিতাই অর্থহীন শব্দের নিকট মাত্র। কখনও কখনও ইংল্যান্ড চারি দুই পড়েন না তাহা নয়, তবে বনী দুই অগ্রসর হইবার পূর্বে humbug, nonsense বলিয়া সেই পুস্তক ঘুরে নিক্ষেপ করিয়া আলোচনা সম্বন্ধে স্মরণ করিয়া তোলেন।

বাঁহিরে আমরা যতই গুরু করি আর বড়ই বলিয়া বেড়াই যে ইংল্যান্ড জাতি বিশ্ব-সাহিত্যে রবীন্দ্র নাথের অতুল কাব্যসম্পদ গান করিয়াছে, অন্তরে অন্তরে আমরা কিন্তু এই দুর্জাতীয় সমালোচনারই বিশেষ পক্ষপাতি। কখনও কখনও নইবের মলাট ছাপা এবং সূচ্যধরতা লইয়া তৃতীয় জাতীয় স্বর্গীয় সমালোচনা যে মা করি তাহা ন্যা অসম্ভব। আমাদের মাঝে সমালোচনার এই যে অবস্থা ও দর্পিত, ইং আমাদের জাতীয় চরিত্রের ও সাহিত্যিক মর্যাদার যে কি পরিচয় দিতেছে তাহা তাহা দেখার সময় কি আরও বলা যায়? ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড অনেকের ওয়া

আমরা আরও বলি—এখানে ইহা স্মরণ
কর—সুহিনী সোখার, সখার কান্না কিসের
কান্না? সখার ইহা স্মরণ ও কান্নার সোহিনী
কান্না পাতা পাতা কান্নার প্রায়শ্চিত্ত দান করিয়া
দিয়াছে, এখন কি সখার ও বিচার করি-
বার অবসর আছে? তাহা নাই বটে—যে
মূলতঃ স্মরণ হইতেছে তাহাকে এই অঙ্গুলের
মনে বুদ্ধিগা বাহির করা সহজ নহে।

মোকে বন্ধন, বাহা পায় তাহাই বিনা
বিচারে খাওয়া করে তখন প্রায়শ্চিত্ত স্বাভাব্য সহজে
বেশ একটু আশঙ্কা হয়। সমালোচনার
অভাৱও সেই প্রায়শ্চিত্ত আশঙ্কায়ই উদ্ভূত
হয়। বন্ধনমুগে সমালোচনার আবির্ভাব
হইয়াছিল, যেমন স্মরণ বিচারপূর্ণ সুখের
পক্ষপাতহীন আলোচনা আর হয় না।
সে কথা বাক—সর্ব বন্ধন সর্বজনীন আলো-
চনার অভাবের কথা এখন বলিতে বসি নাই;
মুগ্ধভাষ্য যে, বর্তমান সাহিত্যরাজ্যে যিনি
সম্রাট—সেই রবীন্দ্র নাথ সঙ্কেত আমরা
আজ পর্যন্ত ঘর ভাঙে ভাবিতে বসিয়াছি
বলিয়া মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্কেত কেবল প্রশংসা কেবল
নিষ্কর হুগ চলিয়া যিয়াছে—এখন আমরা
নিরীক্ষা করি না। বিদেশী প্রশংসার সম্মুখে
মোকে নাহিরের সম্মুখে সঙ্কেত আসে।
প্রশংসাও করি না বিদেশীরাই ত করিতেছে
তার চেয়ে আমাদের দৃষ্টি কি বেশী স্পষ্ট
আমাদের আলোচনা কি বেশী সত্য চাইতে
পারে? কিন্তু আমরা সঙ্গ প্রহর করিব এবং
করিব না, তাহার বিচারের তার পক্ষের
কথা হুজুগ দিয়া যে মনসিক আশঙ্কায়
সম্রাট সঙ্কেত তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত

সত্য বলিয়া মনে করিয়াছে বাহা সত্য বটে
তাহা। পক্ষ করবার সময় আসিয়াছে। এখন
কোন একটা কিসের পক্ষপাত হইয়া যের
কোন একই আশঙ্কায় সমালোচনা করবার
একটা সময় এ আশঙ্কায় আসে। কবির
দৃষ্টি ও আজ আমাদের কাছে একটি পরি-
পূর্ণ সাধারণ্য ও রূপ হইয়া পড়িয়াছে। কবি
হরত বলিবেন যে আমি কি মরিয়া তুত
হইয়াছি না কি? একবার সবটা উত্তর দেওয়া
এখানে সম্ভব নয়। সঙ্কেতে এটুকুই বল-
বায় যে মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে
রবীন্দ্র নাথের যাগা দান তাহা সম্পূর্ণ হইয়া
গিয়াছে একথা সত্য, কবি সে দিনও কবি-
তার নূতন ছন্দ ও গদ্য কবিতার নূতন রীতি
দেখাইয়া নবীন কবিরের সকল নবীনীর
একটা সুযোগ দিয়াছেন, কিন্তু কবিতাব বন্ধ
বাহা, রস বাহা, তাহা আর আমাদের রসনার
নূতন বলিয়া মনে হয় না—তাহার আজিকার
দৃষ্টি পরিচিতির মত আনন্দ দেয়, কিন্তু
অসীমতার কোন নূতন আভাসে পুলকিত ও
বিস্মিত করে না।

যে হোক রবীন্দ্র নাথের দৃষ্টির সম্পূর্ণতা
সহ্যেও বিচারের এখানে প্রয়োজন নাহি।
তাহার সমগ্র কাব্যের একটিকে আজ দৃষ্টি
নিবন্ধ করিব। আমার বক্তব্য যে অমূল্য
প্রস্তুত তাহা কতখানি সীকর্জনীন হইবে
তাহা জানি না—ইহার মধ্যে কোন নিশ্চিত
ইতিহাস আছে কি না তাহা পাঠকের বিচার
সাধারণ।

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যবলি
পাঠ্যক্রম হইতেই স্পষ্ট ভাবে একটি বিশেষ
মিকে গতি লইয়াছে। যেহেতু ও ইতিহাস

কামিনী ভিহার কোনার কামিনী কোলে, যেন
কোনো কামিনীর হৃদয়ই কবি মলিভেজেন,
প্রভু তোমা লাগি আমি ছায়ে" প্রভুজ্ঞার
বেদনার কামিনী জন্ম বলিয়া উঠিতেছে—

"দুল্লভে বসিয়া থাকে

ভিহারী কবির হারে

তোমারি করুণা লাগে।"

এখানে কবি ও কবিতার মাঝখানে, অমৃতভূতিও
ভাষার সাক্ষাৎ মাঝখানে, অল্প কোনও
কথন বা অবিবরণ আসিয়া উৎপাত কুড়িয়া
নিম্নে মাঠ। আবার বহন কবি

পারে আমায় পুলক লাগে

চোখে যমার ঘোর।

জন্মের ঘোর কে নে খেছে

রাজ্যধারীর ডোর।

কখনও অমৃতভূতি বসতি অবাক ও কি জান
কল্পনের হোক না কেন, উহার মধ্যে অমৃতভূতি
বিস্ময়টুকু এত স্পষ্ট বলা যায় যেই প্রোতান
একটু বিস্ময় না করিয়া ছাড় না; যিনি
বলেন বিস্ময় না, উত্থাপক না। মোট
কথা এই যে প্রথম প্রণীর এই দুটুকু কবি-
তার বিশেষ উহারে বিস্ময় অমৃতভূতি, অমু-
তির একাগ্র। কবির সতি অমৃতভূতির
একমাত্র বসতি; অল্প কোনও বিজাতীয় ভাব
মাত্রিক অমৃতভূতিতে বসতি কবিতা পারে
না। অমৃতভূতির প্রাণলা বসতি উহারে
এই অমৃতভূতি প্রাণলা পাঠ্যে, কামিনী
হা নাহি।

কবি বিভিন্ন প্রণীর প্রথম কবিতাটি
কবি প্রথম বসতি অমৃতভূতির প্রাণলা
কবি অমৃতভূতির বসতি এবং সেই অমৃতভূতি
বিস্ময়কে কবি বিস্ময় দেখিতে, কোন উ

পালনো নিকটে। ইহার মাঝে যিক অ-
মৃতভূতি

বহন আবার ভয়েছিল কোন পক্ষে

যার আধার কোণে উঠেছিল কি

আনন্দে

বহন লুটানো নীরব আবার বীণা

যেই উঠেছিল বোনে অন্যতে আঘাতে।

শব্দ চরণে ও ব্যক্তনাম এই বসতি ছত্র সম্পূর্ণ
রীতীর এবং অত্যাশা হইলেও অরণ ইহার
লক্ষ্য, বিগত একটি মুহূর্ত অরণ মাত্র। আন
এ সম্পূর্ণ অমৃতভূতি এই অরণের সহিত কবিতা,
এই গানের শেষে একটি মুহূর্ত কামিনী
মিল ইয়া গঠিতেছে

এখা বসি আর হল ন তোমার মাঝে

অমৃতভূতি ম এগেছিলে আঁত প্রাতে।

একটি এই স্মৃতি মধ্যে একটি বিশেষত আছে
সাক্ষ্য করিতে হইবে। অমৃতভূতি স্মৃতিও
তই প্রকার হইতে পারে, শুধু ভিত্তির
অভাবেই এই স্মৃতি দুই প্রকারের বিস্ময়
প্রতীতি হয় কি না তাহা বিচার না করিলেও
এইটুকু বলা যায় যে এক প্রকারের স্মৃতি
কতকটা শিখোঁট লেখা মত, উহার মধ্যে
বাঁদগত কোন আনন্দবেদনার বা সুখস্থেখ
ছায়া পড়ে না, বর্ণহীন জলপ্রাণের মত
এ স্মৃতি প্রাণের উত্তর সমুদ্র দিয়া বহিয়া যায়
মাত্র; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের স্মৃতি
প্রবাহ চিহ্ন, রাঙাও লীমায় হইলেও
অমৃতভূতি প্রাণের বসতি মত রসবস্তুর বসতি
পরিচয় দিবার মাঝে লেখিতে পারে। শব্দ
বসতি অমৃতভূতির প্রাণের বসতি বসতি
মত। ইহার মধ্যে অমৃতভূতি প্রাণের আবে
এখা ইয়া যে অমৃতভূতি স্মৃতি সেই অমৃতভূতি

সেই দিনের মতো কবিতার পুঁথি
কবিতার পুঁথি, আর পরে জীবনের
কবিতার পুঁথি, সেখানে কবিতার
আজি কবিতার পুঁথি, সেখানে
একটি কবিতা, যে এমনটি কেন হইল।
পরে তুমি তাহার অলসতারই ছাড়া নাই।
নবোদয়, পূর্ণ শক্তি, উচ্ছ্বাস, অবিবেক ও
অনেকটা সাহস ফেলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ
সে কবিতা জানে নাই। একদিন এই কবি-
দ্বন্দ্বের কথাটার বিচার মনে করি।
এই কবিতার বক্তৃতা হইয়া উঠিয়াছে। সে
একটা কবিতার পূর্ণ আনন্দকে বস্তু,
উচ্ছ্বাসের কলমে, কবির হস্তাক্ষর
চাপাটা বাহ্যিক হইয়াছিল। সে কবিতা
সে কবিতার সবই জানার নিমিত্ত। গেল
এই কবিতার প্রতিবেদন একটা কবিতা
মজিৎ হইয়া কবির চিত্তে মোহন বর্ণে
কুটিয়া উঠিয়াছে। — আমায় তখন বিস্তারিত
পুলকে জগতের দিকে তাকাইয়া নেজে
চাহিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল। — একদা
কবিতা দেখি নাই। রবীন্দ্রনাথ সেদিন
কবিতাকে এক নতুন জগৎ দেখাইলেন,
আকাশ নুতন, বাতাস নুতন, বস্তু দেখিলাম
সে দিন। তাহারই নুতন রূপ, নবীন দীপ্তি,
তাহারই পুঁথি নবীন হইল। — জগৎ সে দিন
বাল্যের নিকট রূপান্তর হইয়া গেল। — সে
দিন বাতাসের সাহিত্য জগৎ একটা vision
একটা revelation, উচ্ছ্বাসের পূর্ণ আনন্দ
অপূর্ণ আলোকপাত হইয়াছিল।

কিন্তু কবিতার জগৎ অকস্মাৎ হইয়া
উঠিল। যে কালিকা দিগ্গজ কবিতা
বিতরিত হইয়া জগৎ হইয়া উঠিল।

কিন্তু সেই কালিকা দিগ্গজ কবিতা
উঠিলেন।

তোমার কাছে সাগর না ঘোর
কবির গরব করা
মহাকবি, তোমার পাঠে
সিঁতে চাই যে ধরা

তাঁহার অন্তরের সাধক আমিটি কবিতাকে পশ্চাতে
ফেলিয়া নিষ্ক বৈচিত্র্যের বাহিরে ছুটিয়া।
আপন অন্তরের ব্যাধুল একজাতি মাত্র
লইয়া রবীন্দ্রনাথ যাত্রা করিলেন। তাঁহার
কবিতার তত্ত্ব পরিবর্তনের অন্তরালে তাঁহার
জীবনের এই চিত্তাঙ্গটুকুই কি পাওয়া যায়
না?

এই ভাবের পরিবর্তন কেবল রবীন্দ্রনাথের
হইয়াছে না, আরও বড় বড় কবি শিল্পীদের
মধ্যে এই পরিবর্তন দেখা দিয়াছে।
এই পরিবর্তনের মনস্তত্ত্বের দিকে তাকাইলে
একটা কথা এই মনে হইবে—সাধক ও কবির
মধ্যে জীবন গেল এমন একটা বৈষম্য রচিয়াছে
যাহাতে প্রত্যেকের মিলন টিক হইতে পারে না।
সাধক ও কবি উভয়েরই জীবন কষ্ট অনুভূতি
লইয়া চলেছে। “সত্যং শিবং সুন্দরং” এর
জন্য যোগ। সাধকের অনুভূতি আছে,
কবিরও আছে। সাধকের মধ্যে অনুভাবতা
নাই, কবির মধ্যে অনুভূতির বিশ্লেষণ নাই।
সাধক একটা লিটরা গাশা করি বগড়া উঠি
ন। সাধক বলিতে আরি তাহাকেই বলি
মিন হাবনেব প্রার্থকতার তীর সন্ধীন করেন
এবং সাধক বলিয়াই প্রতি পদে তিনি সতর্ক
হইয়া চলেন। এই জন্যই তাঁহার জীবন
সংযমাত্মক ও চিরময়। কবিতা হইয়া
বহু — কোন সাধকই সাধক হইতে পারে

અનકા" કાર્યાલય શહેરે સીધા જઈને વાસ્તાવવાર
કરુંક પ્રકાશિત ।

১।	কবি	২।	কবি
৩।	কবি	৪।	কবি
৫।	কবি	৬।	কবি
৭।	কবি	৮।	কবি
৯।	কবি	১০।	কবি
১১।	কবি	১২।	কবি
১৩।	কবি	১৪।	কবি
১৫।	কবি	১৬।	কবি
১৭।	কবি	১৮।	কবি
১৯।	কবি	২০।	কবি
২১।	কবি	২২।	কবি
২৩।	কবি	২৪।	কবি
২৫।	কবি	২৬।	কবি
২৭।	কবি	২৮।	কবি
২৯।	কবি	৩০।	কবি
৩১।	কবি	৩২।	কবি
৩৩।	কবি	৩৪।	কবি
৩৫।	কবি	৩৬।	কবি
৩৭।	কবি	৩৮।	কবি
৩৯।	কবি	৪০।	কবি
৪১।	কবি	৪২।	কবি
৪৩।	কবি	৪৪।	কবি
৪৫।	কবি	৪৬।	কবি
৪৭।	কবি	৪৮।	কবি
৪৯।	কবি	৫০।	কবি
৫১।	কবি	৫২।	কবি
৫৩।	কবি	৫৪।	কবি
৫৫।	কবি	৫৬।	কবি
৫৭।	কবি	৫৮।	কবি
৫৯।	কবি	৬০।	কবি
৬১।	কবি	৬২।	কবি
৬৩।	কবি	৬৪।	কবি
৬৫।	কবি	৬৬।	কবি
৬৭।	কবি	৬৮।	কবি
৬৯।	কবি	৭০।	কবি
৭১।	কবি	৭২।	কবি
৭৩।	কবি	৭৪।	কবি
৭৫।	কবি	৭৬।	কবি
৭৭।	কবি	৭৮।	কবি
৭৯।	কবি	৮০।	কবি
৮১।	কবি	৮২।	কবি
৮৩।	কবি	৮৪।	কবি
৮৫।	কবি	৮৬।	কবি
৮৭।	কবি	৮৮।	কবি
৮৯।	কবি	৯০।	কবি
৯১।	কবি	৯২।	কবি
৯৩।	কবি	৯৪।	কবি
৯৫।	কবি	৯৬।	কবি
৯৭।	কবি	৯৮।	কবি
৯৯।	কবি	১০০।	কবি

অন্বিতীয় "আমি কবি" বাটিকা

এই বইটিতে কবিদের কবিতাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি কবিদের কবিতাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি কবিদের কবিতাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।

অন্বিতীয় "কবি কবি" বাটিকা

এই বইটিতে কবিদের কবিতাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি কবিদের কবিতাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি কবিদের কবিতাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই বইটিতে কবিদের কবিতাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি কবিদের কবিতাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি কবিদের কবিতাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রভাতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

প্রথমিক মূল্য ২০/- আনা প্রতি সংখ্যার জন্য ।- প্রকাশিতঃ বিনামূল্যে লক্ষ্য
সংখ্যায় হয় ।

প্রবন্ধ : ভবিষ্যৎ ; জীবনীক মাধব কুন্ডের ; প্রবাসবোধাচার্য ; মাদারথর ভট্টর ; প্রবাসিক
সমস্যা সম্বন্ধে ; সীতেশ চন্দ্র বেন, বিহার কুমার সরকার, হরিহর শাস্ত্রী, কল্যাণচন্দ্র বসু, রায়
কল্যাণচন্দ্র, বীণেশ কুমার ব্রাহ্ম, রবীন্দ্রনাথ, কুম্ভকরজন মল্লিক, উপতি প্রসন্ন ঘোষ, বৈষ্ণবনাথ
কল্যাণচন্দ্র, "প্রভাতীর" দেখক লেখিকা ।

প্রবাসিক প্রাধিকার : রচনার ব্যক্তি উৎসাহ দেওয়া হয় । বিজ্ঞাপনের হার
নিম্নলিখিত । প্রতি সংখ্যায় বহু স্থান থাকে ।

রায় এণ্ড রায় চৌধুরী

২৪নং (দোতলা) কলেজ স্ট্রীট বারুই কলিকাতা ।

প্রকাশিত হইতেছে

প্রকাশিত হইতেছে

সম্পাদক : ব্রজেন চন্দ্র রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠভ্রাতা ও পিতৃ প্রসিদ্ধ
সমালোচনী : কুম্ভকরজন মল্লিক রায় মহাশয়ের—

সঙ্গীততত্ত্ব

সংগীতবিদ্যা গ্রাহক হইয়া থাকিলে ডাক বাস্তব লাগিবে না । বিনামূল্যে আনা ।

প্রাধিকার—বীণাধারি কল্যাণচন্দ্র । কল্যাণ ।

প্রকাশিত হইতেছে

প্রকাশিত হইতেছে

কুম্ভকরজন মল্লিক প্রণীত

প্রকাশিত হইতেছে

প্রকাশিত হইতেছে

সংগীতবিদ্যা গ্রাহক হইয়া থাকিলে ডাক বাস্তব লাগিবে না । বিনামূল্যে আনা ।

প্রাধিকার—সংগীতবিদ্যা—কল্যাণচন্দ্র ।

1990

100

1

14



गान्धर्व



1

100

60

Journal of Management Studies, 20(6), 791-806.

10

... ..

চরণ নিম্নে বিকশে কমল, সুর-সুরধ্বনী বহিয়া ধার—
 বিশ্বের যত লক্ষ্মীছাড়া মা নিঃশব্দ করির বন্দনায়।
 ক্লিষ্ট কণ্ঠে বেদনানন্দ বাজিছে তাকাশ বাতাসময়—
 জয় জয় শুভ শতদল-দল-বাসিনী জননী জয় মা জয়।

তব ম-মুগ্ধ আকাশ-বীণানে-কহারে তব ত-বাহিনী
 আশ্রয়ের রাগে রাঙিল কাণ্ডন, উদারী দেহে-ল-পাশিয়া শিক,
 বিহগ-কণ্ঠে বেহাগে লুণ্ঠে তব আগমনী অশ্রু-ময়—
 জয় বীণাপাণি মরাল-বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।

হতাশে না আজ হতাশ বাতাস পুরবীর বায়ে করেন লোর,
 উষীর সিন্ধু দখিনা সমীর ঢলায় চামর মাতা মো-তোর।
 নিবিড় নীলে মা সাজায়ে পথটি গাহিছে প্রণত দিঘলয়—
 জয় বীণাপাণি মরাল-বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।

সুদূর আকাশ অচপল-অঁখি-অনন্ত তোমার চাক্ষুঃ পথ, —
 উদয় না সে মা, অস্ত-তোরণে উদবে তোমার পুষ্প-রথ।
 বন-বালাদল কচি কিশলয়ে সাজিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া কয়—
 জয় বীণাপাণি মরাল-বাহিনী জয়-মা জননী জয় মা জয়।

লক্ষ্মী মায়ের লক্ষ্মী ছেলেরা নয় গো মা তোর সজ্জারী দেহ,
 তাপস ছেলে মা আমরা এসেছি গৈরিক-রাভা পরিহা সাত
 বাধা-পাণ্ডুর শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া তুংগের অশ্রু কয়—
 জয় বীণাপাণি মরাল-বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।

অঞ্জলি-ভরা আমার নবীন মঞ্জরী দিয়ে তরোঙ্কি ধারা,
 মঙ্গল-ঘটে দুখ-লোর ধারা, দীর্ঘ ত্রিয়ার ছিন্ন ডাল
 রোদনে বন্ধিও-বোধন মা তোর, মা'র কাছে নাই হতভা জয়—
 জয় বীণাপাণি বাণী-বিহারিণী তাপস-জননী জয় মা জয়।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ এম.এ.]

(১) শঙ্কর ও আগমসম্প্রদায়

আমরা শঙ্করপচারি^১ বক্তব্যের দ্বারা
ঈশ্বরব্রহ্মবাদের প্ৰদ দেখাইলাম। কিন্তু হঠাৎ
হঠাতে কেহ যেন মনে না ভাবেন যে শঙ্কর
চাৰ্য্য ঈশ্বরবাদবাদ মানি নেন না। স্বতঃ
শঙ্কর প্রত্যভিজ্ঞাসিক হইতেন এবং নিজের
তাহা বহুস্থানে স্পষ্টভাবে প্রচারিত কবিয়াছেন।
এ কথা আমরা এত আলোচনা কবিব।
সাধারণতঃ সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ে যে মত প্ৰচলিত
‘অদ্বৈত’ এবং ‘ব্রহ্ম’ ঘৰ্ষণ কবিয়া ‘অদ্বৈত’
প্রস্থানের হস্তাদি রচিত হয়, আর কাল-মাহাত্ম্য
শঙ্করের এক মাত্র মত বলিয়া গৃহীত হয়।
কিন্তু তাঁহার সঙ্গে ‘ব্রহ্ম’-এ প্ৰচারেরও যে
সম্বন্ধ ছিল তাহা একবার অস্বীকার করা
যায় না। আনব মনে হইবে আগম ও নিগম
উভয় মার্গেই তিনি সম্প্রদায় প্রবর্তক হইয়া
ভগদত্তগুরুদের মার্গকর্তা সম্পাদন করিয়া
ছিলেন। জ্ঞান এবং উপাসনা,—সন্ন্যাস এবং
গার্হস্থ্য, উভয় দিকেই তাঁহার প্রচারশক্তি
অব্যাহত ছিল। মহাপুরুষাণ্যর উপদেশ
দিবার ইচ্ছা সনাতন পদ্ধতি। বুদ্ধদেব,
মহাবীর প্রভৃতি ধর্ম প্রচারকগণ সকলেই

নানাবিধ পরিমাণে এই পদ্ধতিতেই অনুসরণ
করিয়া গিয়াছেন।

কয়জন শঙ্করাচার্যের বিখ্য উপলভ্যমান
গ্রন্থমালা হঠাতে জানিতে পারা যায় সে আলো-
চনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তদ্ব্যতীতও
একাদিক শঙ্করাচার্যের পরিচয় পণ্ডিত্য বার কি
না, তাহা স্বতন্ত্র কথা। তবে নানা দিক হইতে
ঐতিহাসিক আলোচনার ফলে ইহাই অনুমান
হয় যে তিনি একলাদী শঙ্কর তিনি আগম-
শাস্ত্রবিৎ ছিলেন। শুধু তাহাই নহে। তিনি
এই আগমপ্রাচুর্য বচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।
বিশ্বদ্রষ্টা এই কথা।

প্রত্যভিজ্ঞা মতের সাহিত্য জিগুর্বাশিকারের
তথ্যবা জীবিত্যর আরও বহু সম্বন্ধ। শঙ্কর এই
জীবিত্যর একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন।
পূজ্যবী মতে এখনও তাঁহার জীবিত্য
বহির্ভায়ে, এখনও সেখানে তাহার উপাসনা
হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্যের পবনগুণ
গৌড়পাদাচার্য্য জীবিত্য প্রতীপাদন করিবার
বহু ‘জীবিত্য’ নামক গ্রন্থের রচনা করেন।
ইহার উপর শঙ্করের টীকা আছে * এবং

* জীবিত্যগ্রন্থের উপর শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যা আছে। টীকা হইয়াছে পাণ্ডব যার। লক্ষ্মীর পদার্থলক্ষ্যের
ব্যাখ্যাত্তে শুধু শঙ্করীটীকার একটি উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় টীকা তাঁহার রচনা হয় নাই।

সম্ভবতঃ ইহারই অনুরোধে তাঁহার অতি গভীর রক্তস্ফূর্ণ দীক্ষাচার্য্য নামক স্তোত্র রচিত হইয়াছিল *। এই গ্রন্থের উপর সুরেশ্বরচাৰ্য্য রচিত টীকা আছে—শুল্কেরী সঠে এই টীকার একখানা অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক বর্তমান আছে +। প্রপঞ্চসার শঙ্করকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ—ইহার উপর পদ্মপাদাচার্য্যের টীকা আছে। উত্তরও দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন সময়ে লিখিত। এই টীকার দুইখানা হস্তলিখিত পুস্তক আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। স্মৃতসংহিতা ও পবানব সর্গহিতার টীকাতে মাধবাচার্য্য প্রপঞ্চসারকে ভগবৎপাদ শঙ্করকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শারদাতিলকের টীকার বাবদভট্টও গ্রন্থটি করিয়াছেন। সম্ভ্রান্ততঃ শঙ্কর ও তাঁহার শিষ্যচতুষ্টয়ের উল্লেখ আছে। এই সব দেখিয়া শঙ্করকে শাক্তগণের, বিশেষতঃ ত্রিপুরাগণের, একজন অতি প্রধান আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

তাঁহার দক্ষিণামূৰ্ত্তি স্তোত্র ও সুরেশ্বরচাৰ্য্য কৃত তাঁহার বার্তিক পাঠ করিলে এ কথা আরও স্পষ্টরূপে বহিতে পারা যায়। আমরা সংক্ষেপে পণ্ডিত মহাশয়ের শাস্ত্রী লক্ষ্মীধরের সম্বন্ধেও শাক্তীয় প্রমাণের বলিয়া বর্ণিত করিয়াছি। তিনিও সিদ্ধান্ত নির্বোধ নহে। তবে লক্ষ্মীধর যে শাক্তরাগণের বহুপুস্তকই ছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহাকে মাধবাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিয়াই আবার মনে হয়।

* কেহ কেহ দীক্ষাচার্য্যকে শঙ্করের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করেন না। কেহ বলেন যে ইহা শঙ্করচাৰ্য্যেরই আপন রচনা। পণ্ডিত মহাশয়ের শাস্ত্রী লক্ষ্মীধর তাঁহা বলিয়া বলেন—“The fact that Sri Sankaracharya was a reformer, in his days of the Pakta cult, as to various others, the very important part still played by Sakta worship, and the advent of the soul, the identity of the soul and the Goddess spoken of in verse 22, his reverence to the students in verse 84, the peculiar style of the hymn and an impartial reference to and an attempt to unify the peculiar doctrines of the mutually opposed sects of Sannyasa marga and Kaula marga, and lastly, the unanimous testimony of such writers as Laksminarayana and Bhaskararaja—all these induce me to believe that the hymn is a genuine work of Sri Sankaracharya.” Preface to Saundaryalahari (Mysore Central Library), Vol. 1.

+ কালীবাসী পণ্ডিত দীপ্ত দীপ্তারাম শঙ্করী বীরকাল শঙ্করী মতে বহু কথিত হইয়াছে যে তিনি একজন অবতারিকালে সুরেশ্বরের টীকা কিছুদিন আলোচনা করিয়া ছিলেন। তাহার দ্বারা এই টীকার কথা জানা যায়।

তাঁহা দেখা যায়। দক্ষিণামূৰ্ত্তি ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের একজন। ‘দক্ষিণামূৰ্ত্তিসংহিতা,’ ‘দক্ষিণামূৰ্ত্তি উপনিষৎ’ প্রভৃতি উক্ত সম্প্রদায়ের মতপ্রতিপাদক গ্রন্থিত গ্রন্থ। রতন ও সুরেশ্বর কিংবা সুরেশ্বরচাৰ্য্য দক্ষিণামূৰ্ত্তির আকারে বর্ণনা করায় শঙ্করের আগমপ্রমাণ প্রমাণিত হয়। এক স্তোত্রের প্রথম স্তোত্র বলা হইয়াছে যে কালীদেবীকে স্মরণ করিয়া যোগত, এবং দপণ্ডিত ইতিবিস্তৃতনামের অর্থাৎ বস্তুতঃ এই কিংবা জ্ঞানবান শঙ্কর, কিংবা মারতে বর্ণিত মনে হইতেছে। পণ্ডিতকালে মার্ত্ত বার্তিক শঙ্কর—পুস্তক ইহা আপন অমর মন্ত্রের কারণে সত্য হইতে পারে। এখানে বিধি স্বাক্ষর হইতে পারে। শঙ্কর, আপন স্বাক্ষর্য্যে বিধি এবং মার্ত্ত বার্তিক উপরূপে অঙ্গীকৃত, তাহাও সত্য। এই থেকে বলা হইয়াছে যে শঙ্কর চাৰ্য্যের পক্ষে নির্বিকল্পক অবস্থায় বর্ণিত হইতে পারে। শঙ্কর চাৰ্য্যের কল্পনাবিহীন শাস্ত্রী লক্ষ্মীধর শঙ্কর যেমন উদ্ভগমের পূর্বে দীক্ষারূপে পণ্ডিত ও ঠিক সেইরূপ। পরে মার্ত্ত চাৰ্য্যের দ্বারা কাল

কল্পিত হইলে উহা নানা বা বিচিত্র আকারে প্রতীকৃত হয়। যিনি যামাবীর ভায়, মহামৌলীর ভায়, শুধু পেছাতে এই বৈচিত্র্যময় বিষয় বিজ্ঞান করেন, তিনিই আত্মদো—
 প্রকৃতিদেব। এখানে এই যে যামাবী ও যোগীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল প্রত্যভিজ্ঞান ও ত্রিপুরাদর্শনে ঠিক এই দুইটি দৃষ্টান্তই আছে এটা ভ্রমভেবে সৃষ্টি যে ইচ্ছাশক্তিমূলক—উপাদান নিরপেক্ষ—তাহার বিচার আছে *। প্রত্যভিজ্ঞান কারিকাতে উপলব্ধি বলিয়াছেন—

চিদাত্মের দেবোক্তস্তোত্রতমিচ্ছাবশাদ্ বহিঃ।

যোগীর নিরুপাদানমর্থজাতং প্রকাশয়েৎ ॥

অর্থাৎ সৃষ্টি বলিতে অন্তঃস্থত পদার্থের বহিঃ প্রকাশকে বুঝায়। সকল পদার্থই চিদাত্মার অন্তঃস্থিত, শুধু ইচ্ছাবশতঃ কখন কখন কিছু কিছু বহিঃপ্রকাশিত হয় মাত্র। এই বহিঃপ্রকাশনই বস্তুতঃ সৃষ্টি শব্দের অর্থ। স্তোত্রের দ্বারা বাক্যে এতাদৃশ সৃষ্টিতে উপাদানের অপেক্ষা নাই। ইচ্ছাশক্তি অবলম্বনে যখন বস্তু নিষ্কাশন হয় তখন পূর্বসিদ্ধ পরমাণু প্রয়োজন হয় না। যাহারা যোগীর সৃষ্টিব্যাখ্যা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারা এই দৃষ্টান্তের মার্থকতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যোগীর সৃষ্টিও পরমাণুসাপেক্ষ—যোগী যখন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করেন তখন উহার প্রেরণায় পরমাণু সকল আপনা আপনি আসিয়া একত্র হয়।

কিন্তু অভিনবগুণ উক্ত কারিকার ব্যাখ্যাসঙ্গে বলিয়াছেন যে এ প্রকার কল্পনার কোমল নাই : “ন হি একং বস্তুং পঞ্চম—
 পরমাণবো যোগীচ্ছয়া সৃষ্টিতি সংখ্যতাঃ কাব্য-
 মাহাত্ম্যন্তে ইতি” (ঈশ্বরপ্রতিজ্ঞাবিশিষ্টা, পৃঃ ১৮৩)। ইহার কারণ এই যে যাহারা পরমাণুবাদী তাহারা সাঙ্গাতভাবে পরমাণু হইতে মূলবস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করেন না। মধ্য অবস্থার অব্যবহর ব্যবধান আছে বলিয়া মানেন। এমন ঘট নিষ্কাশন করিতে হইলে শুধু পরমাণু সমূহকে বিশিষ্টসংস্থানে অর্থাৎ ঘটাকারে সমীকৃত করা সাঙ্গাতভাবে সম্ভবপর নহে। পরমাণু হইতে বায়ুক, দ্রাব্যের সম্মিলনে ত্রসরেণু, এইরূপ ক্রমশঃ মূলতর কার্যের উৎপত্তি হইতে থাকে। পরে কপাল নির্মিত হইলে দুইটি কপালের পরস্পর সংযোগে ঘটের সৃষ্টি হয়। শুধু তাহাই নহে। দৌকিক সৃষ্টিতে কিংবা উপাদান-সাপেক্ষ সৃষ্টিতে নির্দিষ্ট সহকারীর আশ্রয় চাই, শিক্ষাও অভ্যাসের প্রকর্ষ চাই। নতুবা বস্তু নিষ্কাশন সম্ভবপর নহে। কিন্তু যোগীর সৃষ্টিতে এসব কিছুই অপেক্ষিত হয় না। স্তোত্রের যোগীও পূর্বসিদ্ধ পরমাণুকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি করেন একরূপ কল্পনা নিব্বর্থক। যোগিজ্ঞানের এমন মহিমা যে আভাসবৈচিত্র্যময় পদার্থসমূহ ইচ্ছান্নাটই প্রকাশিত হয়। আসল কথা এই যে সংবিৎ স্বাতন্ত্র্যময়ী (free), যখন

* প্রত্যভিজ্ঞানদর্শনের সিদ্ধান্ত আলোচনা কালে এই মত বিবরণের নিম্নলিখিত বিবরণ থাকিবে।

† মাঘবাচার্য্য সর্বদর্শনসংগ্রহে ‘প্রত্যভিজ্ঞানদর্শন’ শিরোনামে (জাননাভ্রম সংশ্লিষ্ট, পৃঃ ৪৯১) “যে তু সৃষ্টিতি যোগ্যমানং বিনা” ইত্যাদি বাক্যবাহ্য এই মতের উল্লেখশূন্যক পণ্ডিত করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহারা বলেন যে যোগীর ইচ্ছায় পরমাণু আকৃষ্ট হইয়া মূলবস্তু নির্মিত হয় তাহাদের বিচার অনুসারে বলিয়া উপাদান করিয়াছেন।

তাহাতে ইচ্ছার উদয় হয় তখন সেই অপ্রতী-
যাতরূপ ইচ্ছার বশে অন্তর্গত অর্থাৎ জ্ঞানরূপে
কিংবা আত্মার সঙ্গে অভিন্নরূপে স্থিত পদার্থ
সমূহ ক্ষেয়রূপে অবতাসিত হয়। যাহা 'অতঃ'
রূপে দৃষ্টার সহিত একাকার ছিল তাহা 'ঈদং'
রূপে পৃথগ্ভাবে ক্ষুটিয়া উঠে। কল্পিত প্রমাণ
অর্থাৎ দেহাদিতে প্রাদাআবোধক দৃষ্টার
কাছে,—পরিচ্ছিন্ন সার্থি ২ এর তাচ্ছ—এই
পদার্থ বাহ্য বস্তুয়া পরিণামিত হয়।

অতএব এই বিশেষ আভাসসহিতরূপ
মূল চিন্তাচার স্বাতন্ত্র্যশক্তি প্রত্যেকপ্রাণীয়া
উক্ত দ্বিতীয় প্রোক্তর বাস্তবিক এই রূপেই
ইচ্ছাশক্তির উপাদাননিরূপণ স্বস্তিসামর্থ্য
বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে
বিশাখিত প্রভৃতি পরিণকসমার্থি অবিগণ
উপাদান, উপকরণ ও প্রয়োজন বাস্তবিক
কেবল মাত্র স্বৈচ্ছার সকল প্রকার ভোগ
সামগ্রীতে পরিপূর্ণ স্বলোক সৃষ্টি করিয়া
ছিলেন। ইহাই যোগিস্থিতির দৃষ্টান্ত। ঈশ্বর-
সৃষ্টিও এইরূপ, কাবণ তিনি স্বতন্ত্র ও সর্বশক্তি
(বাস্তবিক ৪০)। তিনি আশ্রয় বলিয়াছেন
যে ঈশ্বর কীরকব্যাপার বিনা কঠা, এবং
প্রমাণব্যাপার বিনা সর্বজ্ঞ, কারণ তিনি
অপ্রকাশ। তাহার জ্ঞাতব্য, কল্পিত প্রমাণ
তাহার স্বাতন্ত্র্যশক্তিরই প্রমাণ। তাহার
ইচ্ছাশক্তি স্বজনকারিতারূপ—ইহা অল্প
নিরূপক এবং অপ্রতিহত। এই ইচ্ছাবলে
তিনি "কর্তুং", "ন কর্তুং" ও "অত্যা কর্তুং"
অর্থাৎ প্রবর্তন, নিবর্তন ও পরিবর্তন করিতে
সমর্থ—ইহা স্বতন্ত্র। যোগিগণ এই ইচ্ছাশক্তির

স্বভাবকেই সামাজ্য করেন—দশম স্লোকে ২২
কারিকা উক্তব্য। সামাজ্য সর্বত্র আত্মতাবের
বিকাশ, বাহ্যদের সমাধি পরিণক হইয়াছে
উপাদানই ইহা লাভ ৪৪। ইচ্ছাই পাদমৈশ্বর্য
—অন্ত্যন্ত খণ্ডবিভূতি ইচ্ছার কলনার কিছুই
নাই। আত্মা মতেষক—১০১৩ (১০১৩)
স্বরেশ্বর বলিয়াছেন—

বদ্যৈশ্বর্যবিপুড়ি স্বাক্ষর্যবাদয়ঃ।

ঐশ্বর্যবস্তো ভাস্যে স এবাশ্ব সমাধিবঃ ॥

পরবর্তী কারিকায় আছে যে পূর্ণাঙ্কতা লাভ
ইহা এই ঐশ্বর্য আপনিই নিশ্চিত হয়, সে
জন্য বস্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না। অর্থাৎ
ইহা তাপলাভের জন্য স্পষ্টভাবে বস্ত্র করিতে
হয় না। ত্রোত্রের দশম শ্লোকে শব্দর মিজো
এই সর্বাঙ্গতা বা পূর্ণাঙ্কতার 'মহাবিভূতি'
গিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই 'অদ্যাহত
শ্রবণ', অগ্নিমানি অসমিচ্ছিত্যাহত পরিণাম
প্রভৃতি। এই "অহং" নির্দেশক, স্বতন্ত্র
অপরিচ্ছিন্ন ও পূর্ণ—ইহা অসংসার, মলিনও
নাই (৪১৩১)। নবম দশক উৎসের বাস্তবিক
(১২, ১৪, ১০১১০) পদার্থের মূর্তিকে ৩৬
স্বাতন্ত্র্যক অর্থাৎ বিশাখার পরিণ, বর্ণনা কবা
হইয়াছে। বলা বাতিল ৩৬ তত্ত্ব
প্রভাভিজ্ঞা ও ত্রিপুরা প্রকাশ সুপরিচিত
সিদ্ধান্ত। এই সব তাপলাভে কারো ন্দাই
প্রতিষ্ঠিত হয় যে শব্দ ও প্রমাণ—এই গড়ে
সাক্ষাদভাবে আগমেরই অনুসরণ করিয়া
চলিয়াছেন। এই যে পূর্ণের সৃষ্টিতে
উপাদাননিরূপণের কথা কবা হইল শব্দর
বেদান্তেও ইহা অতিমানসিক উপাদানবাদ বলিয়া

উদ্ধৃতি—চন্দ্রশক্তিধার স্বতন্ত্রোপাদানপন্থিতঃ।

বেদান্তোক্তে সর্বত্র স্বজাত্যন্তি তচ্ছি ৫।

১. পরম প্রকাশ, রাস্ত্রীয় পত্রিকা প্রকাশ

পরিচিত আছে। অবশ্য অপর ভাষায় ম্যানিলে
নিমিত্ত ও উপাদানের ভেদে পরিহার্য করিতেই
হইবে। কিন্তু কথ্য এই শাস্ত্রীয়ক ভাষা
ব্রহ্মের মূখ্যকর্তৃত্ব অঙ্গীকৃত করিয়াই নাই।
শব্দর স্পষ্টাক্ষরে লিখাছেন যে ঈশ্বরই সর্বজ্ঞ
ও সর্বশক্তিমান হইলে, উহা অবিকার্যকর ও অপরি-
পরিচ্ছেদনিবন্ধন, সুতরাং ইচ্ছা-বল-ব্রহ্মের
বিজ্ঞানকোপাধিপরিচ্ছেদাদে কমেবৈতৎসংস্কৃত
সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিঞ্চ চ ন সৎসংস্কৃতং বস্তুয়া-
পাক্তসর্বোপাদিস্বরূপ আত্মনির্দেশিতত্বং ব-
জ্ঞানবিবাকার উপপত্তয়ে। (ব, পৃ. ১০১-১৪,
ভাষ্য)। এই ভাষ্যাংশ ইচ্ছা-বল-ব্রহ্মের
পারা যায় যে চিদাখ্যার ইচ্ছা-বল-ব্রহ্মের
স্বতঃসিদ্ধ নহে—সুতরাং ইচ্ছা-বল-ব্রহ্ম
বিজ্ঞানলৌকে অবিকার্যকর ব্রহ্মবাহিত হইয়া
যায় তখন ঈশ্বরই থাকে ন। দক্ষিণায়ুষ্টি
স্তোত্রের ১০ম শ্লোকে শব্দর স্পষ্টাক্ষরে
লিখাছেন যে ঈশ্বরই থাকে, সর্বজ্ঞত্বং
মহাবিভূতি থাকে, পূর্ণত্ব থাকে—এই চিদা-
আত্মস্বরূপ হইতে বিলক্ষণ নহে, ইচ্ছা-বল-
দেবের স্বভাবভূত, অবিজ্ঞাননিবন্ধক নহে।
সুতরাং চার্য্য ঠিক এই কথাই লিখিয়াছেন—

ঈশ্বর্য্যমীশ্বরত্বং হি তস্য নীতিঃ পৃথক্যবিত্তিঃ।

পুরুষে ধাবমানোহপি দ্বায়া তমকথাবতি ॥

ঈশ্বরতাব ও শুদ্ধতাব পৃথক্য নহে,
সুতরাং আত্মজ্ঞান হইলে ঈশ্বর্য্যগাত আপনাই
লাভ হয়।

(৮) ত্রিপুরা ও প্রত্যভিজ্ঞানশাস্ত্রের

পরস্পর সম্বন্ধ

আমরা প্রসঙ্গতঃ প্রত্যভিজ্ঞানশাস্ত্রের সহিত
ত্রিপুরা ও স্পন্দমতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা
বলিয়াছি। যে আগম একের আকার গ্রন্থ
অপরেরও তাহাও। উপাসনার পার্থক্য রক্ষা
করিবার জন্য পৃথক্ প্রস্থান রচিত হইয়াছে
বটে, কিন্তু তাহাও একই মূলের উপর
প্রতিষ্ঠিত। ফলে উভয়ের পদ্ধতিতে ভেদ ভিন্ন
তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে বিশেষ কোন ভেদ লক্ষিত
হয় না। এই জন্যই আমরা প্রাচীন আচার্য-
গণকে ত্রিপুরাসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে লিখিতে গিয়াইয়া
শিবহৃত্ত ও প্রত্যভিজ্ঞানশাস্ত্র, ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা-
বিমর্শিনী, তন্ত্রময়োক প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ শৈব-
গ্রন্থ হইতে প্রমথ সংগ্রহ করিতে দেখি।
পঞ্চাঙ্করে উৎপলদেব, কেমরাজ, অভিনবগুপ্ত,
মহেশ্বরানন্দ প্রভৃতি শৈবচার্য্যগণ যথাপ্রয়ো-
জন যোগিনীসুন্দর, কামকলাবিজ্ঞান, ত্রিপুর-
সুন্দরীমন্দির প্রভৃতি গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার
করেন। সাংখ্য ও যোগে যেমন নিকট সম্বন্ধ
ত্রিকমত ও ত্রিপুরা মতেও সেইরূপ। পঞ্চ-
রামকল্পহৃত্ত, বিন্দুহৃত্ত, তত্ত্ববাজ, ত্রিপুরারহস্ত,
নিভাঙ্কনর, বামকেশ্বরতত্ত্ব, পবমানন্দতত্ত্ব,
সৌভাগ্যরত্নাকর প্রভৃতি ত্রিপুরামতের শ্রেষ্ঠ
গ্রন্থ—ভাস্কর রায়, রুবি রামেশ্বর, লক্ষ্মীধর,
উমানন্দনাথ, অমৃতানন্দ এ মতেও উৎকৃষ্ট
ব্যাখ্যাগত। এই সব পর্য্যালোচনা করিলে
বেশ বুঝিতে পারা যায়—প্রত্যভিজ্ঞানশাস্ত্রের
সহিত ত্রিপুরাসিদ্ধান্তের দার্শনিক আশ্রয়ের
অর্থার্থ জ্ঞানকাণ্ডের তেমন কোন পার্থক্য
নাই।

প্রত্যভিজ্ঞান ও ত্রিপুরা সিদ্ধান্ত আত্মজ্ঞানই মঙ্গল। অনেক হলেই স্তোত্র ও ব্যক্তিকের ব্যাখ্যায় ভ্রম করিয়াছেন।
ফলে সে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইবার দীক্ষাতে তাহার আত্মসত্তা নাই।

তবে একটা কথা অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে। উভয় নংই ৩৬ তত্ত্ব অলীক হইয়াছে—তাহার পরে যাহা তাহা তত্ত্বাতীত। বিশ্ব এই ৩৬ তত্ত্বের সমষ্টি। তত্ত্বাতীত হইতেই তত্ত্বের উদ্ভব, তাই উভয়ই মূলে এক। সেই কল্পই সেই পরম বস্তু যুগপৎ তত্ত্বাতীত অর্থাৎ বিশ্বাতীতও বটেন, আবার দর্শনতত্ত্বময়, সূত্রগাং বিশ্বাত্মকও বটেন। এই বে বিশ্বের কথা বলা হইল ইহার মধ্যে ৩৬শ ও ৩৬শ সংখ্যক তত্ত্ব, যাহার পারিভাষিক নাম শিব ও শক্তি, তাহা নিত্য—এমন কি তাহার আবির্ভাব তিরোভাবও নাই, তাহা সঙ্গত। তাই প্রকৃত প্রস্তাবে ৩৬টি তত্ত্বই অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সদাশিব তত্ত্ব পর্য্যন্তই বিশ্বনামে অভিহিত হইবার যোগ্য। সূত্রগাং সৃষ্টি বলিতেই সদাশিব প্রকৃতি তত্ত্বমালায় ক্রমশঃ আবির্ভাব বুদ্ধিতে হইবে। এই আবির্ভাবের বীজ, যাহার ক্রম-বিকাশই বিশ্ব, তাহাই শক্তি। এই শক্তির সঙ্গে শিব চিরমিলিত। শক্তি অন্তর্মুখ হইলেই শিব, শিব বহির্মুখ হইলেই শক্তি। অন্তর্মুখভাব ও বহির্মুখভাব উভয়ই সদা জালীন—কেন না পরমেশ্বর নিত্যই “পঞ্চ-রূপাকারী”। শিব তবে শক্তিভাব গোণ, শিব-ভাব প্রধান,—শক্তি তবে শিবভাব গোণ, শক্তিভাব প্রধান। কিন্তু যেখানে শিব ও শক্তি উভয়ই একরূপ, সেখানে শিবের ও শক্তির নাই শক্তিরও প্রাবল্য নাই—সেটা সামান্যত্ব। ইহাও নিত্য অবস্থা। ইহাও তত্ত্বাতীত। কেহ কেহ ইহাকে ৩৬শ তত্ত্বও বলেন। কেহ বলেন ইহার সঙ্গে কিছু বৈজ্ঞানিকতা নাই, কিছু ভাষা বার নাই—ইনিই

মতাদেশের চরম লক্ষ্য। শৈবের ইনি পরমশিব, শাক্তের ইনি পরাশক্তি, বৈষ্ণবের ইনি শ্রীভগবান। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এ সব নামই শুধু নামমাত্র—ব্যবহারলোকের মস্তক কর্তৃক যুগপৎ।

৩। আগম ও সূক্ষ্মমত

দ্বিপুত্রা মতের সহিত প্রাতিজ্ঞামতের মৌলিক সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল। এই উভয় মতের সঙ্গে গোড়ীয় বৈষ্ণবমতের মধ্যে সিদ্ধান্তের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ আছে। বাল্যকাল হইতে ইচ্ছা আছে গোড়ীয় সিদ্ধান্তের বিস্তারিত বিবরণ করিবার সময় বাল্যকালে যে বিষয়ে আলোচনা করিব। কিন্তু শুধু তাই নহে; আমার বিশ্বাস সূক্ষ্ম মতের সহিতও দ্বিপুত্রাদিসিদ্ধান্তের সম্বন্ধ আছে। এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কাহাণীও দাঁট্ট আঁট্ট হয় নাই। সেই জন্য সে সম্বন্ধেও একটি কথা বলিয়া আপাততঃ আমরা এত সুমিষ্ট উপসংহার করিব।

ক্রিমার (Von Kremer), ডোজি (Dozy), সাচি (Sylvestre de Sacy) প্রকৃতি আচার্যগণ মনে করেন সূক্ষ্মগণ আপন সিদ্ধান্তের জন্য বেদান্তদর্শনের নিকট গর্ভী। কল্যাণ দেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি গেটেও তাহাই বিশ্বাস করিতেন। তাহার West-östlicher Divan নামক গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে নিকলসন (Nicholson), গিব (Gibbe) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন নব্যপ্রাচীন (Neo-Platonic) মতের সহিত সূক্ষ্মমতের সাম্যত্ব। এই বিতর্কসিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য হইতে

ভগবৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—ইহাই 'মহা-
জীবনের উদ্দেশ্য'। 'কহ' এত অস্বাভাবিক
ভিত্তিতে করিতে গেলে আমাদের 'মহা-
ভাবকে দমন করিতে হইবে'। এত অস্বাভাবি
যা পাইয় অনর্থের মূল। স্বর্গীয় বাহন ভগবানই
যখন একমাত্র সত্যবাক্ত, আর সকলও তখন
মিথ্যা, তখন আমাদের অভিমান করিবার
বাস্তবিক কোন হেতু নাই। এই অভিমান
নিরস্তির একমাত্র উপায় প্রেম। ভগবৎ প্রেম
একবার হৃদয়ে উদ্ভিত হইলে অভিমান বিগলিত
হয়, সকল অস্বাভাবিকিয়া দূর, মাতা-পিতা
নির্মেষের নখে কোথায় মিলিয়া যায়, চিত্ত
অদ্বৈত প্রেমস্বরূপে, পূর্ণ সৌন্দর্য্য মধ্যে, বিলীন
লাভ করে। এই সৌন্দর্য্য ও প্রেম, অনন্ত
মুক্ত, আর আদিও নাই, অন্তও নাই, উচ্চ
উচ্চ চিত্তকিব্যাস হইতে নাই। এখানে সত্য
ও সন্নিধান অতিরিক্ত নৈরবীক—'মহা-
'আকাশ' প্রকার। নানা বস্তু দ্বারা
পূর্ণবিশেষ, কিন্তু বস্তুবিশেষ আপনাতঃ পৃথক
সত্তা কল্যাণ করিয়, কল্য পায়। আশা-
যে পূর্ণ কোকিল বহিরাগত, কিন্তু
বিদ্যার চিন্তায় সত্য বহিঃ। 'বহিঃ-
ভেদে' অজ্ঞানত্ব, বস্তু-
—বাস্তবিক নাই।

মামুদ এই অষ্টদশাব্দেব দ্বিত্যে দশক রচনা
 করিয়াছিলেন। মামুদ একটি সংগ্রহের প্রবর্তন
 করেন—রূপান্তর কবি হাকিম
 অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহার বিষয়ে
 অনুসন্ধান করিয়া জানিবে, কিন্তু তাঁহা
 এই অনু (আফ্রান) জড় নহে, চৈতন্য, —
 চৈতন্যের বিকাশের তারতম্য আছে।

৩। তৃতীয়া

পদ্মসীমার কবি-বিজ্ঞান বা কোম্পোজিট। এ
এক এবং অ-এক, কিন্তু ইহারই বৈচিত্র্যসম্পন্ন এক
মে প্রাণিনিধি ভূতাবলী সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে।
এই স্বরূপ জ্যোতিঃ-মতী স্বপ্রকাশ, অ-অ-ম
মতী কিছু আছে, দৃষ্টি ইহার ব্যক্তি, অসামান্য
—ইহারই শক্তি স্বরূপ, তাহারই প্রাণের সত্তা
নাই। জ্যোতিঃ-ভাব, ভাবঃ অ-ভাবঃ একটি
স্বীকার করিয়াই ইহারটি বিজ্ঞানকে স্বাধীন
অর্থব্যবহার দেয় নিজের স্বাধীন জ্যোতিঃ-
অভাব বা অস্বাক্ষর—ইহাকে প্রকাশ্য করিতে
জ্যোতিঃ-স্বাধীন। জ্যোতিঃ-স্বাক্ষরিত হইয়া
জ্ঞান পথিভূত হইয়া ফিরা। এই ফিরা
স্বাধীন। এই স্বাধীনবাব, জ্ঞানকে প্রকাশ্য
জ্যোতিঃ-ইহাও বহির্গত হইয়া স্বাধীনকে স্বাক্ষর
পাড়ে। স্বাধীন ইহাও স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন
কিন্তু ক্রমশঃ বহির্গত হইয়া স্বাধীন। স্বাধীন
অস্বাক্ষর স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন
হইয়া স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন
স্বাধীন। স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন
জ্ঞান স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন
(স্বাধীন) স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন
অস্বাক্ষর স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন
স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন
এবং এরিষ্টল স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন
কার্য্যছেন ইহার স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন

যাহা হউক, যে বিষয় অধিক প্রাচুর্য
প্রদর্শন নাও। পরোক্ষ দ্বারা বলা যায় উক্ত
হংসেই আমাদের বসবাস স্থিতি হইবে। যেহেতু
সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইয়া প্রত্যক্ষ স্বরূপ কারণ
শাস্ত্র বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে। তিনটি
মার্গই ত্রিবিধ উপায় স্বরূপ। প্রত্যক্ষ দ্বারা

দেশান বাহিরে গিয়ে। প্রতিজ্ঞাশাস্ত্রের
কান্দীর শৈবজ্যোতিষ ও পঞ্চাঙ্গকে
ভাবেই গান করিয়া থাকেন।

তারপর তৃতীয় সিরাজ বা কনকজী
মণ্ড ও আপা পাণ্ডা বাস। এম নর
জ্যোতিষি বিদ্যা, চন্দ্রবিদ্যা (বা কনকজী)
বৈদিক মহাজ্ঞান। দেশে সকল প্রকার
রশ্মি। উচ্চাচীরে মাতৃকা, বর্ষা, বর্ষা, শুভ
প্রভাত নামে কান্ডিত অবস্থা। এম নর
মাল। আপা পাণ্ডা বাস। চন্দ্রবিদ্যা
বহির্বিকাশ। এম নর। এম নর। এম নর।

অধ্যাপক। এম নর। এম নর। এম নর।
রস ও প্রেম। এম নর। এম নর। এম নর।
(Ottoman power vol I, p. 64) এম নর।
মহেব ইতিহাস। এম নর। এম নর। এম নর।
নবপ্রাচীন। এম নর। এম নর। এম নর।

প্রতিজ্ঞাশাস্ত্রের আধমূলক সিদ্ধান্ত ও
জ্ঞানের গবেষণা করিলে মনে হয় স্থান-
বিশেষের মহামতের সাহিত্য ভারতবর্ষের
এটা সমস্ত আলোকজাগ্রার ততটা নহে।

(১০) উপসংহার

আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রতিজ্ঞাশাস্ত্রের
বিষয় লিখলাম। প্রতিজ্ঞাশাস্ত্রের গ্রন্থাবলী
এবং কান্দীর ও দক্ষিণাপথে ভারত প্রচারের
উদ্দেশ্যে প্রচারের অন্তে পরিশোধিত। এজন্য
করিব মজা বহিল। এজন্য আমরা অনাস্তর
করিব মজা করিয়া মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়ের
অন্যতম প্রবৃত্তি হইল। আশা করি
প্রচার, ভারতীয় শ্রমের এই বিশ্বস্ত
কর্মটির পুনরুজ্জীবন প্রাচীন গৌরবের
স্থিতি আলাহ করিবেন।

ফণ্ডন

[প্রবন্ধের লাল রায়]

এখনকার লাল রায়ের গঠন বনের

অন্ধকারে,

ও সে রক্তের গুলি তরছে।

পলাসে গিয়ে কলকাতায় গবে দিয়েছে

চন্দনা

ও তার গানে গানে গগন ছাড়ে যে।

শোকের প্রকাশের ধারায়,

ফণ্ডন শিখা বেড়িয়ে বেড়ায়,

নিদ্রিত মন মাতাল হলে দখিন হাওয়ায়।

গন্ধভারে।

ও গো মীল হিঁসে আকাশটাকে

হঠাৎ কাটালে

কে মেঘ-সাগরে ডেউ ধরেনা

জোয়ারে জাগানো

বসন্ত ভাঙে মনে বনে

দিচ্ছে পাতা ফাটা সপনে

কোন মাতালে মাড় চলেছে মনে

বীণা বাজছে খালি

নৌকোয় নিয়ন্তা

[শ্রীমতী চন্দ্রাবতী]

চড়কের মেলা। রামধনবাড়ীর নাটকের
চারদিক্‌ ঘিরে মেলা বসেছে। পুতুলের
দোকান—খাবারের দোকানে বাতচাঁপ অর্ধ
কের ওপর ভরে গেছে। ছোট, বড়, ছোট,
নেয়ে—বেউ বাবার হাত ধরে, কেউ দাদা-
কেঁলে চড়ে আর কেউ বা বি চাকরাণ
সঙ্গে মেলা দেখতে এসেছে। চারিদিকে
আনন্দ বল কল শব্দে ছুটে চলেছে।

মেলায় প্রবেশ পথে কুল পানি নিয়ে
একটা সুন্দর ফটক তৈরী করা হয়েছে।
এই ফটক দিয়েই সকলে যাচ্ছে—আসছে।
নাটকের সঙ্গে মেলা তখন খুব জমে উঠেছে,
কোথাক নাগর সোনার কুলেত কুলেত ছোট

নৌকোয় বসে বসে কাঁচা পিড়ির
ছড়, কোচাও কাঁচা পিড়ির ছড় চড়ে
সাঁপী ছোপের ঘোড়েনেড়া পিড়ি বাউয়ে
নিজের।

শেতনের আজ লাকার সঙ্গে
গোটে। ছাড়াই লাল ফল ফলের না
কিছুই। আশপাশের লোকেরা
সাঁপী দিয়ে মোড়া পিড়ি রসগোল্লা, মন,
একটা মন বড় খাড়া পিড়ি—সাঁপী
ফল কি। শেতনের মা নেই—সাঁপী
আশপাশের লোকেরা
সাঁপী দিয়ে মোড়া পিড়ি রসগোল্লা, মন,
একটা মন বড় খাড়া পিড়ি—সাঁপী
ফল কি। শেতনের মা নেই—সাঁপী
আশপাশের লোকেরা

সর্বেশ্বর বাবুও ভাবছিলেন—মেয়েটা কতখানি আবদার নিয়ে একটা বাণী জার কাছে চাইছিল। তিনি পেচন ফিরে থাকিয়ে দেখলেন ভিখারিণী তখনও “মোমিন” করে কাতর হয়ে, কত লোকে কাছে ভিক্ষার জন্ত হাত বাড়চ্ছে—কিন্তু সেই প্রার্থনা একটাও সফলত্ব রূপ ধরে তার মনোরথ পূর্ণ করতে, পড়ে না। শোভনার হাত ধরে আবার তিনি বাড়ী মুখো হলেন।

খানিকটা পথ অতিক্রম করবার পর সর্বেশ্বর বাবুর দৃষ্টি পড়ল, যে হালট “অলু” মেয়ের হাত ধরে ভিখারিণী আসছে! তার ল্পণ গতির প্রত্যেক ইঙ্গিতে একটা নিফল-তার ক্ষোভ ফুটে ফুট উঠছিল। সর্বেশ্বর বাবু দীর্ঘে চলতে লাগলেন।

রাস্তাব একপাশে গাঁকতরা পথবে নাদা দাড়ী বৃক পৃষ্ঠান্ত ঝুলিয়ে এক বুড়ো একটা খেলনার ঝড়িতে রকম পকম খেলনা সাজিয়ে কাগজের তৈরী একটা কুমকুমি বাঁজিয়ে ফ্রেণ্ডার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে চেষ্টা পাচ্ছে।

ভিখারিণী মেয়ের হাত ধান পথ চলেছে। চলতে আর পাচ্ছে না—এই দিব করাত পড়ছিল না, তার পা উলচে—না, পৃথকী! বুড়ার হাতে কুমকুমি বেড়ে উঠেছে—একহাতে তার কোমরটা গড়িয়ে মুখের দিকে চেয়ে, অল্প হাতখানি বুড়ার খেলনার ঝড়ির দিকে ফেরিয়ে বললে “চল না—একটা খেলনা আমার দে।” সে নিঃসঙ্গ কৃষ্ণ শব্দে মাকে ত্রোস্ত লাগল। ভিখারিণীও গল্প করবার লীলা পরিহার সেই একমাত্র সম্ভাব্য পরমাটা দিয়ে দেবে—একটা

কুমকুমি কিনে নিলে—মেয়েটা কাঁদার সোঁতকে বকে কপে মার সঙ্গে আবার চলতে লাগল।

সর্বেশ্বর বাবুর রোডের সামনে যে পাঁচটা অক্ষয়পুষ্করিণী দূরে দাঁড়িয়ে। ভিখারিণী একপাশে ধমকো লাড়িয়ে পড়লেন। ভিখারিণী তাঁর পাশ দিয়ে একটা মোড় দিয়ার অল্প রাস্তার চলে গেলে, তিনি তার আশ্রয় করে পেচন পেচন চললেন। খানিকটা পথ চলেই ভিখারিণী সব অক্ষয়পুষ্করিণীর মধ্যে ঢুকলেন! গলির শব্দে দেখেই সর্বেশ্বর বাবু বুঝে নিলেন—কোন প্রেমীর লোক এখানে থাকতে পারে! ভিখারিণী একপাশে ছোট ছোট খোলাব ঘর—তার একখানা বরের দরজা গুলে ভিখারিণী মেয়ের হাত ধরে তার মধ্যে প্রবেশ করল। সর্বেশ্বর বাবুও বাড়ীখানা দেখে নিয়ে অল্প রাস্তা ধরলেন।

ছোট খোলাব ঘরখানার এক পাশে, চার পাঁচটা একবেসিন কাঠের বাস এক করে—চার ওপর ছোট কাঠের নিয়ে একটা খিটনা পাঁচনা দাঁরে বাঁধে খোঁচকে তার ওপর শুক রদিয়ে, বরের এক পাশে একগাম্ভীর্য গড় পোনা আর একটা শরীর ভিখারিণী নিজেকে এলিয়ে দিলো। বরের এক কোণে মুণ্ডালা একটা কুঁচের কুঁচো—তার পাশে জীব ছোট একটা বাঁজের ওপর “ড” একটা মাতীর হাতের কল্যাণ একটা কলাই করা গেল। ও একটা কল্যাণ—আসবাব! মাতীর দেওয়ানে একটা কল্যাণ কেবলিন তেলের জিঁব, আলাদা করে বসে না কাগে

দিয়ে খোঁজা দিচ্ছে তার অনেক বেশী! একটু পরেই ভিখারিণী রাস্তা শরীর শূন্য থেকে জোর করে তুলে দখল করে ধরে মেয়ের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো; দেখলে সে ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু তবুও তার ক্রীণ শক্তি দিয়ে বুঠার মধ্যে ঢেপে রেখেছে কাগজের কুম-কুমিটা! ভিখারিণী মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল—কচি রাঙ্গা চোঁট ছুটির ফাঁক দিয়ে কি মুণ্ডে তামির ছটাই না ফুটে ফুটে বেরচ্ছে! এ মেয়েকে বুকে চেপে চুপ খাওয়ার জন্যে এমন তার ব্যগ্র বাহু ছুটি বাড়িয়েছে অমন নিজেবলী মনে পড়ে গেল "বুমিয়েছে—পেটে পোতে চাইবে।" কোন খানের ক্ষেত্র মনির দর আবতির দাঁটার এক বাতাস এসে মনকে বস্ত্র দিয়ে গেল। আজ ছোটো ভিগবানেরই ক্রীণ না খেয়ে মরবে—মর্দু পাণ তাঁবা কেনন কপে তা সহাবে। মন্দিরে গেলে নিশ্চয়ই সে কিছু ভিক্ষা পাবেই! ভিখারিণী আঙুলে দুখানটি খুলে বোড়িয়ে পড়ল। আশার উল্লসনর এক বুকম ছোটাই সে খানিকটা পুষ কপে হ'ল কিন্তু পর মুহুর্তেই তাকে পোতক বাড়ীর দেওয়াল আন্দ্র কপে চলাচল কল। মন্দিরের কাছে এসে সে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ইপাতে লাগল।

মন্দির থেকে বহুচেলীর অম্বর পরা, গলায় সোনার স্ত্রীকলস, মালা জড়ানো, হাতে সোনার তাবিজ জাঁজা একজন ধানিককে বেরতে দেখেই ভিখারিণী তার পদা পথ রোধ করে—হাত খানা পেতে ভিক্ষা চাইবে—তিনি সে দিকে ক্রক্ষেপ না করে কদম্বলার খানিকটা জল—তার গায়ে ছিটিয়ে, পাশকটে সবে পড়লেন। তবুও সে হুঁপু হুঁপু না। এক যুবতী অলঙ্কারে

দেখানি মুড়ে দেবতার দর্শনে এসেছিলেন— ভিখারিণী তার কাছে ছাঁট গেড়ে কাতর ক্রন্দনে ভিক্ষা করল কিন্তু নিখল—সবই নিষা।। গেছন থেকে কে একজন তাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেটে গেল। এম ঘোণা নিরাশা বুকের মধ্যে জমাি লেখে তার অবশিষ্ট ক্রীণ শক্তিকে ঘুচিয়ে দিগ হাত হুঁপানো জোড় করে, মন্দিরের দিকে তেজে বললে এ কোন ধর্ম দেবতা, যাতে অস্ত্রের প্রতি দয়া নেই, বাণিতের প্রতি সমবেদনা নেই! ভিখারিণী চোখে জগতটা এমন মূঢ় ব'ল মনে হ'ল—আজ তার নিজে দৈহিক মনোব'লার সত্যরূপ সেন দবা পড়ে গেছে! এতে ব'ল নেই, লোকের বাণ লোকে বুঝতে চায় না। মন্দিরে পশের জন আসন—তাঁর ভাণ! হাফে—কপবতী নিজে কপ দেবতা না নিজেই ক্রীণবা দেখা।

ভিখারিণী মস্তিষ্ক হাত খানো তপরে তুলে কি এক ভীষণ চিন্তা কব'ল মনে। দেখতে দেখতে ভিখারিণীর করুণা কপ'ল মূণ কঠোর হয়ে উঠলো। রাস্তার লোকের হাফে পাগল হাড়িরে তার সংক্ষণ পেরে নিজেদের সক্রিয় চলাত লাগল।

মন্দিরের আশে পশে খাবারের স্টোকান গুলোয় হরেক তরকন খাবার স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে। অমলোর ছটা তার কপ'ল হাড়ি সেগুলি মণককে লুপ কব'ল তুলছে। ভিখারিণী কঠোর দৃষ্টিতে এ দিকে চেয়ে রইলো। সে ঠিক জানে, চামচ এর এক ক্ষুদ্র কনাও কেউ দিবে না। এখানা অনাত্মীয় ভাবে রঞ্জিত করে ভাবলে "এক মুণ্ডে খাবার তুলে ছুট দি।" এম হাফতে গিয়ে তার চোখে

ভারা তখনি নয় সিঁথি দৃষ্টিতে ভরে গেল
মুখে স্বাভাবিক মমতার ছাপ ফুটে উঠলো !
ভিখারিণী উলরে উলতে লোকানগুলো ছাড়িয়ে
চলে গেল ।

মন্ত একখানা বাড়ী—তার দ্বারের
বাগানবর রোয়াকে একটা লোক একবাটী
ভাও নিয়ে কতকগুলো কুকুরকে খেতে দিচ্ছে !
ভিখারিণী কুটিল ! বে দরবান পুকুরের
সামান্য জীব কতক ওপর এত দরদ—ভগবানের
শ্রেষ্ঠ জীব মাছ সে, নিশ্চয় তিনি তাঁর ককণার
দৃষ্টিতে তার সকল দৈত্য খুঁচিয়ে দেবেন । সে
ছুটে এসে কুকুরের কত সেই ভাণ্ডের অংশ নিতে
একখানি ছোট ছোট দিলে—কিছু সেই
মৎস্যের হাড় খানো সরিয়ে নিতে পায় পেল না !
সে যেকটা দাঁত বিস্ফুরিত, সে “ক’ছর” করে
তাকে ভেঙে ফেলে । সে কত ব্যক্তি, কত
নিমিত্ত এই লোকটাকে করতে লাগল কিন্তু
লোকটার দরদ এক তিলও সে অধিকার
করতে পারেনা ।

ভিখারিণী স্থির করলে সে মরবে—বে
দগ্ধত বীণ বেদনা বুঝতে লোকে পারে
না,—চল না । বেদনাম ভগবানের নাম—
একটা ভেক ! সে বাড়ী তারই দোজাই
দিয়ে কত লোক মুখ ক’বছে—অরে সে—
হয়ত তাই মত আরও কত হতভাগা এমনি
কষ্ট পাচ্ছে ! কি হবে সে ভাণ্ডে থেকে ।
বিদ্রোহের একটা আশুনা প্রবল বেগে তার
হৃদয়ে ধু ধু করে জ্বলে উঠবে । সে উদ্ভিজ্জিত
হয় হাত কামড়তে লাগল—চুলের গুদী ধরে
টানতে লাগল ।

মরবার কথা ভাবতেই মনের আশ্রিতে
একখানি মুখ ভেসে উঠবে । তার কাছে সে

মুখখানি কত শান্তি, কত শান্তি ! ভিখা-
রিণী তেমনি করে বেদনা ধরে বাড়ীর দিকে
চললো ।

ভিখারিণীর মেয়েটা কত সুখি—তার
হাতের শক্ত মূঠোর মধ্যে কান্দাকা কান্দামিটি
তখনও সে চেপে ধরে জাহ্নবী মেয়েটা
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুখ দেখতে লাগল । যেন
একটা খুঁড়খুঁড়ি বুড়ো—একজালা খেলনা
তাকে দেবার জন্তে ডাংছে । সে ছুটে গিয়ে
খেলনার ডালা থেকে কত সুখ, বাণী,
বাজনা তুলে নিলে । সে শুধি বুঝে চেপে
মাকে দেখাবার জন্তে ছুটে আসবেই দমাস
করে একটা আঁচড় খেতে স্নান সে শুরু গেল ।

চীৎকার করে কেঁদে সে ছেলে উঠলো !
শিশুর মধুর স্বপ্ন ছিন্ন হয়ে গেলে বিছানায়
জেগে চোখ রগড়ে বগল সে চরমিমে চাইতে
লাগলো । কিন্তু না দেখতে পেলে খেলনা ওয়ালা
বুড়োকে, না দেখতে পেলে মাকে । বলিকা
প্রাণের আবেগে না, না, না, বাল্য চৈতরে
উঠলো !

তৎক্ষণে ভিখারিণী উলতে উলতে ঘরের
দরজা অবধি পৌঁচতে কঙ্কার চীৎকার
হুনেই সে দমকা হাওয়ায় দরজার ঢেকে
দেয়েকে বকে চেপে “ম’ম’ হুয়েছে মা আমার”
বলে তার মাথায় কপাল মাত বুলোতে
লাগল । মেয়ে কেঁদেই কেঁদেই মাকে
তার স্বপ্ন কথা বলতে লাগল ।

এদিকে সর্বোচ্চর খান মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে
ভিখারিণীর ঘরের দরজার ওদিককার একটা
দোকানে ঢুকলেন ! দোকান থেকে কিছু কাপড়
চোপড় কিনে অল্প একটা খাবারের দোকানে

গিরে বিজয়ী হইয়াছেন। মোদের হাত
থরে আবার তিনি ভিখারিণীর হাতের দিকে
চলেন। তখন হাতের কিছু হয়েছে। অতঃপর
সাত বছর মোরে শোভনাবাবার সঙ্গে
সঙ্গে বেশ-টিছে। সর্বোত্তম হইবে ভিখারিণীর
দরজার কাছে গিরে জাকাজকি। “থরে কে
আছ—ওরুচু?”

ভিখারিণী মেয়েকে কোথা থেকে নামিয়ে
বিছানার বসিয়ে দিলে। খুলে আসলো হাতের
সর্বোত্তম বাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। তখন
সর্বোত্তম বাবু ঘরে ঢুকে তার হাতে একখানা
কাপড়, মেয়ের জন্য একটা জামা, ছাত্রের জন্য
বুড়ি কাপড় আর একটা টাকা দিয়ে বললেন,
“নাও বাবা—এগুলো তুলে রাখ।” তখন
ভিখারিণী বিজয়ের অতীত এমন একটা
জায়গায় পৌঁছেছে যে তার হাতে হচ্ছে বাকি সে
মেয়েরই মত পণ্য দেখছে। ভিখারিণী মত
খানায় ওপর মাথা ঘুরে দেখেছিল বেশ
রকমে নিজেকে এতদূর খাড়া করে রেখেছিল
পাত্রটোর আর শাক হইল। মোদের মোর
মাথায় কবে কীভাবে থাকবে—ভিখারিণী
অবসর জায়গায় মোদের ওপর বসে পড়ল। সে
বসে থাকল চিত্রে আঁকা একখানা ছাব্বার মত।
মুখ দিয়ে তার কথা বেরুছিল না—কিন্তু চোখ
দিয়ে দুটে বেরুছিল একটা বিজয়ের আভা।
তার দারদার অতীত এ কি করে গন্তব্য হইবে

পারে। “অথচ কেমন” করেই বা প্রত্যক্ষ
সত্যকে সে বিশ্বাস করে? ভিখারিণী কাতর
চোখের সমুদ্র চাহনি খসচ করে—অন্তরের
সব কতজ্ঞতাটুকু উজ্জ্বল করে ঢেঁদে দিলে
“ওই মহাশয়ার পার।” নিঃশব্দেই সে দান
শেষ হয়ে গেল।

শোভনা দেখলে ভিখারিণীর মেয়েটা ডাগর
চোখ মেলে তার খেলনাগুলোব দিকে কেমন
চেয়ে আছে। সে ভাবলে “তার ত কত
খেলনা আছে কিন্তু খেলবার জন্তে ও মেয়েটার
একটাও খেলনা নেই। আব ওকে কিনে
দেবার ও কেউ নেই। এগুলো দিয়ে দি ওকে।
সে বাবাকে বলে আবার নয় খেলনা কিনে
নেবে।” শোভনা হাতের দাঁশী, খেলনা
সবগুলো তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে
“এই নাও!”

ভিখারিণীর মেয়েটা ছোট সেখানে বোলে
চেপে ধরলো।

ভিখারিণী সর্বোত্তম বাবুর দিকে চেয়ে
আছে দেবতার সম্মুখে—সর্বোত্তম বাবু কতবার
দিকে চেয়ে আছেন আনন্দে, যেতে গলে—আর
শিশু ৩টি চেয়ে আছে ওপর দিকে। সর্বোত্তম
বাবু শোভনাকে বুকে চেপে আনন্দে চুমু
খেলেন। ভিখারিণী মোদের মাথায় হাত দিয়ে
দেবতাও দেবদেবতার আনন্দ খেলা দেখতে
লাগল।

পাশ্চাত্য দর্শনে চিন্তার ধারা

[অধ্যাপক শ্রীঅনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

যে আলোকের ধর্ম বস্তুকে প্রকাশ করা, সেই আলোক স্বধন সহসা তীব্রভাবে নয়নপথে আসিয়া পড়ে, তখন সে বস্তুর গোপন কবে। ঐ আলোকের তীব্রতা ইন্দ্রিয়ের স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়া এ ক্ষেত্রে উহার বস্তুত্ব ধর্মটির অতি-ব্যক্তি হইতে পারে না। যদি কোর কবিতা ইন্দ্রিয়কে ঐ তীব্র আলোক দগু করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে দর্শনেন্দ্রিয়ের যে স্বাভাবিক ধর্ম তাহারও লোপ পায়। তেমনি হিন্দু সমাজের আদর্শ হানীর ভোগসম্প্রদা বিরত কোনও সদব্রাজ্ঞকে যদি পাশ্চাত্য সমাজের রীতি অনুসারে কেঁটাপ্যাণ্ট ও বুট পরিয়া উপাসনা, কাঁটাচামচে লইয়া টেবিলের উপর ভোজন ও নেক্‌টাই গলায় লাগাইয়া চেয়ারে উপবেশন করিতে বাধ্য করা হয়, কিংবা একজন পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যস্ত চরাক্ষকে ললাটে ত্রিপুরা গন্ধে নামাবলি, অঙ্কুরাসনে উপবেশন, হবিচার ভোজন প্রভৃতি তিন্দুধর্মের কঠোর মানিবা চর্চিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষেই মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কাই অধিক। মানুষকে যদি হস্ত দ্বারা ভ্রমণ ও পদ দ্বারা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে এই হস্তপদের নিজ নিজ ধর্ম পরিবর্তনের জন্ত সাধ্যের যে অমঙ্গল হয়, একটা সমাজের

ধর্ম সমাজান্তর ধর্ম দ্বারা বিনষ্ট হইলে, বিশ্ব মানবেরও সেই প্রকার অমঙ্গল হইবাবই সম্ভাবনা। জগতে যেমন প্রত্যেক জিনিষের একটা স্বভাব ধর্ম আছে, তেমনি প্রত্যেক সমাজ ও প্রত্যেক সভ্যতারও একটা বিশিষ্টতা আছে। এই স্বভাব ও বিশিষ্টতা আছে বলিয়াই জগৎ কণ্যামের আকর, তাই সাধারণতঃ সেবা করে যে, যাহারা ঐ ধর্ম পবিত্রাণ করিয়া ধর্মবস্তুর গ্রহণ করেন, তাহাদের মধ্যে এই ধর্মবস্তুর একটাও সম্ভাবনা লাভ করিতে পারে না। ব্যক্তির সংস্করণ ব্যক্তির ধর্মের স্বরূপ হয় না; যে চিত্ত ও সংস্করণে ভিত্তি করিয়া পশ্চীম দেশে গঠিত হয়, নতুন ধর্মের স্পর্শে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়া উহাকে পরিহার করাই প্রেরণ। এই ধর্মবিষয়ে ভারতের বাণী—স্বদেশে নিবনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। এই ধর্মজীবনের আদর্শ ব্যতীত ভারতের আরও একটা আদর্শ আছে সেটা মূলদৃষ্টিতে দেখিতে মনে হয় ইহা জন্ত ভাবের; এটা জ্ঞানের আদর্শ। এই জ্ঞান রাজ্যে ভাব-তের বাণী—অজ্ঞানং সর্বভূতেষু যঃ পশুতি সঃ পশুতঃ। ধর্মজীবনে চাই ব্যক্তির সংস্করণ, কিন্তু এখানে চাই ব্যক্তির বিসর্জন। জ্ঞানের রাজ্যে নতনের স্পর্শে পুরাতন কল্লিত লা হইয়া

বহু পুষ্টিলাভ করে। তাই আমরা জানে
কর যে, এই পুষ্টিলাভের জন্যে আমরা
বিরোধ আছে। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করি
ভাবপন্থা নয়, এখানে যেমন ভাবপন্থা সাধনার
বিশেষ বলিয়া বোধ হয়। এখানে ধর্ম ও
জ্ঞান পরস্পর একই রকম। এখানে
জ্ঞানের পরিণতি হয় জ্ঞানের সত্যত্ব, আর
বিসংকল্পের পূর্ণতা হয়। সেটাই জ্ঞান
ভারতের সংস্কৃতিতে আদর্শ মানব জ্ঞান, তাহা
জ্ঞানের উপাসনাকে ধর্মপন্থা পরিণত করিয়া
চলে না। এটাই কল্যাণীই বোধহয়। অতএব
বক্তব্য।

জ্ঞানের পক্ষে আমরা জ্ঞানের প্রয়োজন
কেন হয় তাহার এককটি কারণ সাধারণ
জ্ঞানের লক্ষণ হচ্ছে যে জ্ঞান সাধারণ
জ্ঞানের নিয়মই এই যে সেখানে সত্যত্ব
জ্ঞানে কোন সত্যত্বের স্থান নাই, এবং সেখানে
নতুন ও পুরাতনের মধ্যে বিবাদ নাই।
আমরা জ্ঞানের পক্ষে যেমন সত্যতা কাহা
বাক্যগত সত্যত্ব মধ্যে বহু প্রতিকটন না।
যে জিনিষ সত্যতা বস্তুই সত্যতা তাহাকে আমি
আমরা রোগের ন্যায় উপর দৃষ্টি করিয়া
যদি বলতে বলি, তাহা হইলে এটাই কলিত
গভীর মধ্যে সত্যত্ব প্রকাশ্য হয় না। সেই
জ্ঞান যিনি জ্ঞানের উপাসক তাঁহাকে আপনার
কৃত গভীর জ্ঞানকে বিবেচনা করে অস্তিত্ব হইতে
হয়। তেমনই আমরা যদি প্রতিদিন
ব্রাহ্মমূর্ত্তে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি, গম্যমান
সম্মানন দি করি পরে আমরা একবার মাত্র
নিরামিষ আচরণে জ্ঞান করি, এবং
ইচ্ছাতে যদি কোন ভাট্টার আচার অভাব-
জনিক কল্যাণের ও আচার্য্যিকার ভাবিয়া

প্রাতে সত্যত্বের সময় সত্যত্যাগ করিয়াই
বিশ্বটমস্ চা, সত্যত্যাগে আমিবাণি গৃহীতব্রব্য
জ্ঞান প্রভৃতি সত্যত্যাগের রীতি অত্যাচার
পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাহার
উদ্দেশ্য বড়ই সাদৃশ্য উচ্চ হউক না কেন,
আমরা তাহার দ্বারা উপকারের অপেক্ষা অপ-
কার হইবার বেশী সম্ভাবনা। এ সকল
বিষয়ে আমার বক্তব্য ও অভ্যাস বস্তু পুরাতন
তাহাকে নবম জন্মে ফলিতে হইলে তাহাতে
ভক্ত বোধী নিগদ। বিদ্য যদি কোন শিশু
তাহার পুরাতন অভ্যাসের উপর নির্ভর করিয়া
প্রত্যেককে মিথ্যাবাদের হস্তান্ত্র নির্দেশ বলিয়া
চিন্তা করে, তাহা হইলে এক্ষেত্রে তাহার
পূর্ব অভ্যাসের ও পুরাতন অভ্যাস ছাড়াই
কাব্য হইয়া উঠে। কারণ জ্ঞানভাজের
বিশেষ এই যে, সেখানে যাহা পুরাতন,
তাহাকে আকাঙ্ক্ষা ধরিয়া রাখিলে চলে না;
নতুন অর্থাৎ জ্ঞান অস্তিত্বের দাবী সর্বদাই উদ্ভ-
ঘটিত না রাখিলে জ্ঞানের উপাসনার সকলতা
গত করি বাব না। বর্তমান সেই এক ধর্ম-
তীত। সত্যের স্বরূপ আমার নিকট প্রক-
টিত না হয়, ততদিন আমি যদি আমার পূর্ব
সম্বন্ধিত রক্তরাজি প্রয়োজন হইলে নবাগত অতি-
থির চরণে উপঢৌকন দিতে পারি, তবে
কেবল পূর্ব পরিচিত বস্তুর আকর্ষণে অভ্য-
গতের অর্চনা না কাব্য পারি, তাহা হইলে
আমরা জ্ঞানের উপাসনা বিভ্রম নাহি; কারণ
আমরা মন্দির পাশ এখনও কাছে নাই, আদ-
র্শের জ্ঞান যেরূপ একনিষ্ঠতা ও ব্যাকুলতা প্রয়ো-
জনীয়, আমার মনে তাহা এখনও দেখা যায়
নাই। সত্যজ্ঞানের সিনি প্রকৃত সাধক তিনি
যেখানে বহু দেখিতে পান তাহাকেই মারা বা

ভুল করিয়া পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে
যতই পুরাতন ঐক্য না কেন যে জিনিষ
সত্য সত্যই আট হাত, তাহা যদি কাহারও
হাতের অধীনস্থ হাত হাত, কাহারও নিকট
সাড়ে সাত হাত, আবার কাহারও নিকট সাড়ে
আট হাত লগ্না বলিষ্ঠ বোধ হয়, তাহা হইলে
এই বহু হাতের বহু ভাবের মধ্যে সজ্জের স্বরূপ
ধরিতে পারা যায় না। সেই জগৎ জ্ঞানের
সাধক আমিহ ও বহুত্বকে অতিক্রম করিয়া এই
বিশ্ব মূর্তিকে ধরিতার জগৎ চেষ্টা করেন যাহাকে
জানিতে পারিলে বহুত্ব মায়ামাত্র বলিয়া মনে
হয়।

সত্যের এই বিশ্বপ্রসঙ্গিকতা বলায় আগবা
ভুলিয়া যাউ। তখন জ্ঞানের দ্বারদ্বার নতুন
পুরাতনের মধ্যে বিবাদ ঘনিষ্ঠা যায়। এই
জগৎই এখন পূর্ণাঙ্গের আলোক প্রথমে
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপর পড়িতে আসন্ত
করিল, তখন তাঁহারা ইহাকে অপরিচিত
দেখিয়া অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। ভারত
যে জ্ঞানের রাজ্যে কোন একটা আসন
গ্রহণ করিতে পারে, তাহা তাঁহারা স্বীকার
করিতেনই পারিলেন না। কিন্তু এখন তাঁহাদের
সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে; তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে,
যে জগতে চিনি লবণ ও কুইনাইন মকদ্দমই
শাদা, সেখানে কেবল মাত্র বর্ণকে মূলমন্ত্র
করিলে—জ্ঞানের অন্ধকার দূরকরা যায় না।
কেবলমাত্র গাইবেলের দ্বোহাই দিয়া নীতি
পাশ্চাত্যজগৎ কোপ্যাবিকম, নিউটন প্রভৃতি
পণ্ডিতগণের মূর্তিই চিত্তাকর্ষক মূখ্য বস্তু
করিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে আম
যে বহুমূল্য-বহুময়, মহাসাগর জগৎকে তত্ত্বিত
করিয়াছে তাহা অকালেই প্রকাটিয়া যাউত।

জগৎ জ্ঞানের দ্বারদ্বার নতুন পুরাতনের মধ্যে
বিবাদ ঘনিষ্ঠা যায়। এই জগৎই এখন পূর্ণাঙ্গের
আলোক প্রথমে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপর পড়িতে
আসন্ত করিল, তখন তাঁহারা ইহাকে অপরিচিত
দেখিয়া অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। ভারত
যে জ্ঞানের রাজ্যে কোন একটা আসন
গ্রহণ করিতে পারে, তাহা তাঁহারা স্বীকার
করিতেনই পারিলেন না। কিন্তু এখন তাঁহাদের
সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে; তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে,
যে জগতে চিনি লবণ ও কুইনাইন মকদ্দমই
শাদা, সেখানে কেবল মাত্র বর্ণকে মূলমন্ত্র
করিলে—জ্ঞানের অন্ধকার দূরকরা যায় না।
কেবলমাত্র গাইবেলের দ্বোহাই দিয়া নীতি
পাশ্চাত্যজগৎ কোপ্যাবিকম, নিউটন প্রভৃতি
পণ্ডিতগণের মূর্তিই চিত্তাকর্ষক মূখ্য বস্তু
করিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে আম
যে বহুমূল্য-বহুময়, মহাসাগর জগৎকে তত্ত্বিত
করিয়াছে তাহা অকালেই প্রকাটিয়া যাউত।

মার্কসই একজন বলে, এমন সেই জনের
মেরিনী শব্দকে "আমি" "তুমি"র ব্যবহার
হ্রস্বতর হইয়া জন্মিয়া পড়ে। এই বাক্যের
কোনমাত্র সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ধারা—সর্বমুখী
উপাসীক ভবু ভবু ভবু ভবু। আমরা যেন এই
আদর্শ কৃত্রিমতায় গিয়াছি। জাতীয় উন্নতির
প্রেরণা—আমাদের অন্তরের মাঝে এমনই
একটা মোহজাল বিস্তার করিয়াছে যে জ্ঞানের
রাজ্যেও আমরা প্রাচীর ভুলিতে আরম্ভ
করিয়াছি। দেশ কাল, সমাজ জাতি, বর্ণ
গোত্র এসকলের শৃঙ্খলে জ্ঞানের আলোক
বন্ধ থাকিতে পারে না। আমরা এই সহজ
সত্যটা ভুলিয়া বাইতেছি বলিয়াই যেন আজ
পাশ্চাত্যজগত আমাদের কানের কাছে সেই
সনাতন অর্ধবিস্তৃত শিশুটির সুরটী বারংবার
বাজাইয়া মনে করাইয়া দিতেছে যে তোমরা
এই জাতীয় উদ্বোধনের দিনে তোমাদের
জাতীয় সুরটী ভুলিও না; তোমাদের যে
সুরটী আজ সমস্ত জগতের চিত্তকে আকর্ষণ
করিয়াছে, তাহার অমৃত নিখর হইতে
নিজের বঞ্চিত করিও না।—তাই আমার
মন হয় যে এই বিদেশী বর্জনের দিনে
পাশ্চাত্য চিন্তার আলোচনা ও পশ্চিমের
তপস্বীকে সন্মান প্রদর্শন করা ভারতসম্প্রদায়ের
পক্ষে অগৌরবের কথা নয়।

পাশ্চাত্য চিন্তার ধারা সম্বন্ধে আলোচনা
করিতে হইলে লেখানুকার পণ্ডিতগণের বিচারে
দর্শন কি, আর দার্শনিকের লক্ষণ কি,
এ বিষয়ে কিছু বলা দরকার। এখানে প্রথমেই
একটা কথা নিবেদন করিয়া রাখি। আমরা
সকলেই জানি যে, একই সূর্য্যরশ্মি কাদ,
স্বর্গিক, মৃত্যু প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুতে পড়িয়া

বিভিন্ন আকার ধারণ করে; "ফটিকের
নিকট স্থায়ী হইয়া পড়ে, মৃত্যুর
নিকট তালা আঁশ করিতে পারা যায় না।
সেই প্রকার, পাশ্চাত্য দর্শনের রূপ লেখকের
চোখে যত্নাবে ধরা যাইবে, তাহাই এখানে
বিস্তৃত হইবে, এবং অল্পভূক্তির দোষে যদি
দর্শনের স্বরূপ বিকৃত হইয়া থাকে তাহার
জন্ত লেখক কক্ষার পাত্র।—আমরা যখন
বিষয়ের রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ
করি, তখন দেখিতে পাই যে পূর্ব হইতেই
কতকগুলি বিশ্বাস আমাদের মনে বদ্ধমূল
হইয়া আছে। এই বিশ্বাসগুলির মধ্যে
আবার কতকগুলি এমনই প্রকৃতিগত হইয়া
গিয়াছে, তাহাদের শিকড় অন্তরঙ্গের পরতে
পরতে এমনইভাবে জড়িয়া আছে যে, উত্থাকে
উপড়াইতে গেলে যেন বোধ হয় যে মর্মের
গ্রন্থিগুলিও ঐ সঙ্গে শিথিল হইয়া পড়িল;
মনে হয় যেন আগছান্দুলিতে গিয়া কোন এক
অন্তরতম প্রদেশের বহুদিনের সঞ্চিত রত্ন-
গুলিকেও তুলিয়া ফেলিয়া দিতেছি। যেহেতু
আমাদের বাহ্য জগতের অন্তর সম্বন্ধে বিশ্বাস।
ঐ যে গাছগুলি উন্নতশির হইয়া কত যুগ-
যুগান্তরের ঘটনার সাক্ষী স্বরূপ ঐ স্থানেই
বঁকাইয়া রহিয়াছে, এই যে অসংখ্য অট্টালিকা
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের
পর বৎসর একই ভাবে এইখানেই অচল ও
অশ্রবণ থাকিয়া মানুষের সুখদুঃখের অনিত্য-
তাকে হুটাইয়া তুলিতেছে, ঐ যে পশ্চিম গগনের
মেষের উপর নানাবর্ণের বিভিন্ন খেলা আমাদের
শাস্ত্রচিন্তে কি এক অনন্ত অনিবার্য স্বপ্নময়
তরঙ্গ তুলিয়া দিতেছে—এই সকল প্রাকৃতিক
বস্তুসমূহের এই যে দুর্ভাগ্য জগত আমাদের

তাহাকে যে শিক্ষা দেয়, পরমুহর্তে তাহাকে
জানিয়া কেলে। বতাদন শিশু জন্মের রহস্য
ভেদ না করিতে পারে, তৃতদিন আপনীর সুখ-
দুঃখের নিমিত্ত তাহার মাতা-পিতার উপর
নির্ভর না করিলে চলে না। কিন্তু এমন পর-
স্থাপেক্ষী হইয়া বৈশ্বদিক থাকি অসম্ভব।
কলের ক্রীড়নকের ফল উপায়া বিলেই সে
নির্দিষ্টভাবে কিছুকণ চলিয়া থাকে, কিন্তু দশ
দুই মাসেই, সে আবার অন্তের উপর নির্ভর
কবে। মানুষের কিন্তু আত্মনির্ভরতা না
থাকিলে চলে না। সেই জন্য কিয়ৎ পরিমাণে
বাধ্য হইয়া, এক বাধ্য বিহীন স্বতন্ত্র শক্তিকে
জগতের কুতূহল ভাসিতে হয়। দত্ত তাহার
উত্তমকে ও দত্ত তাহার অধ্যবসায়কে। তাহার
অদম্য কৌতূহলের ফলে ঐকজ্ঞাপিকের বাচন
জগৎশাই খুলিতে থাকে। তখন সে জানিতে
পারে যে অগ্নির রূপ নয়ন মুকুট হইলেও তাহার
অগ্নিদ্বনে সুখ পাওয়া যায় না, যে তবর্ণ কখন
কখন সত্যি জ্বলের পথপ্রদর্শক হইলেও তাহার
স্বতন্ত্র মূল সময়েই অনুসরণ করিলে প্রাণ-
বিহীন হইতে হয়, জগতের যে সকল বস্তু পিতা-
মাতার দার্জিক আবরণ প্রাপ্ত থাকে তাহারা
সবসময় স্বেচ্ছাচারবানার আশ্রয় হইতে পারে
না। এখন হইতে, কোন একটা বস্তুকে
জানিতে হইলে যে আর একটামাত্র ইঞ্জিনের
তোষামোদ প্রভাবিত হইতে চায় না; এক-
জনর বাহিনী অন্তের দ্বারা সংশোধিত করিয়া
হয়, একটা কণের অভিজ্ঞতাকে অন্য কণের
শক্তিতে চিত্র পুষ্ট করিতে চেষ্টা করে, এবং
আপনার অভিজ্ঞতা অপরের কষ্ট পাথনে
কবিতা বেধিতে চায়। এইরূপে তাহা গভীর
মধ্য দিয়া সে নিজের জ্ঞানমন্দিরটী এমনই

ভাবে প্রস্তুত করিয়া যত যে তাহার দৈনন্দিন
জীবনের কাজকর্ম উদ্ধার দ্বারা ছুৎপন্ন হইতে
পারে। এই দৈনন্দিন জীবনের কাজ চালান
জ্ঞানকে আমরা সাধারণ জ্ঞান বা ব্যবহারিক
জ্ঞান বলি। এই সাধারণ জ্ঞান ক্ষুদ্র শিশুর জ্ঞানের
জ্ঞান কণভঙ্গুর নয়, ইহা এক মুহূর্তে জল-
দ্রব বৃক্কে উঠিয়া পরমুহর্তে জলধির বাক্স
মিশাইয়া যায় না। এই সাধারণ জ্ঞানকে
আমরা সত্য বলি তাহার কারণ ইহাও এই
অবিনশ্বরতা : বহুমুহূর্তের মধ্যেও তাহার মুক্তি
অক্ষয় থাকে, আর বহুবাঞ্ছিত বস্তুকে অতিক্রম
করিয়া উচ্চ নিজের একদর বস্তুতে রাখিতে
পারে। তিন ও পাঁচের গুণ কাঁচের পনের
হয়, ইহাকে আমরা সত্য বলি তাহার
বারণ, এই বস্তু রাখির ও বস্তুকণের বহুত্ব
অতিক্রম করিয়া তাহাদের পবন্যের সম্বন্ধটী
এক ও অবিনশ্বর থাকিয়া যায়। এই এক ও
নিত্যসম্বন্ধটী অক্ষরপ্রবাদের আরাধ্য বস্তু।
জ্ঞানের লক্ষ্য যদি হয় সত্য, এবং সত্যের
সঞ্চয় যদি হয় একতা ও নিত্যতা, তাহা
হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃতজ্ঞান
ব্যবহারিক জ্ঞানের অনেক উপরে অবস্থিত।
সাধারণ জীবনে যেটুকু আলোক না হইলে
পথের অন্ধকার দূর হয় না, সেটুকু আলো
পাইলেই আমরা চরিতার্থ বোধ করি।
আমরা জানি যে অগ্নির স্পর্শে যন্ত্রণা হয়,
তাহার শক্তিতে খাদ্যজন্ত প্রস্তুত হয়, এবং
তাহার উত্তাপে শীতের কষ্ট দূরীভূত হয়।
অগ্নি সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করিতে
পারিলেই আমরা সাধারণতঃ আর কিছুই
অনিবার্য জ্ঞান ব্যতী হই না। কিন্তু যখন
মানুষের জ্ঞানশীলতা ব্যবহারিক জীবনের

অবিশ্রমকল্পিতকৈ আত্মকম করিয়া উঠে, যখন সে কেবলমাত্র শয়ন ভোজন করিয়া তত্ত্ব থাকিতে পারে না, তখন যে মন্দিরটি কত দিনের কত সন্ধানের ফলে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে তাকে সে পুনরায় পর্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। যে বিশ্বাসগুলি বহুকটা জীবনের শাসন, আর কতকটা দিদিমান প্রভৃতি মনোমতের কর্তব্য বলে হইতে পারে তাহা উন্মীলিত করিতে চেষ্টা করে। অনেক স্বাভাবিক মননের সহিত সেগুলির কোন সন্দেহ আছে কি না, তাহা নির্ধারণ করিতে একটি আশ্রয় করিয়া উঠে। যে সময়ে মাতামহের মস্তকধারনে এক বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপাদান উৎকর্ষিত হইয়া উঠে, তখন হইতে তাহার দার্শনিক জীবন জন্মগ্রহণ করে। এখন এই যে জ্ঞানকে কেবল জ্ঞানের জগত উৎকর্ষিত করে, আর সত্যকে কেবল সত্যের জগত শাসিত করে।

এই জ্ঞানের প্রাথমিক স্বরূপেই প্রাথমিক অভিব্যক্তি কল্পিত অনেকগুলি উপাদানের দ্বারা, যে উপাদান সমূহের অভাবে আমাদের অনেকের মস্তকই হইত। ফলশ্রুতি হইত। কিন্তু যদি একবার প্রাথমিক জ্ঞানের দ্বারা প্রাথমিক হয়, সে ক্ষেত্রে ক্রমে নিখিল-প্রাণের উপর এমন একটা আদিপাতা-বিস্তার করে যে এখন হইতে মনে হয় যেন জীবন-নাটকের প্রাথমিক নটন অঙ্কের আরম্ভ হইল। এখন আর জ্ঞানের জীবনের দেনা পাওনার হিসাবের সহিত খতাইয়া দেখিবার দরকার হয় না। ভগবান সত্যকে আমার বিশ্বাস কেমন হইলে সকলেই আমার প্রকৃত হিন্দু ও ব্রাহ্মণকুলধরদের বলিবেন বিশ্ব সৃষ্টি সত্যকে

কোন সত্যকে বিশ্বাস করিতে পারিলে আমার দেখিয়া কেউ কখনও কখনও নাসিক। কৃষ্ণ ও করিবেন না, আমার ও আমার বিষয়ে আমার বিশ্বাস কিপ্রকার হইলে আমার পুত্র কন্যার বিবাহোৎসবের কে - ব্যাঘাত হইবে না—এই প্রকার জ্ঞানের সহিত যেখানে ব্যবহারিক জীবনের সম্বন্ধ, সেখানেই সেইটুকু জানিয়াই আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায় না। এখন হইতে আমাদের সত্য হইবে কেবলমাত্র একমুখের অভিব্যক্তি। এখন একবার এই পূর্বক বর্ণিত জ্ঞানমন্দিরটির দিক চাছিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তাহার অনেক মনোমত অতি দক্ষ, এই যে কল্পিত বাস্তবের পেশমাজেই হইবে তাহা পড়িতে পারেন। তাহা স্পষ্টই জানা যায় যে আমাদের "ভাষ্যগড়া"র কাজ এখনও শেষ হয় নাই। যে মতো আমরা প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি পৌরোহিত্যে তাহা কতকটা সময় ও সুযোগ অর্থাৎ হইতেও তাহাতে প্রথমস্তম্ভের দক্ষগুণের অভাব আছে। মতোব যে অভিব্যক্তি ১০ মাস্ক প্রাথমিকতা তাহা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের জ্ঞানে উপায় পায় না বলিয়াই, দার্শনিক ইহার সমাধানে অতিশয় কষ্টের বাধা জন। সাধারণ মানুষের দার্শনিক মনো প্রবেশ হইবে যে সাধারণতঃ দার্শনিক দৈনন্দিন জীবনের ক্রীড়াস। সেই জগৎ আমাদের বিশ্বাস চরিত্র ও ব্যবহারের মনো গরমিল বা অসঙ্গত থাকিলেও তাহা নিরাবরকের জগৎ আমরা বাস্তব হইয়া পাই না। কল্পেজে কল্পিত। তাহা প্রাথমিক সত্যকে প্রাথমিক করিয়া যখন গুণে প্রাথমিক করি তখন আর চোরে প্রাথমিক বৃত্তির

সম্মুখে ভাসমান হইয়াছে, ইহা এইভাবে ঠিক এই ভাবনাই কর্তৃক মান পাঠকের মস্তিষ্কে ইত্যাকে প্রত্যক্ষ করি অর্থাৎ করি। আমরা যদি আজ একত্রীকৃত হইয়া তাহাদের সম্মুখে কোন চিত্তবিশিষ্ট না করিতাম তথাপি এই বস্তুগুলির বাস্তবতার কোনই পরিবর্তন হইত না ; ইহারা আমাদের বিরুদ্ধে একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসও ত্যাগ করিবারও প্রয়োজন বোধ করিত না। এটা যেন আমাদের প্রকৃত্তিক বিশ্বাস। একটা অক্ষুণ্ণত্বের মধ্যে ত্রিভুজ হইলে, তাহা যে সমকোণ হয়, ইহা শিখা কর্তৃক প্রমাণিত হয় আমাদের স্কুলে যাইবার দরকার হইতে পারে, কিন্তু এই প্রকার বিশ্বাস বা জ্ঞানের ক্ষুদ্র শিক্ষক মহাশয়ের রক্তচক্ষু দেখিবার কিংবা বৈজ্ঞানিক সহ্য করিবার দরকার মোটেই হয় না। শিক্ষিত অশিক্ষিত, হিন্দু মুসলমান, ভারতবাসী—ইংলণ্ডবাসী—সকলেই এই মতো এই সহজ সত্যগুলি যেন মজ্জা-হইয়া পড়িয়াছে। যদি কেহ বলেন, এই দৃষ্টমান জগত মিথ্যা, কিংবা এ বিশাল বিশ্ব তোমারই দর্শন সাপেক্ষ, তোমার মন ব্যতীত উহার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই, তাহা হইলে আমরা যদিও প্রকাশ্যভাবে কিছুই না বলি, তথাপি অন্তরাত্মা যেন এই অদৃশ্য তথ্যের বিরুদ্ধে বিরোধ ঘোষণা করিতে থাকে। আমরা মনে মনে চিন্তা করি, ইনি হয় পাগল, হয় দার্শনিক। আবার অল্প কতকগুলি বিশ্বাস আছে যাহা মানুষের ধর্মমত রক্তে রক্তে এতদভাবে মিশাইয়া যায় যে যখন আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে অদ্বৈত দার্শনিক শক্তি আছে, এবং বুদ্ধিজীবীর অদ্বৈতবুদ্ধি নাই। আমাদের এই স্বাভাবিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যদি কেহ বলেন যে ঐন্দ্রজালিক বিজ্ঞান

প্রভাবে আমাদের শক্তি নষ্ট হইতে পারে, কিংবা যদি কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে বুদ্ধির জীবন ও মানব জীবনের মস্তিষ্কই সর্বত্র, ও জ্ঞান-স্বরূপ পূর্ণ, তাহা হইলে আমাদের মন পূর্ণের জ্ঞান বিদোহ তার ধারণ করে না। তেমনি আবার যদি কোন বৈদান্তিক ঘোষণা করেন যে, জীবাশ্ম ও পরমাণু এক, বিশ্বের স্বরূপ এক নিরাকার অনাদ্যমূল্যসোপাচার অদ্বৈত চিন্ময় আত্মাকে চিন্তা করিতে পারি না তুমি আকা-বিশিষ্ট কনিয়া-ফেল ; কিংবা যদি কোন সাধারণ দার্শনিক বলেন যে, তুমি যে দর্শনজিহ্বের প্রমাণ শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া ঐ সম্মুখস্থ পদার্থটিকে টেবিল বলিয়া জানিতেছ, এবং ঐ বস্তুটিকে আমফল বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছ, তোমার সেই উজ্জ্বল বিশ্বাসঘাতক। তোমার নয়ন উইটা রূপের স্বাক্ষরীমাত্র, সেই জগৎ ঐ টেবিলের চিবটিতে বাস্তব টেবিল বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে, এবং ঐ আমফলের রূপ ও আকার বিশিষ্ট মূপিওটাকে সত্য সত্যই আমফল বলিয়া প্রস্তারণা করিতেছে! এই সকল উজ্জ্বল জ্ঞান এবার আমরা আর পূর্ণের জ্ঞান পাগলের পার্শ্ববর্তী স্থানটা দার্শনিকের জ্ঞান নির্ধারিত না করিতেও পারি। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীতমান হয় যে, আমরা যে সকল বিশ্বাস ও জ্ঞান যাইয়া সাধারণতঃ জীবনের পথে চলা-ফেরা করি, তাহাদের সকলগুলিই যে কতদিন হাঁচেন মতো পড়িয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে তাহা নয়। কতকগুলি বাস্তবিকই এখনই শক্ত হইয়া পড়িয়াছে, যে, তাহাদের আকার পরিবর্তন করিতে গেলে তাহারা একেবারেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এখন দেখা যাক যে এই বিশ্বাসগুলির কতটুকু

রা হর কেন, আর তাহার বিধান একবার একটা
মূর্তি লইয়া একটিও ধ্বংস—আবার পর ঐ প্রাক-
ৃতিক আকারের পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন
হইবে। এই কৃষ্টি ও পরিবর্তনের আদি কারণ
লগ্না। যার কেবলমাত্র জীবনের শাসনের
মধ্যে। আমরা যে জগতে বাস কবি তাহাকে
একেবারেই অপরিচিত বা অজ্ঞাত রাখিলে
সে স্থানে মূর্তির জন্মও বাঁচিয়া থাকিতে
পারিতাম না। পাণ্ডবেরা এক বৎসরের কষ্ট
অজ্ঞাতবাস করিতে পারিয়াছিলেন তাহার
কারণ এই যে বিরাট রাজার রাজ্যে তাহার
অজ্ঞাত ও অপরিচিত হইলেও সে রাজ্যটি
তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিল
না। যদি বাস্তবিকই বিরাট রাজ্যের সকল
বস্তুই রহস্য কুহেলিকার আচ্ছন্ন থাকিত, যদি
সেখানকার স্বচ্ছনীবে শরীরের ক্রান্তি দূর না
করিয়া অবসাদ বন্ধ করিত, যদি আহাের
শব্দের অন্তরালে চতুর্দিকের স্রোতায়ি হ্রস্ব
করিয়া জলিয়া উঠিত এবং জলপানের সঙ্গে
সঙ্গে পিপাসার শুষ্কতা নীরসত্ব হইয়া থাকিত,
আর যদি ভীমে পদা সে রাজ্যে প্রবেশ
করিয়াই নিত প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া শোলা
প্রকৃতি অবলম্বন করিত, তাহা হইলে কীচক
বধ ত দূরের কথা, পাণ্ডবগণ এই অদ্বিত রাজ্যের
মধ্যে অগণ্যালের জন্মও বিশ্রাম করিতে পারি-
স্তেন না। জীবনের শাসন এমনই চর্লকা,
এমনই কঠিন। যে সকল বস্তু সমূহ আমা-
দিগকে চতুর্দিকে বেঁটন করিয়া সহিয়াছে,
তাঁহাদের সহিত যদি আমরা অপরিচিত
হইতে না পারিতাম, যদি ঐ উদ্ভাদের প্রকৃতি
সবকে আমরা কোন প্রকার ভবিষ্যৎ দাবি
করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের

ত সন্তান। পশ্চিমই যে পশ্চিম যেটুকু
জানালোক না থাকিলে, আমরা জীবন
পথের অন্ধকার দূর হইয়া, সেই সাধারণ
জ্ঞানের অভাবে এই অগণ্যে বাঁচিয়া থাক
অসম্ভব হইত। এই যে জগতের স্রষ্টা দূর
হাপন ইহার ধারা যদি আমরা একটু চিন্তা
করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখা যায় যে
পরিচয় একদিনে হয় না। অলাউকীনের
প্রদীপের নিকট মুহুর্তের মধ্যে বিশাল অ-
লিকা প্রস্তুত সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু বাস্তব
জগতের জ্ঞানমন্দির প্রভাবে রচিত হইতে পারে
না। জ্ঞানের বিকাশ হয় ক্রমে ক্রমে, এবং
ইহার সকলতা আসে গহ নিষ্কলতার মধ্যে
দিয়া। ক্রম শিশু যখন জাহার অট্টালিকাটির
রচনা করে, তখন তাহাকে কতবারই গড়ান
জিমিষ তাঙ্গিরা ফেলিতে হয়, কতই আশা—
নিরাশার ব্যতীত তাহাকে সজ্ঞ করিতে
হয়। জগতটা যেন তাহার নিকট একটা
প্রকাণ্ড হেঁয়ালি, এটা যেন কোন এক বাচ্-
করের চরিত্র সম্বোধন মস্তের দ্বারা প্রস্তুত বাচ্-
কর। তাহার সরল বিশ্বাস এখানকার কুহক
ভেদ করিতে একেবারেই অক্ষম। একটা বস্তু
তখনই তাহার সমুখে আসিয়া উপস্থিত হয়,
আবার পরকণেই কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।
হাত পাঙালি যেন নিজের শাসনের বাইরে,
তাঁহার। নড়িয়া চড়িয়া কখনও তাঁহার চপ্তি
সাধন করে, আবার কখনও অসহ্য ব্যপার স্থাপি
করে। কোন সময় খুঁচার চোখ তাহাকে
না করিতেই তাহার পরিভূতি, আবার কখনও
গরিব আহারের কই না ফরাইকেই পুনঃ
আহার। এমন জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত কি
এক অত্যাশীর্ষ কটিলতার পূর্ণ। এক মুহূর্ত

কর্তৃক এক কথাইবের নতুনকার করা হইয়া
 বিলাক শান্তিপ্রদানের ব্যতী। কথার
 পরিজ্ঞা ও মাহুয়ের নিম্ন হুজুরি কর্তৃ
 হাতিব, এই হইবার মত কোন অসামঞ্জস্য
 নাই কিনা, আর যদি থাকে তাহা হইলে
 এই বিরোধের কোনপ্রকার প্রতিকার হইতে
 পারে কি না, ইহা চিন্তা করিয়া না দেখিলেও
 জীবন নির্বাহের কোন বিঘ্ন হয় না। তাৎপা-
 ত্যের দ্বারা অসামঞ্জস্য যদি অপর্যাপ্ত
 পটুত্ব হয়, তাহা হইলে এই দুই ব্যক্তির
 মধ্যে যে সঙ্কট তাহার স্বরূপ নির্ণয় না
 করিলেও বাস্তবজীবনে কিছু ব্যয় আসে না।
 একটি লোক আশ্রিত এর নেশায় বা জ্বরের
 বিকারে যে সকল ভিনিস স্পষ্ট দেখিতে পায়
 তাহা সাধারণতঃ নরম পোচের হয় না।
 বলিয়াই একটিকে প্রত্যক্ষান ও অপরটিকে
 ভ্রম বলা হয় কেন? এবিধে গবেষণা না
 করিলেও আমাদের আচার বিহাবর কেনই
 প্রতী হয় না! সেইরূপ আবার সরকার
 বাহাইবের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন প্রায়সঙ্গত
 কিনা, এবিধে আমাদের মতভেদ থাকিতে
 পারে; সে বস্তুর আবার নিকট সৌন্দর্যের
 আকর্ষণ, নিকট নরমে তাহা কংসিং হইতে
 পারে; একজন ব্যক্তিকে পাপ বলিয়া
 পরিহার করেন, অন্য একজন তাহাকে অসম-
 কর্তব্য বলিয়া বরণ করিতেও পারেন। এই
 সকল দুই হইতে বুঝিতে পারা যায় যে
 আমরা একই বিশ্বাস, অন্য একটীর সঙ্গে
 সাধারণতঃ সংঘর্ষ উপস্থিত করে, এবং
 আমাদের বিচারে আমার মতভেদ সহিত অনৈক্য
 আছে। কিন্তু এই বিরোধ ও অনৈক্য থাক-
 সাতেই যেমননি জীবন কোন হানি হয় না।

আবার অন্য এক দিকের দৃষ্টি কেহ আমার
 যেমনসকল আশ্রিত যেম তাহাতে বিশেষ কিছু
 ব্যয় আসে না, কিন্তু "একটু পানীয়
 দেব" দিলে যদি কেহ মত আশ্রিত উপস্থিত
 করেন, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে যে পার্থক্য
 সেটা তখন হানিকর হইয়া উঠে। যে আনের
 মধ্যে এতখানি অসম্পূর্ণতা, তাহাকে লইয়া আর
 জীবনের কাজ চলিতে পারে না। সেই প্রকার
 মতকণ একটি অসামঞ্জস্য বা একটি সমস্যার
 সমাধান না করিলেও সাধারণ জীবনের কোন
 হানি হয় না, ততকণ আমরা আর মিথ্যা
 মাথা ঘামাইবার ইচ্ছা করি না। কিন্তু যিনি
 দার্শনিক তাহার নিকট এই স্বপ্ন ও বিরোধ
 বড়ই অপ্রীতিকর। সাধারণতঃ আমাদের
 বহির্জগতের স্বপ্ন যেমন অশাস্তিকর, তাহার
 পক্ষে অন্তর্জগতের বিরোধও তেমনি অসহনীয়।
 সলিল যদি প্রতি মুহূর্তেই মিথের প্রকৃতি পরি-
 ভ্রাণ করিয়া কখনও বা অনিলের এবং কখনও
 বা অনিলের ধর্মকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে
 যেমন আমাদের জীবন দুর্বিসহ হয়, তেমনি
 জ্ঞান ও বিধাসমাজে মতকণ বিরোধের লক্ষণ
 থাকে, ততকণ দার্শনিকের জীবনও কেবল
 অশাস্তিকর ও যন্ত্রণাময়কই থাকে। বিরোধ ও
 বহুত্বের করালমূর্তি তাহার প্রাণে সর্বদাই
 জীবিত সঞ্চার করিতে থাকে, তাই তিনি বহু
 ইচ্ছার বহু তাবা ও নানালোকের নানাকণ্ঠার
 গভীরে অভিক্রম করিয়া সেই এক সনাতন
 সত্যের দ্বারে পৌছিবার জন্য ব্যস্ত হন যেখানে
 বিরোধের কোলাহল, ও বহুত্বের জীর্ণমূর্তি
 পৌছিতে অক্ষম, সেখানে কেবলই অবিচ্ছিন্ন
 শান্তির দ্বারা আবৃত হইয়া তাহার প্রাণে কি
 এক অসামান্য স্বপ্নের দ্বারা সিকন করে।

দার্শনিকের এই আদর্শতাই একথা বলি যে, এই ইহার যৌবনকালিক চিন্তাশৈলীতে কঠোর ভাবাবেগে কল্পনার মননে ঘেঁষে পাইবাই তিনি পাণ্ডুর হইয়া পড়েন। এইটাই তাঁহার আদর্শ পাপপাদি। সেইজন্য ততক্ষণ অন্তরের সকল তারগুলি মিলিত হইয়া একটি মিলিত বন্ধীর না ভোগে, ততক্ষণ তিনি কেবলই তান-পুরার কাণে উপভোগ্য থাকেন, এবং অনেকের পক্ষেই সেটা আসে। আনন্দদায়ক হয় না। ঐ আদর্শ বন্ধীর তুলিতে গিয়া কতকগুলি তরী ছিড়িয়া যায়—আর কতকগুলি সাধারণ কানে বেহুগো বাজে, তাই তাঁহার সাধারণ বস্তু পাণ্ডুর অসম্বন্ধ প্রসঙ্গ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এইবার আদর্শ দর্শন ও দার্শনিকের লক্ষণ—এক কথায় এই বলিতে পারি যে, দার্শনিক চিন্তা এবং অধিতীর দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সমস্তের উপাসনা, আর যিনি ঐ আদর্শের সার্থকতার জন্য জীবনের সমগ্রদক্ষিণে সমস্তই পরিচালনা করিতে কুণ্ঠিত হন না, তিনিই দার্শনিক।

এই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া পশ্চিমের চিন্তা স্রোত কোন পথ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার বহন আমরা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করি, তখন মনে হয় যেন বাস্তবিকই একটি কুদ্র স্রোতস্রোতী পাশ্চাত্য দেশের একটি প্রান্ত হইতে আদ্যপ্রকাশ করিয়া এই প্রায় আড়াই হাজার বৎসর ব্যাপ্ত ব্রহ্মা ব্রহ্মা সমস্ত বিশ্বের মধ্যে এমনই ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে যে, এখন আর সে কোন দেশ বা দেশের দ্বারা সীমিত নহে। সীমার কথা সীমাবদ্ধ থাকিতে চকেন। এই ইহার আদর্শতাই, বলা যায় যে, এই

কল্পনাত্মক আদর্শ—এই ইহার এই বিশ্ব বিশ্বত্বের একমাত্র কারণ, অতএবই করিলে অসম্ভব হয় যে, জীবের মূল বাহুরেব জীবের মধ্যেই নিখিল আছে। ইহার আদর্শ আদর্শতাই আদর্শকরে অনন্ত শাখা-প্রশাখাতে বিভক্ত হইয়া এখন সে ভক্তরের নিখিল প্রেরণাকে স্পর্শ করিতেছে, এবং অনন্ত নিখিল অনন্ত বীজকে অকুরিত করিতেছে বলিয়াই মানুষের উপর তাহার এক আধিপত্য। এই অনন্তমুখী প্রবাহ কোন এক অপূর্ণ বস্তুর জায় তাহার অনন্ত অঙ্গুলি ধরাই যেন বিশ্ববীশার সমস্ত তারগুলিকে স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছে এবং অনন্তের অনন্ত তরীতে স্পন্দন তুলিয়া দিয়া মানুষকে একটামাত্র রাগিণীর আলাপ করিতে আহ্বান করিতেছে। এই কর্তব্যের উদ্দেশ্যেই বসিতে পারিয়া অনেকই ভ্রমমোহিত হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু ইহার অন্তরকে ইহা নিজের সানন্দে নাচাইয়া তুলিয়াছে, তাহার পক্ষে নিশ্চিন্ত থাক অসম্ভব; তিনিই প্রকৃত দার্শনিক।

পূর্বে আমরা এইরূপ শত বৎসর পূর্বে যখন ইকানতি থেলিস () বাবহারি জীবনের দাম্য শৃঙ্খল হইতে জানকে মুক্ত করিতে প্রয়াস করিয়াছিলাম, তখন তাঁহার চিন্তাস্রোত একটি মাত্র খাতা লইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। তখনই পরিবর্তনশীলতা দেখিয়া তাঁহার মনে খটকা বাধিল, তিনি নিজেকে প্রশ্ন করিলেন, এই নিরন্তর পরিবর্তনশীল লগ-ফের মধ্যে কোন বস্তুটা শাশ্বত থাকে? পাশ্চাত্য দেশে এই প্রশ্ন বহু মতো একের অবকাশ, এবং নব্বয়ের মধ্যে কবিরাজকে জানিয়াই দার্শনিক প্রয়াস আরম্ভ হইল। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া এই দার্শ-

মিষ্ট বস্তু কষ্টে বলিলেন, এবং তাহার কারণ এই যে, এ উল্লিখিত প্রেরণের মধ্য দিয়া আর একটি প্রেরণ উদ্ভূত হইতে লাগিল এবং এই দার্শনিক মানবজাতির প্রেরণের বৃত্ত অপরিচিত প্রদেশে অবস্থিত হইতে লাগিল। পরিবর্তনের মাঝে যেটা নিত্য থাকে, তাহার স্বরূপ কি? এই নিত্য বস্তু হইতে অনিত্য বস্তুর সৃষ্টি হয় কিমন কথিয়া? এ নিত্য বস্তুর মধ্যে সাধারণ স্থান আছে কি না? কোন পথ দিয়া এই বস্তুর সমীপে উপস্থিত হইতে পারা যায়? এই প্রকারে একটি দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য ভাবের পড়িয়া প্রাচীন অস্বনির্ভিত বহুধর্মকে প্রকাশ করিতে লাগিল, আর এই বর্ষ বিশেষের মধ্য দিয়া মানুষের আত্মজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতে লাগিল। এইটাই দর্শনশাস্ত্রের সমগ্রতা ও যাকব্বের বিশিষ্টতা। যখন একটি সমগ্র হইতে অল্প একটীক সৃষ্টি হয়, এবং তাহাদের সমাধান করিতে গিয়া দার্শনিক মত বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন এই বিভাগের প্রকৃত কারণ-মানুষের ধর্মমতগুলি কিংবা শিক্ষা-বৈচিত্র্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। এখানে প্রেরণের মধ্য দিয়া মানুষ নিজেকে চিনিতে শেখে, এবং নতুন জ্ঞানের কঠি তখনই হয় যখন তাহার অন্তরে বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন প্রকারের দাবী আনিয়া উপস্থিত করে। এখান কতকটা আন্তর্জাতিক যুদ্ধের মত। তার বৃদ্ধি যে আদর্শকে উপাসনা করে, তার স্বরূপ সে আদর্শকে অর্থাৎ হিতে চায় না, তার অবস্থাতা তাহাকে এর বলিয়া বরণ করেনা। জ্ঞান একের মধ্যে নিজের পার্থক্যতা খুঁজিয়া তোলা, কিন্তু তজ্জি হই না হইলে চরিতার্থ হইতে পারেনা। বুদ্ধি ধোঁয়া করে যে,

বহু ভাবনাই কৃতার্থ হইতে পারে যখন সে "আপনার" বলিয়া কিছুই রাখে না। সে যখন তার আরাধ্যদেবের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করিয়া দিতে পারে, যখন তাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য আর থাকে না— তখনই সাধারণ চরম উৎকর্ষ। কিন্তু তজ্জি বলে যে একের সমগ্র মনপ্রাণ অত্যাশ্রিত মবেদন করিয়াও এই আত্মনিবেদনের আনন্দটুকুও অমৃতত্ব করিবার জন্য ভুটাইব মধ্যে অন্ততঃ একটি মনঃপঙ্কেত রাখা না লাগিলে চলে না। এই ভাবে অস্ত্রের বিভিন্ন সিকের বিভিন্ন প্রয়োচনায় যখন অস্ত্রের ধর্ম হইয়া পড়ে তখনই দর্শনশাস্ত্রও বিভক্ত হইয়া যায়। যখন গ্রীস ও রোম-দেশের সিক কেবল জ্ঞানের আদর্শকে সমুদ্রে রাখিয়া সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়া পড়িতে লাগিল, তখন তার প্রোতধ্বনিতে অস্ত্রের আর একটি প্রদেশ মুখবিত্ত হইয়া উঠিল। এই নূতন প্রদেশের নূতন কাহিনীর অভিব্যক্তি হইল, খ্রীষ্টান ধর্মের যাকব্বের মধ্যে। এইবার অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রের তুলন বৃদ্ধি বাড়িয়া গেল। কেহ বলিলেন যে কেবল জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির দ্বারা সত্যকে দূর অসম্ভব, কারণ যে মনুষ্য নিজ হৃদয়ের ফলে অসীম হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার বুদ্ধি ও চিন্তা সমীমের স্পর্শে বিকারগ্রস্ত, সুতরাং সত্যের বাস্তব পৌছিতে তখন তার পক্ষে চাই বিশ্বাস, চাই প্রভা। আবার কেহ বলিলেন যে জ্ঞানের আলো না থাকিলে অন্ধবিশ্বের তরঙ্গ দূর হইতে পারেনা, সুতরাং জ্ঞান ও চিন্তাকে দূর দিলে সত্যকে ধরিতে পারা এতদামাই

অসম্ভব। যখন পশ্চিম গগন এই যুদ্ধপ্রসূত
ধূলিকণায় ঢাউয়, আনিতে ছিলা, যখন এক
অস্ত্রের বিরোধের ফলে বাহুজগতে জানক
জানে রক্তপাত হইতে লাগিল, তখন কতক-
গুলি ধর্মযাজক প্রমান করিয়া দেখাইতে
লাগিলেন যে এই আন্তর্ধাতিক যুদ্ধের যে
ভিত্তি তাহা আমাদের অপোলকল্পিত মায়া।
যে যুদ্ধকে বিশ্বাস ও শঙ্কা দ্বারা
পাইতে চেষ্টা করেন, জ্ঞানী সেই যুদ্ধকেই
চেষ্টা ও তর্কবিতর্কদ্বারা পরিবার চেষ্টা করেন।
সুতরাং যে সত্য যেটো, অ্যারিস্টটল প্রভৃতি
চিন্তাবিরগণে চিন্তাদর্শনে প্রতিবক্ষিত হইয়া-
ছিল গীটানন্দস্বরূপ ঠিক সেই চিন্তার উপরেই
দাঁড়িয়া আছে। ইউরোপের মধ্যযুগের
দার্শনিকগণ অস্ত্রের এই বিরোধ মিটাইতেই
বাস্তব পার্থক্য। তখনই আবার ইঞ্জিয় ও
অধ্যবসায় বিচার ফলে দর্শনশাস্ত্রের
সমস্তাগুলি জটিলতর হইয়া পড়ে। যে চিন্তায়
আমর, স্পষ্টরূপে ইঞ্জিয় সমস্ত দ্বারা জানিতে
পারি, তাহাকে কামরা হস্তদ্বারা স্পর্শ করি,
নয়ন দ্বারা দর্শন করি তাহাকেই সাধারণতঃ
সত্য বস্তু বলিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়গত জ্ঞান
ব্যতীত আর যে কোনপ্রকার নিশ্চিন্তাযুক্ত
জ্ঞান হইতে পারে, এবং ঐশ্বরিকরাজ্য ব্যতীত
অন্য কোথাও যে সংলগ্নতা হইতে পারে,
তাহা আমরা বিশ্বাস করিতেই পারি না।
সেই জন্য ইঞ্জিয়দোষণ করে “আমার সীমানা
অতিক্রম করিলেই মানুষের চিন্তা কেবল
আকাশকুসুম ও কবির কল্পনা মাত্র। অস্ত্রের
এই ইন্দ্রিয়মুখী মাঝির প্রতিনিধিকে পান্চাত্য
জগতে বৈজ্ঞানিক আখ্যা দেয়। বৈজ্ঞানিক
বলেন যে চিন্তাকে অপটুতা ও সন্দেহ

কোয়ামা হইতে মুক্ত করিতে পারে, একমাত্র
ইঞ্জিয়ের দ্বারা। তাহার নিকট ইঞ্জিয়াতীত
বস্তু তাহাই বাহ্য ইঞ্জিয় এখনও প্রকাশ
করিতে পারে নাই, কিন্তু ভিত্তি বলিয়া এমন
কোন সত্য তিনি স্বীকার করিতে পারেন
না—যাহা ইঞ্জিয়ের নিকট ধরা পড়ে না।
সেইজন্য যখন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের শক্তিতে
কত শত অজানা বস্তু ইঞ্জিয়ের কাছে প্রকাশ
হইয়া পড়িল, তখন বৈজ্ঞানিক এই নতুন
আবিষ্কারের উদ্গাদনার চাহিদা করিয়া বলিয়া
উঠিলেন—আমি সমস্ত আকাশ তবদীক্ষণ দিয়া
তম জ্ঞান করিয়াছি, কিন্তু দেখিলাম, কিছু
কোথাও স্বয়ং নামে কোন বস্তুকে দেখিতে
পাইলাম না। অতএব স্বয়ং মস্তিষ্কের কল্পনার
রাজ্য ব্যতীত অন্য কোন দার্শনিক পাবে
না। কিয়ৎ দীর্ঘায় জাহ্নবীর প্রদেশ ও
সমুদ্রের আশ্রকে টাল্লির উপর স্থান দেন,
তাহারা এই প্রাকৃতিক জগৎ হাড় মাংস
একটা ইঞ্জিয়াতীত জগতের সহ্য মানিতে পারা
হইল। তাহারা বলেন যে, ইঞ্জিয় কোন বাহ্যিক
আচরণ মাত্র হইয়া থাকে, ইঞ্জিয়ের বহুভাষাকে
অতিক্রম করিয়া সনাতন সত্যকে ধ্বংসে হইলে,
চাই আর একটা শক্তি। রূপ, রস, গন্ধ
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত জ্ঞানরূপ বস্তুর জ্ঞান যেমন,
কারণ একগুলি বহু কিছু বস্তু এক। তেমন
আবার ইঞ্জিয় আমাদের যে জ্ঞান দেয়, তাহাকে
বিরোধের বিনাশ হইল, সেই জন্য এক বস্তু-
গত উদ্ভাপকে নানা বোকে নানা ভাবে জন্ম-
দেব করে। সুতরাং বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের
সম্বন্ধ পরিচয় কেবলমাত্র ইঞ্জিয় দ্বারা হইতে
পারে না। যে সকল বস্তুকে আমরা সাধারণতঃ
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনে করি, তাহারিণে এবং পরি-

উপস্থাপিত হইল। একটা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু
সম্মানিত হয়; আর ঐ ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু
না মানিলে, বৈজ্ঞানিক যে আরম্ভকে এই
প্রাথমিক প্রকৃত অন্বেষণ করিতেছেন সে
আরম্ভ উদ্ভাবকে অনুপ্রাণিতই করিতে পারিত
না। সুতরাং এই ইন্দ্রিয় প্রকৃত অগত ব্যতীত
আর একটা রাজ্য আছে, যেখানে চাইতে অহিমে
বস্তু প্রেরণা, নীতির কঠোর শাসন, ও কর্ত-
ব্যের আধার। মানুষের যে অমৃত পিপাসা,
আবিশের চরণে আবহলিদান, নিবাসের মাঝে
শান্তিহবার আশা, এগুলি ঐ ইন্দ্রিয়াতীত
অন্তরতম অংশের প্রেরণার ফল। এই অমৃত
পাশ্চাত্য চিন্তার বিজ্ঞানের সঙ্গে পর বিজ্ঞানের
একটা চিত্রকালের বিরোধ দেখা যায়।

এই সকল অস্তরের বিরুদ্ধ প্রেরণার সমতা
ও সমাধানের দৈচিহ্ন্য ক্রমে এতই বাড়িয়া
গেল যে, একজন মানুষের পক্ষে নিখিল সমতার
আলোচনা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন জ্ঞানের
রাজ্যে একটা প্রধান বিভাজন করিবার প্রয়োজন
হইল। একটা বিজ্ঞানের রাজ্য আর একটা
দর্শনের রাজ্য। তাই এখন আর প্রত্যেক
চিন্তার প্রকারকে দার্শনিক চিন্তা বলা হয় আর
বৈজ্ঞানিকসকল বিখ্যে বহু অংশে বিভক্ত করিয়া
তাঁহাকে বহুদিক দিয়া জানিতে চেষ্টা করেন।
এই এক একটা দিককে পরিষ্কারভাবে জানিতে
গিয়া এক একটা বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। সুতরাং
একটা বিজ্ঞান দ্বারা অন্যতম দিকের একটা সত্য
দিককে জিজ্ঞাস করিতে চেষ্টা করে। এবং
এইভাবে ক্রমান্বয়ে শব্দ, পরমাণু, উদ্ভিদবিজ্ঞান
একটা সত্য বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। এই
ক্রমবিকাশের ফলে আরও নূর্য্যবর্ণিত
কিছু কিছু প্রকরণসমূহ এই বিজ্ঞানসমূহে

জিজ্ঞাসার মাঝে মাঝে একই দিকের প্রতিষ্ঠিত
বস্তুকে থাকে তাহার সব দেখাওয়া দেওয়া।
দার্শনিক কেবল বৈজ্ঞানিককে মনে করাইয়া
দেন যে, এই সকল বিশ্বাসিত জিনিস হইলে
বিশ্বটা কিন্তু এক, সুতরাং একটা বিজ্ঞানের
সত্যও অন্য একটা বিজ্ঞানের সত্যের মধ্যে
কোন অসামঞ্জস্য বা বিরোধ থাকিলে বিশ্বের
প্রকৃতি কিছুতেই জানা নাহইবে না। আবার
বৈজ্ঞানিক যে সকল সত্য আবিষ্কার করেন,
তাঁহারা কতকগুলি স্বীকৃত। সত্যের উপর নির্ভর
করিয়া থাকে; এইগুলিকে তাঁহারা চরম সত্য
বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হন। সুতরাং
বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ জিন্সা যখন সকল চরম
সত্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার তাঁহারা
বিশ্লেষণ করিবার দরকার বিবেচনা করেন না।
তখন বৈজ্ঞানিকের দিকটাই বৈজ্ঞানিক ঐ
সত্যগুলিকে লইয়া গিয়া লইয়া লইতে চেষ্টা
করেন। সুতরাং বিজ্ঞানের কক্ষবিশেষে শেষ
হয়, দর্শনের কক্ষ সেখানে আরম্ভ হয়। যেটা
হইতে একটা ফল খসিয়া পড়িল, অমনই মহা-
মতি নির্জনে নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কক্ষ
হইতে কক্ষের ইচ্ছা হইয়া গাটীতে পড়িয়া
কি? বুঝিতে বুঝিতে এদের উত্তর
আসিল এই যে, পৃথিবীর স্বাক্ষরকণ বসিয়া
একটা আকর্ষণ শক্তি আছে, তাহার প্রভাবে
অল্পসময় সবুকে সে নিজের কেন্দ্রের দিক
মুখে টানিয়া আনে। তাহা জানিয়া যখন আবার
এর বসিল, পৃথিবীর এ শক্তিই আকর্ষণ
বল নামের। তাহা বসিলের ফলে তাহা তাহা
পড়িল। সেই এই যে, যখন সকল সত্য আসিয়া
একটা নির্ভর জায়গায় উপস্থিত হয়, তখন
এই জায়গায় নির্ভর জায়গায় উপস্থিত হয়।

একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, এই শক্তির বলে
সকলসম্পদই পরস্পরকে সর্বদাই আকর্ষণ
করে। কিন্তু এই শক্তি বস্তুর দূর ও পরি-
মিতের তারতম্য অনুসারে কম বেশী হয় বলিয়া
সর্বদাই ইহা সমানভাবে প্রকাশ পায় না।
এই কারণেই বিজ্ঞানীদের দ্বারা নিউটন গ্রহ
উপগ্রহের আকাশে পর্যভ্রমণ, তাহাদের নিজ নিজ
কক্ষে অবচলিত থাকে পর্যভ্রমণ প্রভৃতি অনেক
জটিল সমস্যার উত্তর মিলেন। ক্রমে আমরা
এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ক্রিয়াটীর একটু
মনোযোগ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে
নিউটন কতকগুলি সত্যকে মানিয়া লইতে
পাঠা হইয়াছেন। এবং তাহার বস্তুবিশ্লেষণ
সকল স্থানে আসিয়া সহসা ধাক্কা গিয়াছে।
তিনি মানিয়া লইয়াছেন যে জগতের প্রত্যেক
বস্তুই একটা কারণ আছে, তাড়জগতের
সকল বস্তুই কতকগুলি সত্যের দ্বারা নিরঙ্কিত
এবং সেই সত্যগুলি আবহমান কাল হইতে
একই ভাবে জগতের কার্য করিয়া আসিতেছে
ইত্যাদি। দার্শনিকের চিত্ত কিন্তু জগৎ
সম্বন্ধে এই দুই জানিয়াই সন্তুষ্ট হয় না। তিনি
প্রশ্ন করেন—কারণ বস্তুটি কি? এই কারণ
কার্যের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আসে কোথা হইতে?
জড়ের প্রকৃত স্বরূপ কি? তাহার সঙ্গে
চৈতন্তের কি সম্বন্ধ? ইত্যাদি। যে সকল
চরম সত্যকে বিজ্ঞান বিজ্ঞের ভিত্তিরূপে
ব্যবহার করে, বাহার উপরে বিজ্ঞানের সকল
সফলতা নির্ভর করে, সেইগুলিই দর্শনের
আয়োজ্য বিষয়। আর ঐ ভিত্তি যদি দুট না হয়,
তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকের বহু শতাব্দীর সাধনা
একটা আঘাতে নিক্ষেপ হইয়া যায়। এই
নিম্নলিখিত একটা উদ্ভাস সাক্ষী আধুনিক

দর্শনশাস্ত্র। বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্বন্ধে যে
সত্যকে মানিয়া লইয়া তাহার উপর জ্যান্টি
অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কার্য জগৎ প্রত্যেক
আইনটাইই মার্ক একজন জনিতাপন
ইউক্লিডের চরম সত্যকে আর সত্য বলিতে
চান না। ইহার বলে সমস্ত জ্যান্টিশাস্ত্র
সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে।
ত্রিকোণের তিনকোণ ১৮০ ডিগ্রী বলিলে আর
চলিবে না ছইটা সমান্তরাল সরলরেখা কখনও
মিলিতে পারে না বলিলে এখন ভুল বলা
হইবে।

দার্শনিক এই সকল বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি
কেবল মাত্র মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন
কেন তাহা আমরা মোটামুটি পূর্বেই দেখি-
য়াছি। তিনি সর্বত্রই একটা আদর্শকে খুঁজিয়া
কেঁটেন। এই আদর্শটি আমাদের জীবনে সাধা-
রণ জানে, যে চুক অভিব্যক্ত হয়, বৈজ্ঞা-
নিকজগৎ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রকাশ
পায়। কিন্তু বিজ্ঞান ও জগৎ সম্পূর্ণ ভাবে
চিত্রে প্রতিকলিত করিতে পারেনা। এই আদর্শটি
জিজ্ঞাসু অস্ত্রকরণের চরমপরিভূতি। আর এই
পরিভূতি আসিতে পারে তখনই, যখন সেই
সত্যকে জানিতে পারা যায়, যাহা দেশ
কাল বা উপাসকভেদে বিভিন্ন হয় না, যাহা
সকল পরিবর্তনের মাঝে অবিনশ্বর ও বত-
তাবার মধ্যে এক থাকে। আমরা ব্যবহা-
রিকজীবনে যখন কোন একটা বস্তুকে
জানিতে বাস্তব হই, বৈজ্ঞানিক যখন সেই
বস্তুকে আরও বিশিষ্টভাবে জানিতে চেষ্টা
করেন এবং দার্শনিক যখন ঐ বস্তুকে
বুঝিতে চিন্তা বিজ্ঞানের গভীরতম অস্ত্রকরণ
করেন, তখন একই কারণ সর্বত্রই জগৎ

আমরা কেবল উহার অভিব্যক্তি করিতে করিতে বৈজ্ঞানিক এই মত্যাভিপ্রায় নীত বল
পরিবার অনুসারে সাধারণজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক যে সমস্ত সত্যসত্য কেবল কল্পকল্পি অমারি
জ্ঞানের ও দার্শনিক জ্ঞানের পরস্পর হইতে পৃথক হয়। এই প্রবন্ধ পাঠের সময় যদি সহসা
একটা বন্ধুকের আওয়াজ শুনিয়া আমরা
দর হইতে বাহির হইয়া দেখি যে অসহযোগ-
নীতি দলন করিবার জন্য একদল গোড়া
সৈন্য আমাদের দিক নীচে একদল স্বেচ্ছা-
সেবকের উপর গুলি ঢালাইবার উত্তোষ
করিতেছে, তাহা হইলে আমরা অনেকই
আত্মনিঃসৃত হইতে এই শাস্ত্রাংশসনকে
অকাটা সত্য ভাবিয়া এখান হইতে দূরে
নাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি। ইহার
কারণ এ যে বন্ধুকের গুলি ও আমাদের
প্রাণ এই দুইটির মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা
আমরা জানি। এখানে বন্ধুক হইতে গুলি
নিষ্কাশনের আওয়াজ ও বেহাগ রাগিণীর
সুরের মধ্যে কি পার্থক্য, তাহা জীবন রক্ষার
জন্য জানা দরকার। বৈজ্ঞানিক কিন্তু যখন
সম্বন্ধে এইটুকু জানিয়া তৃপ্ত হন না। তিনি
দেখেন যে, যে বন্ধুকের শব্দ এখন শোনা
গেল সেই বন্ধুক আবার যে ঘর হইতে
বাহ্য নিষ্কাশিত করা হইয়াছে সে ঘরের ভিতর
আওয়াজ করিলে তাহা বাহির হইতে শোনা
যায় না। এই প্রকার শব্দ বিবিক গড়-
মিল বা বিকৃত জ্ঞানকে অপ্রমাণিত করিতে
গিয়া তিনি বলিতে বাধ্য হন যে শব্দ বলিয়া
কোন বস্তু বহিষ্কৃত হয় না। গুলির এক-
বার স্থান অনেক মধ্যে। বাহ্যজগৎ হইতে
বাহ্যতত্ত্বের কোন পর্যন্ত অপ্রমাণিত করে,
সেই আত্মতত্ত্ব কলে মস্তিষ্কে বসিবার শব্দ
জ্ঞান উপস্থাপন করে। এই ভাবে বস্তুবিবেচনা

যে সমস্ত সত্যসত্য কেবল কল্পকল্পি অমারি
অবিনশ্বর, অকল্পনীয় ও তাহারই উপর
নৃত্য জিহ্বা আর কিছুই নয়। ইহা বহিঃক
বেশ বুদ্ধিজে পাওয়া যায় যে, আমাদের
দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ জ্ঞানের যে সকল
গড়মিল ও বিরোধ থাকে সেইগুলিকে মই
করিয়া জ্ঞানের রাজ্যে একতা স্থাপন করিতে
গিয়া বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সুতরাং
সাধারণ জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে পার্থক্য
এই যে জ্ঞানের যেটুকু একতা ও সাম্যতা
ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজন, বিজ্ঞান
সেইটুকুতে সন্তুষ্ট হন না। সে জন্য বৈজ্ঞানিক-
জ্ঞানে ঐ আদর্শতা আরও পরিকরভাবে
ফুটিয়া উঠে। দার্শনিক কিন্তু এখানেও
আদর্শজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিতে
পান না। তিনি চান অস্তরের নিখিল ধারা-
বহর আত্মাত্মিক বিনাশ, ও জিজ্ঞাস্য অন্তঃ-
করণের পূর্ণ পরিতৃপ্তি। তাই পাশ্চাত্যের
দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে দেখা যায় যে,
বৈজ্ঞানিক যখনই মস্তিষ্কের অন্তঃকরণের
একটা প্রদেশে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়া
অন্য একটা প্রদেশে অশান্তির সূচনা করি-
য়াছেন, দার্শনিক তখনই সকল বিজ্ঞানের
চরম শান্তি কেমন করিয়া হইতে পারে তাহা
নির্ণয় করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু
মস্তিষ্কের অন্তরের দাবী অনন্ত, অসীম, সুতরাং
তাহার অসন্তোষের পূর্ণ পরিতৃপ্তির একটা
আদর্শ নাই। সুতরাং কোন কোন দার্শনিক
এখন বলেন যে ঐ আদর্শকে বস্তুতঃ আমরা
বস্তুতঃ ধরিয়া না পারি, তবুও দার্শনিকের
আক্ষেপের কারণ নাই, কারণ দার্শনিক

চিন্তার মহত্ব এই আদর্শের মহত্ব ও সৌভবের
সত্তা, এবং এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত
হইতে পারিলেই দার্শনিক জীবনের চরম
সার্থকতা হইল। তাহারাই এখন ভাষ্যতর

সাধকের ভাষায় বলেন—

আমি মুক্তি চাই না হরি,
কেবল আসিব শাইব চরণ দেবিব এই
ভিক্ষা করি ॥

আমার চীন যাত্রা

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

[শ্রীকেশবদেব রায়চৌধুরী]

সকালের 'ভ্রগী' বলিয়া বিন্দুর দিবা, একটু
ইতস্ততঃ এমন ভারতে করাত সমুদ্র দিবে
উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিয়া। সরকারী
আপস, বাস্ক, পুস, সর্বত্রই পাঞ্জাবী শব্দ
প্রবল দেখিলাম। প্রত্যেক চেম্বারেতে
শিখেরাই পাহারা দিচ্ছে। এত জনের মাঝে
কথা কাহরা জ্ঞানলান, পাহারা হংকং আসি-
কারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসিয়াছে, এবং
ফ্রান্স-প্রী পুত্রও আসিয়াছে। এতাবৎ বিশেষ
সম্মানের সহিত ইংরাজ গাহাড়র ২৫০০ টাকা
হইতে আরম্ভ করিয়া, পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে
২৫০০০০, এমন কি তাহা অপেক্ষা অধিক
বেতন দিয়াও তাহাদের রাখিয়াছেন। হংকং এর
শিখ সৈন্য, ইংরাজ সরকারের একটি স্পর্ধার
সামগ্রী। এরূপ অনির্বাচিত অদীর্ঘ সন্দরকার
ও বলিষ্ঠ পুরুষদের সমাবেশে সম্পূর্ণ রেজিমেন্ট
ও পুলিশ গঠন করা সহজ সাধ্য নহে। ইহাদের
পরিচ্ছদাদিও অন্দর ও সম্মানসূচক। রাজ-
পাথর স্থানে স্থানে, ইহারা বেন এক একটি

সজীব স্রুগু শুভধরুণ শোভা পাইয়েছে।
জটিল শিখ সৈন্যের সহিত আলাপ
হল; সৈন্যকটি বলিল—“আমাদের এতাবৎ
যা একটু কল ও সম্মান দিও, চীন অভিযান
কাল স্বরূপ হইয়া আসিয়া, তাহাকে আঘাত
দিল। ইতি পূর্বে এ অঞ্চলে কোন ভারত-
সৈন্য আসে নাই,—আমরাই সর্বপ্রথম আসি-
য়াছি, এবং এই দ্রুত গতি, ও সরকার বাহা-
তেরে হুকুম পাগন বাহাদুর, সে সন্তান
ও আদর পাইয়াছি। এখন দেখিতেছি হিন্দু-
স্থান নিরস্ত হইয়াছে; আজ কি না সন্তান সন্তান
ভারত সৈন্য, হংকংকে অর্জপথে ফেলিয়া, গুরু
উত্তর চীনে ১০১২ টাকা বেতনে প্রাণ দিতে
চলিয়াছে। আর কি সরকার বাহাড়র আমা-
দের এই উচ্চ বেতন, প্রাতঃদিন বৎসরে
৩৪ শত মুদ্রা ইনাং, এবং দেশে বাইবার জু-
তিন মান্দারিয়া চুটি ও পোষা দিবা পোষা
কারকে এক গাবৎ আমাদেব, ইংরাজ সৈন্য
সহিত প্রাণ দিবে পর্য্যায়ের ও বাবদার রাখা

[illegible]

ভারত-পাহাড়টির শীর্ষ দেশে চাইিয়া দেখি
সবটাই গাভ কুরাশাক্ষর। সেখানে বড় বড়
মৌদীন, সাহেববা "নাংলো" দাঁড়ইয়া বাস
করেন, ও শীতল বায়ু সেখান করেন।
আমরা অগ্রসর পোবাক-পরা সন্ধ্যাবে বড়
ভাবনা চাইল, মাগুটা পুই ভোগ করিতে
হইবে। বাগীর উচ্চস্থানে অধিকার, তাহা
গাভিনই উক্ত থাকুন; আমি নীচ মাগুয়ার
সোদা কঁচুরা অধিকার করিতে করিতে এক

বাংলা সমাজে চাকরি হইল। তখন শুড়ি শুড়ি পড়িতেছে, জাপানী সশস্ত্র হইতেছে, তরঙ্গের উল্লসিত সুবাস—বাটে নৌকার ভিড় নাই। তুমিলান নৌকার মালিকেরা, নৌকাগুলি নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়াছে। কেবল বাহাদের শুড়ি চড়াইবার শুড়ি গুলিও সংগ্রহ কর নাই, তাহারাই পাড়ি মাঝিরা বেড়াইতেছে। এমন আশ্চর্যের অবস্থা হয়। এক শ্রেণীর কান—আমাদের বিশদকে উপায় স্বরূপ ধারণা নিজেরা বাড়িয়া উঠিতে থাকে ও ক্ষুধা লাভ করে। দোকান ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকজন এখনও আছে মাফারা এই ছাপাখানা গুলিকে প্রত্যক্ষভাবে উপায় বলিয়াই গ্রহণ করে।

যাহা শুড়ি,—নৌকার প্রত্যাহার দাঁড়াইয়া আছে, প্রতি মধ্যে প্রত্যেকটি, আনন্দের সম্ভারী মাজাজীসঙ্গী আনন্দী হইলেন। তাহারা হুৎপর হইয়া, একখানি নৌকা মালিকের সহিত নৌকা মালিকের আশ্রয় করিয়া দিলেন। যাহা তা' প্রথম নৌকা, ডাউনহীল নৌকা,—পরে চতুর্থ নৌকা চালায়। তাহাদের আনন্দিত লক্ষ্য কবিরা এবং বড় আসন্ন বুঝিয়া আনি মাঝির কথাই হুৎপার সমস্ত হইয়া, নৌকার উঠিল পড়িল। ফলস্বরূপ আনন্দ হুৎপার করিলে তাহাজে পৌঁছিতে উপায় থাকিবে না,—এদিকে বেশ ও অবসান। বুঝিলান মাজাজীসঙ্গী আমার এই কথা শ্রুতিয়া বিশেষ বিরক্ত হইলেন। আনি তাহাদের ডাকিয়া হইল।—নৌকা গুলি, এক অতিক্রম করিল ও তখন অতিক্রম করিয়া আমাদের জাহাজে ডাকিয়া দিল।

জাহাজের মাঝিরা বলিল,—

আমরা জাহাজে আসিয়া পৌঁছিতেছেন, বড়ই আনন্দ হইয়াছে। তাহাজে বেন টাইফুনের টাইফুন আমাদের পড়িয়া বাইতেছে। কিছুই বুঝিলান না। তাহাজে টাইফুন জাহাজের যেকোন দিক ও ছুঁচোলে উল্লসিত কান্দি টেকিল বা বিমিল, তাহাজেই হুৎ চুন হইয়া গেল। সাইক্লোন, টরনেডো প্রভৃতি ভয় ছিল, কিন্তু টাইফুন একটা বেন তাহাদের অপেক্ষা ওজনে প্রায় ত্রাপ ও ভীতিপ্রদ বলিয়া কোথ হইল। তবে, বন্যের বাধা জাহাজে, বন্য বলিলেই হয়। আমাদের সঙ্গে আসিয়া

প্রত্যাহার টাইফুন দেখিবার সাগর বড়ই আনন্দ। কিন্তু নিজে জলে থাকিলেও আনন্দ প্রত্যাহার সম্ভারের জন্য চক্ষু হইয়া উঠিল। এবং উপরেও ডেকে গিয়া তাহাদের প্রত্যাহার প্রত্যাহার করিতে লাগিল। বড় উল্লসিত হইয়া, বায়ু, বিজ্ঞান, তরঙ্গ, একত্রে মিলিয়া প্রবল হইতে লাগিল, ততই আনন্দ এক প্রকার পথের স্বদেশী সঙ্গীদের জন্য চিন্তাও উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। ক্রমে লক্ষ, হিমাবাদ, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইল। বড় বড় জাহাজ ও সিনার পাল গুটাইয়া, মাঝিরা নামাইল, এবং উপরে (Cannons) গুলি ফেলিয়া ফেলিল, চারিদিকে নন্দর পড়িল। রাজ্য নগরী ব্যক্তিরা গেল। হুয়ার্ড (Steward) আসিয়া বলিলেন—“আপনারা হুৎপার যাহা কন থাকেন না?” আনি তখন তাহাজে সকল কথা গুলিয়া বলিল। তিনি তিনি ভীত হইলেন, ও বলিলেন “এক এই ছাপাখানা তার নতুন লোক, অপরিচিত হান।” আনি এই বিষয় চিন্তা নাহককে রিপোর্ট করা উচিত, তিনি অনুমানের বোক পাহাড়ে পারেন

কিছু বড় আদর করলো।" এইবার আমি
বিশেষ ভিত্তি হইলাম; হ'এক মিনিট পর
আমার পায় চিহ্ন সহস্রকে রিপোর্ট করাই
কিছু করিলাম। ঠিক এই সময় সেই বড় ঘুরির
কথা সচি অভ্যকার ভেদ করিয়া একটি
আঙ্গোক আঘানের অভিক্রমে অঙ্গের হইতে
বেধিয়া উঠার্ত বলিলেন—"এটা কি আসে
কথা বাক্য।" দেখিতে দেখিতে একখানি
কুদ লক্ষ আঘানের আঘানের পাৰ্শ্বে আসিয়া
আসিল, এবং তৎক্ষণ হইতে আমার বহু
প্রতিক্রিয়া সঙ্গীরা ভিত্তি বিড়ালগুলির মত
অভি করে দি'ড়ি ও দড়ির সাহায্যে আঘানের
কোড়ক হইলেন। আমি বেন বাচিলাম,
ইয়ার্ড বলিয়া উঠিলেন Thank God
(ঈশ্বরকে ধন্যবাদ)।

বোসজা বলিলেন—"কিছু আর বলবেন
না, আপনার কথা না শুনে—প্যাজ পরজার
হই হয়েছে। খাড়া ও৪ বটা এই বড় বৃত্তিতে
কাজীনা ভিত্তি; সকল রকম চেষ্টা পেরেও
একখানি নোকে যোগাড় হ'ল না; শেষে
একজন সাহেবকে ধরে পেরে হইবী
খাইরে তারির স্থাপনিসে একখানি লক্ষ—
(হাঁড়ির বদলে হেঁচর)—পাওয়া গেল,
তাই রক্ষা। তারপর কককে হুটি গি'লি
অর্থাৎ কনুকে তিরিশটি ঢাকা, আক্ষেপ
সেলায়ী দিয়ে,—এই বজ্রি হাত বৈকুণ্ঠীক
পার হয়ে আসছি। মনে রাখবেন—পথ
পরতের আর দিকি পরলাটিও পকেটে নেই।
এখন লক্ষার বসে—গরম গরম এক কাপ
ক'রে জা ভিৎ আশ বাক্য।" ইয়ার্ড কানের
কথাটা ঠিক বুঝি বইয়াছিলেন, তিনি
সহস্র বলিলেন,—আমি একটা দিকি বই

বে,—এই অবস্থায় এক কাপ ক'রে বালসা
ক'বু"—আমি সব সঙ্গ সবসঙ্গে পান
ত'রেই হ'কটলি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি,—বার
বতটা লরকার চলে যাবেন। বলেন শু এই
সঙ্গে ডিনারও পাঠিয়ে দি।" "সেই ভাল"
বলিয়া তাঁহাকে বিদায় লিলাম,—কারণ তখন
১০টা ব্যক্তিরা গিয়াছে।

সঙ্গীদের অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিকই কষ্ট
হইতেছিল, যেন—দুবো-আসানী! সকলে
কাপড় ছাড়িলেন,—সঙ্গে সঙ্গে চাও আসিয়া
পৌছিল; জমে ডিনার,—আকেবারে জ্বলই
যজী। কখন বিকুট, কখন চপের সঙ্গে চা চশিতে
লাগিল; পাঁচুর উৎসাহে খাড়ু বো হুঁটারখান।
চপ পকেটে ফেলিল। আমি বলিলাম "বোসজা
মশাও এত কষ্ট আর ভর পাবার কারণ কি
ছিল? এ সব ত' হোটেল প্রধান দেখ,—
একটা হোটলে রাতটা কাটালেই হ'ও।"
মজুমদার ভায়া বলিলেন—"সে-পোবাকে
পাঁদাড়েও হান পেতাই না।" বুলিলাম—
পোবাকটার জন্ত পশাভাগ ও জন্মা সকলেরি
কথা সিদ্ধাছে। বোসজা বলিলেন—
সেটা ঠিক বটে কিন্তু প্রত্যাষেই আহার
যে ছেড়ে বাবে "সেটাও ত' ভুলিনি;
—চাকরী বড় চিজ,—ওটা আমাদের
"প্যানামা"—পেট আর পাওনাদার, এ
দুয়েরই ভার বহন করে। তার ওপর—এই
বীপান্তরে ছেড়ে গেলে, কি হারি হালই হ'ত।"
আমি বলিলাম—"রাজপুত্র রও ন'ক, হুরোবলির
গর্ভেও জন্মাবনি, আর এমন কোন পাপও
করেননি যাতে বীপান্তর হয়।" তিনি উত্তর
করিলেন—"ও কথা বলবেন না ফিলে যে
পাপ বহু জ'রুত করতে পারে না; এই এখন

গৃহীতকে তার মনের যত অস্বস্তি দেখায় হয়
নি।" মজুমদার—“এই ধরন—কুলী হুটে ভয়
leverage এর এক ইকি উপরে—মুড়ির কামিনো
কর নি।”—ইত্যাদি হাত কোকুরে মজলিস
জমিয়া উঠিল। মজুমদার ভাবা তখন—আবার
একাকী প্রত্যাবর্তনের পলাটা। জ্বলিতে চাহি-
লেন;—মতলবটা,—বাহাতে আরো কিছুকণ
এই আনন্দ মজলিসটা চলে। সকলে উৎ-
সাহের গতিত অনুমোদন করার অগত্যা আমি
সম্মত হইয়া ব্রূক করিলাম। ক্রমে পূর্ণ বিপনীর
বর্ণনা শেষ করিয়া, যখন তাহার বিলম্বিত হুট
অংশ সম্বন্ধে, অর্থাৎ বিক্রয়তাদের সম্বন্ধে,
আমার অভিমত ব্যক্ত করিলাম, এক মজুমদার
ভায়া ভিন্ন তাহাতে আর কাহারো সহায়ত
পাইলাম না। সকলেই এক বাক্যে বলিলেন
—“তাতে, লোখ কি, এ আপনার অন্তর
কথা,—এ সম্বন্ধে আবার মেয়ে পুরুষ কি ?—
কুল নিয়েই কথা। ধরুন—একটা মোহর,—
তা সেটা জ্বালোকের হাত থেকেই পান, আর
পুরুষের হাত হতেই পান,—মূল্য এক-ই।
বাজারে তার উত্তর বিশেষ আছে কি ?”
বলিলাম—“তাই ত’,—তোমরাও যে সে এক
ইউনিভারসিটির এম, এ, তা জানতুম না।
কিন্তু সর্ব-জন্মেও যে তোমাদের এই প্রত্যাক
সত্যটা বুঝতে পারে না—এই আশ্চর্য।”
গুলিয়া সকলে সাগ্রহে—“সে আবার কি।”
বলিয়া কথাটা গুলিবার জন্ত সঙ্গীরা
কিছু করিয়া বলিলেন।—হার একদিন

মাগা গুলিবার জন্ত সঙ্গীরা কতনা অগ্রহ
কিন্তু একজন কামিনোকে—আর
তাহাই—“অবান্তর” ঘোরে অন্যত্র হুটে
পারে তাহারা লিখিতে শকা যোগ্যকরিতা
স্বীকৃতি—কিন্তু মাগাশাটা এই—কোন
পুত্র-পুত্রের পরিবৃত্ত সবজল বাবুর ২২ বছর
বয়সে পরীক্ষারোগ হয়। সেই দিন হ’তে তিনি
বহিষ্কৃতিতেই ভরস্বর করেন তিনি সে কালের
শিক্ষিত ও নৌমিন লোক ছিলেন। পিতার কষ্ট
না হয় বা সেবার কোনরূপ আতাব না হয়—
উপযুক্ত পুত্রের সাধ্যমত তা ব্যবহার কর
আর বামপের অন্তরক বন্ধদের পরামর্শ নিয়ে—
কিন্তু চাকর ও একটি সঙ্গী বাবু নিযুক্ত
ক’রে নিশ্চিত হ’ল। কারণ—উপযুক্ত ছেলেরা
থাকতে বাপের যে বিবাহের আর আশ্রয়কই
হ’তে পারে না, অবাচি হ’লেও—সকলেই
ইসারা-কল্পিতে সবজল বাবুকে এই সহজ কথাটা
জানিয়ে দিলে। তিনিও সকলের সকল কথার
ছেটি একটি ‘হ’ ভিন্ন অন্য বিরুদ্ধি করলেন
না।

সমস্ত দিন পরে, সেই বিশেষ পরিচিত
শুটির পাটুনি মেটে, সবজল বাবু যখন কোথা
গাড়ী ক’রে বাড়ীর কটকে ঢুকলেন,—তার
নতুন প’ড়ল—তিনিটি অপরিস্রিত শুভাগোছের
খোঁটা মুক্তি। সেখান থেকে তার মুখে বিব্রক্তি তার
অস্বস্তি হুটে উঠল। তিনি মাটির পা
দিতেই, সেই ভিন্ন মুক্তি—পিতার শিরীষের
বেধিয়ে সেলাম করলে। তিনি সেদিনে

“আমার চানবাড়ী”—এখন কাহিনী পড়িয়ে পড়িয়ে ইত্যাদি বৈঠকী এবং অন্য সঙ্গী, কাজ
এ “আজি” নিজের গতিশক্তি বরদা আর—আজিও মনোনেই অন্য; অর্থাৎ—কি করে ক’রে সে
আজিও সেই হাতের দিমুলা জালিয়াই—ইত্যাদি সেই কথাই আশ্রয় করে—আজিও বরদা—আজিও

সব সময় গিয়ে বৈঠকখানার চুকলেন।
সন্ধ্যার সোঁত খানার ঘুরে বসন্ত ঘিরে দেখেন
তিন স্তম্ভি গরের মধ্যে হাকির। কিছু বলবার
আসার না দিইই একমনে ভেঙে পড়তে আসে
সে।—একমনে বাতাস আরও কঠোর হিলে,
কুড়িটি প্রাণের হৃদয় ভাঙার কলকেটি
গড়গড়ায় বসিরে বিরে ভাঙাশলার বয়ে—
“গিজিরে জুড়ি।”

সন্ধ্যা এইদিন হঠাৎ আক্রমণে, তবিন
বের নিজে বসিয়েছে। অসহায় অবস্থায় পড়ে
গেলেন; আসে সর্বদারী আসে উঠল। জিজ্ঞাসা
করলেন—“তোমরা কে?”

কে বাতাস করছিল—সে প্রাণে হুঁফিট কথা,
বার্বার চুল, গালপাটো লাড়ি—ইয়া বোহু, বর্ণ ধূসর
হাতের গুলের উপর রূপার কবজ, কোমরে
গোটি, আঙুলে আসমানি পাথর বসান রূপোর
আঘাট; গলার একছড়া প্রবালের মালা।
সে রাজবাই আঙুরকে বললে—“তজ বাতাস
কাজের নামটি আছে “মুচ কুলা” হাম সব কাম
করিয়াছে—পাঁও দাবানা, তেল লাগানা,
কাপড় কুচানা। সবজজ বাবু—আচ্ছা, বাস।
(তামাকুবারের প্রতি)—তোমার কিছু শুনি।

সে ব্যক্তি—বৈটে ভোরান, খাতো খোঁচা
খোঁচা চুল, ছাঁটা গৌফ, গোল চকু, কিটু-
কিটু কাপড়, এক কানে মাকড়ি, পদাঙ্ক
তামার তারে কড়ি, ঘুশি মুতার ইকি তিনেক
করা একটা গৌফ মলক-গলার কুলচে। সে
বলে—“একজন—আমি গুরাচরণ ডীকদারকে
কিনা পিসিয়ারে নিজেলা করিয়েছে, শান
লগিয়েছে, ইককিয়েছে—

সে কাম হাম—“মুচ কুলা” তোমার নাম?
বলে—“মুচ কুলা” “মুচ কুলা” নামে।

সবজজ—(তত্বের প্রতি) তুমিও কিছু
শোনো—

বৈটে হুঁচোলা ছাঁচের গড়ন, কম। রা
কটা চকু, দাকি লোক বজির, মুখে বসন্তের
দাগ, পরিধান হলুদে ছোবান কাপড়, একহাতে
রূপোর বালা, অপর হাতে সার গালা রূপোর
মাহলী।

ইনি হেসে বলেন—“হামরা নামটি
চমোকালাস জাজ। লামি পারিলা সাজেবের
সৌন্দর্য।”

সবজজ বাবু সবর বলেন—আচ্ছা বাস;
তোমের কে এখানে কাম করতে বলেছে?”

সকলেই বলে—“বড় বাবু বাহাল
করিয়াছে; হজুর কাম দেখকে খুশী হবেন,—
কুছড়া কোটো থাকবে না।”

সবজজ বাবু প্রথমে ভাল কথা, পরে
সন্ধ্যাে তাদের বিদের হতে বলেন; কিন্তু তারা
বাড়ী ছাড়লে না; বলে—“খুশী না করকে
যাবে না।”

কিছুক্ষণ পরে এক উড়ে বামন জবাবাবর
নিরে উপস্থিত হ’ল। সবজজ বাবু একলাসের
দড়া চুড়া বালা intact অবস্থাতেই সেহ
আগ্রাম চৌকিতে অসাড় হয়ে পড়েছিলেন।
বরে লোক ঢুকতেই, তাঁর হুঁস হ’ল,
বলেন—“কে?”

বামন হাকুর—“প্রভু মিটার লউটি,—অধিন
পকাইছে।”

সবজজ বাবু—তোমার নাম কি?
বামন হাকুর উত্তরে;

সবজজ বাবু—বেশ, সেগাজ, আচ্ছা আমি
যাব না।

“স্টোটা” ও “সুভা”

Maxwell Gray
Emile Zola
চেষ্টা Zola
কালি বাইবল
Purification

(উচ্চবাহুপ্রভৃৎ) লগ তাঁহার নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস Zola কেবল gutter মুখাই কারবার করেন। কিন্তু যিনি তাঁহার লেখা পড়িয়াছেন তিনি এখনই স্বীকার করিবেন না যে Zola হীনতীর প্রচারক। তাঁর চিত্রে কেবল দেখিতে পাই ইউরোপীয় সমাজ কি ভীষণ আয়ের-গিরির মুখের উপর গিয়া দাঁড়াইয়াছে। শক্তিমান লেখক নীনের হৃদয়ে কাথিও তইয়া প্যারী নগরীর পৃতি গন্ধনর নরকে নামিয়া জনসাধারণের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি কঠোর বস্তৃতান্ত্রিক (Realist) হিউগোর জায় ভাবতান্ত্রিক (Idealist) নহেন। সেইজন্য Jean Valjean আঁকিবার চেষ্টাও কখনও করেন নাই।

আমরা এই প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ইটালিয়ন সমালোচক Signor Edmonds de Amicis এর কথা উদ্ধৃত করিব।

Zola is one of the most moral novelists of France, and it is really astonishing how any one can doubt it. He makes us note the stench, not the perfume of Vice; his rude figures are those of the anatomical table, which inspire no immoral thought whatever; there is not one of his books, not even the crudest in the language that does not rouse in the Soul—pure, firm and immutable either repugnance or scorn for the base passion which he treats. He never says to hideous women 'infamous creatures' and 'Dear one'. Brutally, pitilessly, and without hypocrisy he exposes

vice and holds it up to ridicule, standing so far away from it himself that he does not grze a with his garments. Forced by his hand it is vice itself that shouts the injunction "Detest me and pass by." Zola কখনও পাপকে attractive (বরণীয়) করিয়া দেখান নাই। কাজেই শিক্ষিত, মাঝিতরুচি পাঠক পাঠিকাও তাঁগকে আদর করেন। কিন্তু Reynolds কখনও আদর পাইতে পারেন না কারণ তিনি কেবল মানবের কামনায় ইচ্ছনই বোঝাইয়াছেন এবং মানব সমাজের নেকিছুই ভাব নর, কেবল কালো ইচ্ছাই প্রতিপন্ন করিতে গিয়া নিজের উপরই কালি ঢালিয়াছেন। জাশা করি চিন্মিনই তাঁর পুস্তকবার্শি একটা Standing nuisance বা আবর্জনা বলিয়াই পাবগনিও হইবে। যদিও তিনি aristocrat বা বড় দলের লীলাই চিত্রিত করিয়াছেন কিন্তু তাহা সস্তা সমাজে স্থান পাইবে না।

Zola ও Reynolds-এর প্রসঙ্গ তুলান এই জন্য যে দুর্নীতি কথাটা প্রয়ো্য করিবাব সময় যেন মনে রাখি কথাটার অর্থ কি? স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন "পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপী কক্ণাব পাত্র।" কিন্তু পাপীকে (concrete) পাপ (abstract) হইতে আলাদা করিয়া দেখা বড় কঠিন। সেইজন্য আমরা অনেক সময় ভুল করি।

শাস্ত্রী মহাশয় উদাহরণ স্বরূপ 'দোঁটনা' ও 'ভভাক' উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "একজন সামান্য পটুয়ার সঙ্গে বিধবা ব্রাহ্মণীর প্রেম বা পলাশ বংশরের বৃক্ষের প্রতি ভ্রমণী পরকীরার আসক্তি, রসের সৃষ্টি না করিয়া রসাতাকেরই পরিপুষ্টি করে।"

বহুদিন। কামরুপে “নিরুজ্জিত মহাকলা”
 নামে অঙ্গসংরক্ষণ করে নাই, হিন্দু সমাজ তাহাকে
 সম্মান করিতে পারে নাই। তাঁর ছই পথ—
 প্রবৃত্তির চরম মার্গ বা নিরুজ্জিত শেখ। বেচারী
 মৃত্যুই বলিল কহিল। এমন সময় তাহারদের
 বাড়ীর প্রতিমা গড়িবার পট্টা রামুনের ছেলে
 গোবর্দ্ধন তাহাকে বাঁচাইল। সে হিন্দু বটে,
 কিন্তু বোধ হয় মৃত্যু পড়ে নাই। তাহিল,
 “নিরুজ্জিত এই লজ্জা ঢাকিবার একমাত্র আবরণ
 কি কাপো? অন্ধকার মুক্তার ববনিকা?
 হু হু শ্রী শ্রী একসঙ্গে পৃথিবীর শোভা সশ্রী
 আনন্দে ব্যক্তি হইয়া মৃত্যুর পথে চলিয়া
 যাইবে?” গোবর্দ্ধন হৈমবতীকে লজ্জা হইতে
 বাঁচাইবার জন্য তাহাকে বিবাহ করিল।
 এখানে শিক্ষিত হিন্দু বলিবেন ‘ছি, ছি, কাজটা
 ভাল হয় নাই, কোন Woman’s Refuge
 Home এ পাঠাইয়া দিলেই হইত। গোবর্দ্ধন
 বোধ হয় এ সংবাদ পায় নাই। এবং শাস্ত্রী
 মহাশয় বোধ হয় স্বীকার করিবেন না যে উপ-
 জ্ঞানস্বী গল্প করমাবসী হয়। এ ত আর ভীষ-
 নাগের সন্দেহ নয়। এ বিষয়ে শ্রদ্ধের শ্রী প্রমথ
 চৌধুরী লিখিত ‘করমাবসী গল্প’ পড়িলে ‘জ্ঞান-
 জন শলাকরা’ আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হইতে
 পারে। হৈমবতীকে লইয়া সে সংসার পাতিল।
 এ বড় মজার সংসার। হৈমবতী তরলকে
 পূজা করে, তাহার হৈলচিত্র সাননে রাখিয়া
 ধ্যান করে, তরলের শিশু তাঁর বুকের ধন।
 গোবর্দ্ধন কাগজের পিত্তা রাখে, পাশক মাত্র, হৈম-
 বতীর দ্বারা নষ্ট, রক্তক মাত্র। একদণ্ড সমস্ত
 আর কোন উপভোগ্য বোধ নাই এবং এমন
 কষ্টের সমাধানও দেখি নাই। বড় বড় বণি-
 কদের সমস্ত ইহার কাছে নাই।

গোবর্দ্ধনের অন্তরে বীরে বীরে প্রজ্ঞা ও
 কল্পনা প্রেমে পরিণত হইল। কিন্তু এই
 ক্ষণতে Platonic Love ছলিত বস্তু। দাতার
 মাতুল হাওয়া হইলে আর মাতুল থাকে না,
 বোধ হয় ভূত হয়। গোবর্দ্ধন ‘দোটার্নার’
 পড়িল—দেবীর সামনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে
 হৈমবতীকে বিবাহ করিলেও তাহার সঙ্গে
 কোন দৈহিক সম্বন্ধ রাখিবে না। অশুচ, প্রাণ
 তাঁর ক্ষতবিক্ষত, প্ররুতি প্রবলা। কেবল সংযম
 তাহাকে প্রবৃত্তি মার্গ হইতে রক্ষা করিতে
 লাগিল। চট্রাং তরলের আকর্ষণ। এবার
 তরল প্রকৃত তরলরূপেই দেখা দিল। হৈম-
 বতীর একমুখী প্রেমে আঘাত লাগিল, কল্প-
 নাকের দেবতা আজ পশুরূপে দেখা দিল—এত
 বস্তুর প্রেম ধূলিসাৎ হইল। হৈমবতী বৃষ্টি
 তরলের সহিত তুলনার গোবর্দ্ধন দেবতা; এই
 খানে হৈমবতী দোটার্নার পড়িল—এ যে সত্যই
 ‘দোলাচল চিত্তবৃত্তি,’ হৈমবতী আশ্রয়কার এবং
 মাত্র উপায় আশ্রয়তার দ্বারা এ সমস্তার সমা-
 ধান করিল।

চাকবাবু Robert Browning-এর একটা
 লাইন উদ্ধৃত করিয়াছেন, “How mad, how
 sad, how bad it was”—গোবর্দ্ধন mad
 হৈমবতী sad আর তরল bad; সমাজের চোখে
 গোবর্দ্ধন যে পাগল তাহাতে আর সন্দেহ আছে?
 দ্বীচিও এমনি পাগল ছিলেন, নহিলে পরো-
 পকারে জীবন দেন, Christ ও পাগল, নহিলে
 ক্রুশে তাঁর অপমৃত্যু ঘটত না।

বংশলোচন তাত্ত্বিক, তবে সমাজকার
 ব্যক্তি। মা তাঁকে সব ফাংশন দিয়াছেন,
 কিন্তু মাতের বেত্তা হইলেন তিনি মরা
 বলিয়াই এখন পরিচিতি। এ একবারে

সামাজিক জীব। তারপর যখন বিধবা কন্যা হৈম-
বতীর সহিত বিবাহ স্থগিত করিল, তিনি
তাহাকে গালি দিয়া তাড়হিয়া গেলেন, কারণ
তিনি সামাজিক জীব, সংস্কারের দাস। কিন্তু
কন্যা যখন গোবর্দ্ধনের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিল,
সমাজ তাঁহাকে বেদনা দিল, তিনি নিজেকে
নিজের মধ্যে সংহত করিলেন, তাঁর সব দুঃখ
বেদনা হাকে নিবেদন করিলেন। কিন্তু যে
দিন শুনিলেন হৈমবতীকে গোবর্দ্ধন বিবাহ
করিতেছে.....তিনি বিবাহের খোতুক
ও জগদম্বার আশীর্ব্বাদী পাঠাইয়া দিলেন।
ইহা দ্বারা “যিনি সব পাপ সহেন ও সব
অপরাধ ক্ষমা করেন সেই দেবতার নামে এই
বিবাহে সম্মতি জানাইলেন।” এখানেও সেই
Law of Nature সন্তান বাৎসল্য
Law of Divinity বা সমাজ শাসনকে
পরিত্যক্ত করিল। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় বংশ-
লোচনকে এই জন্ত পাগল বলিয়াছেন। তবে
কথাটা ঠিক—‘বামাক্ষেপা’ ও পাগল, রাম-
প্রসাদ ও পাগল। হৃৎথের বিষয় এমন পাগল
বড় বেশী দেখিতে পাই না।

সমাজবিদ্বেষী যখন শাস্ত্র আলোচনায়
ব্যাপৃত—“বৃতকুন্ত সমা নারী, তপ্তাদারো
সমঃ পূমান্”—প্রভৃতি শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত
করিতেছেন তখন বংশলোচন তাঁর সর্ব্বনাশী
মাকে সব নিবেদন করিয়া দিয়া ডাকিতেছেন—

“ন ত্যক্তো, ন মাতা, ন বন্ধুর্ন দাতা,
ন পুত্রো, ন পুত্রী, ন ভৃত্যো ন ভর্তা,
ন জায়া, ন বিজ্ঞা, ন বৃত্তিমমৈব,
গতিশ্চুঃ, গতিশ্চুঃ, যমেকা ভবানী”

বংশলোচনের জায় জগদম্বার ডাক যিনি অস্বীকৃত
করেন, তিনি হিন্দু সমাজের প্রকার পাণ্ডা।

গোবর্দ্ধন অস্বীকৃত পাঠ্য, বিপরীত, কন্যা
জগদম্বার তাহার একমাত্র সন্তান। সে
আসিরাছিল বংশলোচনের বাড়ী প্রতিদা
প্রেরারী করিতে। হৈমবতীকে রেহ ও প্রদা
চোখেই দেখিত, এবং আদর করিয়া দি
বলিয়া ডাকিত। গোবর্দ্ধনকে আড়ালে
রাখিয়া হৈমবতী ও তারলের প্রেম লজ্জার
পৌছিল। বেচারী তারলের খেতুর রস খাওয়ায়
অর্থ বৃথিতে পারে নাই। এক শুক্লচন্দ্রশী
রাত্রে হৈমবতী যখন জলে ডুবিল গোবর্দ্ধন
তাহার গাণরক্ষা করিল। হৈমবতীব লজ্জার
কাহিনী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল এবং হৈমবতীকে
সমাজে বাঁচাইতে গিয়া সমাজের ধাত্তে আত্ম-
বলিদান দিল। “হৈমবতীকে নামে মাত্র দ্রী-
বলিয়া স্বীকার করিয়া, সমাজকে পিতৃনাশে
অধিকারী করিবার জন্ত অস্বীকার করাতে”
হৈমবতী এই দীন পটুয়াকে বিবাহ করিতে
স্বীকার করিল। সে তখন বুঝিল না এই দীন
পটুয়া কতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া তাহাকে
রক্ষা করিল। হৈমবতী ‘বিধবা বৌ’ বলিয়া
পরিচিত হইল। গোবর্দ্ধন পলে পলে নিজের
জীবনকে বর্জিত করিয়া হৈমবতীর সমস্ত লজ্জা,
বেদনা ও মানি বহন করিতে লাগিল। “আশার
মানব বাঁচে কিন্তু গোবর্দ্ধনের আশা পর্য্যন্ত
ছিল না।

যেদিন হৈমবতী তারলকে পাইল গোবর্দ্ধন
বুঝিল তাহার আর কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু
তব্বল যে তাহাকে ব্যবশানে রাখিয়া তাহার
বর্জপতীর সহিত অবাধে মিশিবে হহা তাহার
পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হইল। সেদিন তাহার
আত্মমর্য্যদার আগাও লাগিল। সে তাহার
সঙ্গে ‘স্মৃতি’ খেলিয়া ঠিক করিয়া গাইল যে

চাকৰি হৰিছে হৈছে। কেনে না সে বাঢ়িয়া
জীৱন গৈব নী পুতী হৈছে গঢ়িব না।
একদিন সে হৈমবতীকে বলিল “আমি
হৈমবতীৰ বন্ধন তোমাৰে নিকটানে এসে পড়ে
ছিলোঁ, আমাৰ আপনা আগনি ম’য়ে বেতে
নাহে। হৈমবতী ব্যাকুল হৈয়া গোবৰ্দ্ধনৰ
মুখৰ দিকে মুখ তুলিয়া বলিল “আমি যে
তোমাৰ ভাল বাসি”, গোবৰ্দ্ধন পৰম স্তৰে হৈম-
বতীৰ লগাট চুখন কৰিয়া বলিল “আমি
জানি। আজ তোমাৰ মুখ দেখে এই কথা
জনোৱা—এই আমাৰ জীৱনৰ পৰম পুৰস্কাৰ,
চৰম লাভ। আমাৰ জীৱন ত সাৰ্থক হৱে
গেল। তুমি আমাৰ যখন ভালবাসো, তখন
আমাকে মিথ্যাবাদী কৰে নিজৰ জন্তু ধোৱে
নাথতে অৱিহাৰে না।” এইৰূপে হৈমবতী
গোবৰ্দ্ধনৰ মৰণ সম্বন্ধ নিবাৰণ কৰিতে গিয়া
পৰাভ হৈয়া আছিল। গোবৰ্দ্ধন প্ৰেম নদীতে
সিঁপন কৰিল, কিন্তু নীৰ ছুঁইল না। তাই বলি,
গোবৰ্দ্ধন অপূৰ্ণ নহি। ইয়াৰ মধ্যে একটা
কথা বলিয়া ৰাখি। চাকৰাব গোবৰ্দ্ধনে যে
সমস্ত স্তৰ আৰোপ কৰিয়াছেন তাহা একজন
অশিক্ষিত পটুৱাৰ পাওৱা নহা না। গোবৰ্দ্ধন
চিহ্ন true to life বৰ্ণনা হয় নাই। আট
তিয়াৰে এখানে অগনি হৈয়াছে। ইহাকেই
মৰণ কঠিনতাৰ আশংকা। গোবৰ্দ্ধনৰ back
ground একটু মানানসই হৈলে এই মোহটুকু
ফাটিয়া উঠত।

হৈমবতী মৰণে শাস্তী বস্ত্ৰাৰ লিখিয়াছেন
“মৰণেই হৈমবতীৰ সমস্ত বন্ধন সকলো বেঁধী
দলোৱা কৰিয়াছে। সেই সময় নিষ্ঠাবান
হিঁদু বিধৱা বচা কিতাপৰ দ্বাৰা প্ৰতি বন্ধ
কৰিয়াছে। এতিয়াও লেখকে

চিহ্নবৃত্তিৰ পৰিচয়

হৈমবতী ত হৈম। তিনিও জীৱন
চেষ্টা। ভাৰতৰ মানসই প্ৰতিমাৰ আশ
প্ৰতিমা। কিন্তু মানসৰ প্ৰেমৰ স্তৰ আছে,
কেহ কামেশ প্ৰেম, কেহ স্বামী প্ৰেম, কেহ বিশ্ব
প্ৰেম বিহাৰ এবং কেহ বা ভগবৎ প্ৰেম
পাপল। প্ৰেম মনুষ্যৰ উল্লেখ কৰে।
তুলসীদাস বলিয়াছেন “বিনা প্ৰেম সে না মিলে
নন্দলাল।” Hugo বলিয়াছেন “Love is the
salutation of the angles to the
stars.” এই প্ৰেম বস্তুভেদে ৰূপান্তৰিত হয়।
আমাৰ আশা কৰিতে পাৰি না পৃথিবীৰ সকলো
ভগবৎ প্ৰেম ধূলীৰ গড়াগড়ি দিব; কাৰণ
তাৰ হৈলে এ বিষয় হয় ত একটা Lunatic
asylum এ (পাগলা গাৱণে) পৰিণত হৈবে।
প্ৰতিমাৰ আৱৰ্তিৰ সময় হৈমবতী প্ৰতিমাৰ
তম্বৰ হৈতে পাৰে নাই। কাৰণ তা’ৰ প্ৰাণেৰ
দেহতা ছিল সামনে। খ্ৰীষ্টানিকাত শ্ৰীমানপূজাৰ
মন বসাইতে পাৰেন নাই—(যদিও আত্মনি ঘোষ
“ও জটীয়া কুটীলা ভাৰতে সুখী হইত”) তিনিও
জামেৰ প্ৰেমে তম্বৰ ছিলেন। তিনিও একদিন
কাদিয়াছিল—“সখি ধৰম কৰম সকলো গেল
শ্ৰীমানপূজা মোৰ হোল না।” অতএব হৈম-
বতীকে দোষ বেঙী চলে না। প্ৰকৃত প্ৰেম
ধৰ্মই হৈতেছে—চিন্তাৰ সমগ্ৰ বৃত্তিকে এক-
মুখী কৰা। এই প্ৰেমৰ মোহেই বিশ্বমন্ডল
সৰ্পে বন্ধু ভ্ৰম হয়, শত্ৰুতাৰ দ্বাৰ হৈতে
অতিথি কিৰিয়া যায়।

হৈমবতীকে গৃহভাগ্য কৰিতে হৈল নিজৰ
লজা ঢাকিবাৰ জন্তু। কিন্তু অসমীয়া পিতাকে
ফেলিয়া শলাইতে হৈমবতী কি মৰণৰ বেধনাই
পাইল। বিবাহৰ সময় নিজৰ মৌতুক

কপালবাহু, অশ্বিনী, কৈকট, বেনারীতে
পিতার দানবী, অশ্বিনী, কৈকট, বেনারীতে
লক্ষ্মীর গান, মোক্ষম, কল্যাণ দিল—সেইদিন সে
সাহস পাঠিল।

হৈমবতী গোবর্দ্ধনকে বিবাহ করিতে বাধ্য
পাইয়াছিল কিন্তু গোবর্দ্ধন যখন প্রতিমার
সামনে শপথ করিল যে বিবাহের পর তাহাদের
মধ্যে কোন দৈহিক সম্বন্ধ থাকিবে না তখন
হৈমবতী বিবাহে সম্মত হইল।

হৈমবতী সতাই তরলকে ভালবাসিয়াছিল।
সে প্রেম শুধু চোখের নহে, দেহজ হইতে পারে
কিন্তু তরলের অন্তর্দ্বারের পর তখন দেখা গীত।
নজুবা হৈমবতী তরলের ধ্যান মাত্র অবলম্বন
করিয়া ব্রহ্মচারিণী হইত না।

কিন্তু রক্ত মাংসের তরল যখন Gay
Lotharia রূপে দেখা দিল, হৈমবতী শিহরিয়া
উঠিল। ভগ্নে (Ideal) আদর্শে (Real)
বাস্তবে এতই তফাৎ! তরল বলিল “ঐ
চাষা পোতো ছোট্ট ইলাকটা সমস্তকণ বাড়ী
আগলে বসে থাকবে, এতে আশীর লাভ।—
যেন কথামালার গল্পের বোড়ার দানার বাজের
কুকুর (dog in the Manger)—নিজেও
ভোগ কোরবে না, পরকেও ভোগ কোতে
দেবে না। বাজের ধন আগলে বসে থাকবে।
এখন চোরের উপব বাট পাড়ী করা ছাড়া আর
আমাদের উপায় কি?” হৈমবতী বলিল
“তুমি চলে যাও, তুমি আমায় কখনও
আমার কাছে ফেরো না।”

হৈমবতী যখন দেখিল গোবর্দ্ধন আত্ম-
বলিদানে কৃতসম্বন্ধ, কিছুতেই তাহাকে মঙ্গল
কোলা হইবে কেন্দ্রন যায়—না, তখন সে নিঃশব্দ
হইয়া গোবর্দ্ধনকে বাচাইতে ছিন্ন করিল।

কিন্তু পক্ষের দ্বারা সৈবতী গোবর্দ্ধনের
পারে হাত বুলাইতে বুলাইতে উদ্ভাসিত কান্না
কটে চাপিয়া বলিল “তোমার কাছে ছুঁয়ে
বসাই, আমি তোমার জীবন মর্যাদা কলঙ্কিত
করিনি, তোমার মহাবীর অপমান আমি হাতে
দিইনি।” গোবর্দ্ধন সাধুরা সিবীর স্বরে বলিল
“আবার ও কথা কেন? আমি তোমার ছিন্ন
আমায় ভালবাস।”

মরণকে শিররে করিয়া মাহুৎ এমন হাসিতে
পারে ও সহজ ব্যবহার করিতে পারে ইহা
ভাবিয়া হৈমবতী বত আশ্চর্য্য হইতেছিল, তখন
তার ভক্তিও উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল,
ভালবাসাও আবেগময় হইয়া গোবর্দ্ধনের দিকে
ছুটিয়াছিল।

হৈমবতী গোবর্দ্ধনের পারে হাত বুলাইতে
লাগিল। গোবর্দ্ধন বুঝাইয়াছে দেখিয়া হৈমবতী
উঠিয়া দাঁড়াইয়া গোবর্দ্ধনের পারে মাথা
ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। তারপর তরলের ছিন্ন
সামনে ছোট্ট গাড়িয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল।
অঙ্গসিক্তমুখে ছেলেকে চুম্বন পর কুঁচু
খাটরা আলো নিবাতিয়া দিল। তখন শ্রাবণ
বজ্রনী। বাদল রাগিলীল সঙ্গে বৃষ্টিধারা তাল
দিতেছিল—“কম কম কম”। তারপর সব শেষ।
হৈমবতী প্রায় দড়ি দিয়া পৃথিবীর নিকট
বিহার করিল। কবি বলিতেছেন “দোটারায়
বেগ মধ্যপথে চলাই প্রকৃতির নিয়ম। গোবর্দ্ধন
ও তরলের ভালবাসার দোটারায় গাড়িয়া
মাঝখান হইতে মরিয়া হৈমবতী”। জানিরা বাল,
এ নরক সার্থক। শাস্ত্রী মহাশয়ের কবিতা “সেই
মরণের যখন হে”... আলো... কবে
বেত... Corolla অন্তর্গত... না হইয়া
একটি সৌন্দর্য্যময় করিয়া পিতার দানবী করিলে

Coriolanus কোন কতি হইত না। তবে King Lear নাটক খানার বোধ হয় অপমত। কিন্তু, এই যা কতি।

এইবার আশুন একবার "শুভা"র খবর লই। লেখকের নাম আনেকেই জানেন—ডাঃ নরেশ সেন.....Dacca Law College-এর Principal এবং বাঙালী দেশের একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তিনি যে সূক্ষ্ম আইনজ্ঞ তাহা সত্যেনের দায়রার বিচারেই এবং "বৈদ্য আইনের" ব্যাখ্যায় অনুমান করা যায়। কথায় বলে 'টেকি অর্গে গোলেও ধান ভানে।' একজন মনীষি যখন সাহিত্যের আসরে নামেন তখন বুঝিতে হইবে যে কিছু নূতন জীবের আয়তন হইবে, সাহিত্যে নূতন আবহাওয়া আসিবে। তাঁহার 'অগ্নিসংস্কার' ও 'দ্বিতীয়-পদ' পড়িয়া হতাশ হইরাছিলাম কিন্তু 'শুভা' হার-স্বরূপের পরিচয় পাইলাম।

পণ্ডিতলোকের পক্ষে নভেল লেখা বড় কঠিন, যদি সেই সঙ্গে সহজ প্রতিভা না থাকে। বঙ্গদত্ত, শরৎচন্দ্র ও নিকপনার মতরা সেই সহজ প্রতিভা পাই, সেই জন্য তাঁহাদের চিন্তাধারার মধ্যে কোথাও তড়িত নাহ। স্বচ্ছন্দ গতিতে নড়া করিতে কঠিন ভাবের লতরী ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা ক্রীতদাসের দায় ভাবের বোঝা মাথা দিয়া ছুটিয়াছে। নরেশ বাবু তাহা সে সহজ প্রতিভা নাই, এই জন্য নভেল লিখিতে 'শুভা' বৈজ্ঞানিক প্রণালী করা

কিন্তু শুভার গতি যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে জানিয়াছেন সে জন্য প্রত্যেক লেখক সাহিত্যিক তাঁর নিকট কণ্ঠস্বর রাখেন। পণ্ডিত Social Rebbis বা

সমাজদ্রোহী—যথা Ibsen, Max Nordan, Edward Carpenter, Strindberg এবং Bernard Shawর বাণী তিনি বাঙালী সাহিত্যে বহন করিয়াছেন। 'শুভা'র উৎসর্গে দেখি Dostrivskyর Reskobnicopp, Soniar পদতলে জাহ্নু পাতিয়া বলিতেছে— "I bow down to suffering humanity"—তাঁর উপোদ্যোতে দেখি Bernard Shawর Preface—তবে সৌভাগ্য সেটা সংক্ষিপ্ত।

নিবারণ চক্রের পত্নী শুভা স্বামীর পাশব ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহত্যাগ করিল। কাষটা প্রকৃতই অজ্ঞান, ইংরাজী সাহিত্যে East Lynneএ এমনকি Oscar wildeও Lady windermere's fanএ এই হঠকারিতার শোচনীয় পরিণাম দেখিতে পাই। গৃহত্যাগের ফল যে সব সমাজেই নিন্দনীয় ইহা আমরা জানি এবং ইহার বৃত্ত যে শুভ নহে তাহা 'শুভা' য়োঁকের মাথায় না মানিলেও আমরা মানি। কিন্তু "বা"র বাণা সেও জানে, জানে কি পরে?" কি বেদনার এই হতভাগিনী নারী গৃহত্যাগ করে তাহাও আমরা জানি। Provocation বা কারণ ছিল যথেষ্ট।

নিবারণ একবারে পণ্ড ছিল না। মাঝে মাঝে স্বীকৃতি আদর করিত এবং যদিও শুভার গর্ভের স্থান হুই হুইবার পদাঘাতে নষ্ট করিয়াছিল কিন্তু শুভাকে তাহা কেহ গালি দিলে শুভার হইয়া বগড়া করিত। তবে হুইথের বিয় শুভার মধ্যে আত্মসম্মান জ্ঞান লজ্জা এবং উত্তরাছিল, পিতৃপদের শিক্ষার তাহার দৃষ্টি মার্জিত ও বিবেক উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

উপযুক্ত স্বামীর হাতে পড়িল। শুভা যে আদর্শ পত্নী, আদর্শ জননী হইয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারিত সে বিষয়ে অসন্দেহ নাই। শুভা সাধারণ নারী হইলে নিবারণচক্রকে লইয়া দিন গুজরান করিয়া দিত। কত শত হিন্দু নারী এমনভাবে জীবন বহন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু শুভা নিবারণকে সহ্য করিতে পারিল না। দেবী-চৌধুরাণীর উপদেশ স্মরণ করিল। “মানুষের জীবন ভোগের জন্ত নহে, কর্তব্য সাধনের জন্ত—জীবনের প্রকৃত আদর্শ নিরন্তর সকলের জন্ত আত্ম বিসর্জনে” কিন্তু এ উপদেশ মনে লাগিল না। ভাবিল সংসারে একটা ছোট শিশু থাকিলেও তাহার জীবনের একটি লক্ষ্য থাকিবে কিন্তু দেখিল সব শূন্য। কেবল লাখি ঝাটা তিসকার সেই শূন্য জড়িয়া আছে। মনে পড়িল সেত সঙ্গে ডোবাব জীবনী, Florence Nightingaleএর ভাষা, Mrs. Besantএর বৃহত্তর জীবন।

শেষে স্থির করিল “যদি থাকিলে শরীর বেচিয়া বাচিয়া থাকিতে হইবে, বাহিরেও না হয় প্রগতি হইবে। কিন্তু স্বাধীনতা চাই, মুক্তি চাই, জীবনটা সার্থক করিবার একটা অবসর চাই।”

শুভা গৃহত্যাগ করিয়া পিরেটারে গেল। সেখান হইতে টাঙ্গা গ্রামকে নিজের আশ্রয়ে লইয়া গেল। টাঙ্গার হাতে পড়িয়া শুভা নিজেকে গাড়িয়া তুলিতে লাগিল। এমন সময় এলবাট পিরেটারের ম্যানেজার স্বরেশ বাবু দেখা দিলেন। শুভার সন্দেহ হইল টাঙ্গা তাহাকে বেচিয়া টাকা উপার্জ করিতে চায়। সেইজন্য সে মুক্তি কামনা করিল।

নগেনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার সে বেন মুক্তি পাইল। নগেন শুভাকে লইয়া যাইবে পাড়ায় বাড়ী ভাড়া করিল। তিনটি দিন সুখস্বপ্নের ভিতর কাটিয়া গেল। শুভার জীবনে এই তিনটি দিনই পরম দিন—ওত প্রোতভাবে প্রেমের মরস, কারণ সে আত্মবিস্মৃত হইয়া নগেনের প্রেমে অশ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। বর্ণনাটা পড়িয়া মনে পড়ে Anatole Franceএর Red Lily Thorese ও Dechartreএর মিলন কাহিনী। আত্মবিস্মৃতি ও অগ্রহীত জীবনের পরম সুখ ও তৃপ্তি এবং সেইখানেই বোধহয়, জীবন জীবন-রূপে সার্থক। হতাশাগিনী শুভার এই তিনটি দিন স্মরণীয় ও বরণীয়। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারেন নাই। তিনি সরোবে লিখিতে গেলেন, “যখন চক্রে আবার যখন ‘পূর্ণ পরিচিত উপপার্শ্ব’ সহিত দেখা হইল সাহেব পাড়ার সাজান গুজান বাড়ীতে যখন ‘শুভা’ বিলাসের উপকরণ রূপে প্রস্থান করিল তখন তাহার যে বিকট প্রেমের তাণ্ডব লীলার উল্লস চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বীভৎস রসের উদ্দীপক”। শাস্ত্রী মহাশয় কাব্যাদর্শ, কাব্য পোশাক সাহিত্য দর্শন পড়িয়া রস নিশ্চয়ই আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছেন বোধ হইতেছে রোদ রস, তাহা দিয়া আদি রসের বিচার চলে না। তিনি কি “জয়দেব” “বিজ্ঞাপতি” “ভারত চন্দ” কুমার সম্ভবের “অষ্টম সর্গকে” অজ্ঞান দিয়া কাব্য জগৎ হইতে বিদায় করিয়া দিতে চান?

কিন্তু এত আনন্দেও শুভার মন সজাগ ছিল। “সে এমন একটা তুচ্ছ বৈরিনী হই আর কি হই নহ এ কথা ভাবিলে তাহার হৃদয় ভেদ-

সেবার জীবন ধারণ করিল। এইত গল্প।
ইহাতে এ্যামিসিসের ভাবের Perfume of
vice গানের মনমগ্ধন, সৌভ কোথায়ও
পাইলামনা, কাজেই ইহাতে দুর্নীতি বা অস্বাভাবিকতা
আদ্রোপ করা চলে না। এটা মনের ভ্রম।
লেখক এই পুস্তক অনেক পুস্তক সমস্যা উপ-
স্থিত করিয়াছেন। সমাজে নারীর স্থান কোথায়
এটা প্রধান সমস্যা, এবং তিনি নানা দিক হইতে
এই সমস্যার উদ্ভব দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।
মকল সমাজের পণ্য ও পোশাক স্বাভাবিক
নিবাহিত জীবনের নারীর এক নাল একটা
ন্যায়। ইহা সমাজের দৃষ্টি নিচর করে,
কেননা নারী মঙ্গলময়ী-শান্তিকাজী না, নারী
কন্যা রূপ, পত্নী রূপে, মাতা রূপে সৃষ্টি এবং
কারণেছেন। সংসারে যা কিছু মন্দ, কোমল
মিষ্ট গন্ধ, নাস্তি, দার। বিশেষতঃ হিন্দু সমাজ
নারীর পক্ষে বিবাহিত ও বাক্য ছাড়া আর কোন
বাহ্য্য জীবন বসিবে না। আরো, সেটা বাক্য
নারীকে বাক্যের নাস্তি বা নাস্তি
স্বাভাবিক কেন নাই। সংসারের কোন বাক্য ই
নির্দিষ্ট বা নির্ভর নহে। আধুনিক পাশ্চাত্য
সমাজের উচ্চ বাক্যের দাবি। মন বাক্যের
উপর বাক্য আধুনিক বাক্যের দাবি। ইহা
ইহা বাক্যের দাবি। ইহা বাক্যের দাবি।
এই সমস্যা সমাজের কলনার হিন্দু সমাজ
নারী নারীর জীবন বোধ হয় অপেক্ষাকৃত স্বাভি-
প্রাণ এবং গাইয়া জীবনযাত্রাশাস্ত্রময়।
তাহার পবিসর কুদ হইতে পারে কিছু পাশ্চাত্য
জগতের কলনার আমাদের সমাজে স্বাভি-
প্রাণে প্রীতির বন্ধন অপেক্ষাকৃত মধুর এবং স্বাভি-
একটা স্বাভি-
হয়। ও দেশে ব্যক্তিগত স্বাভি-
হয়।

বাকির উক্তি অনেক বেশী কিছু এদেশের সমাজ অপেক্ষাকৃত শাস্ত্রিগির। অন্ততঃ আজ পাঁচহাজার বৎসরে ও এই ব্যবস্থায় ত সমাধি বিশেষ কোন ক্ষতি নাই।

কিন্তু এমন ব্যবস্থার মধ্যে ও মাঝে মাঝে এমন ছুটী এক জন নারীর উদয় হয় বীচাদের জন্ত এই বিবাহিত্ত জীবনের যথেষ্ট নহে এবং বাহ্যিক বিবাহিত্ত জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বক্ষা করিতে পারেন না। সেই জন্ত তাহাদের এক সাধারণ নিয়ম খাটে না। নারীর মনুষ্য জীবনময় পোষা যখন জগৎ হইতে পলায়ন শীঘ্রই সংসারজীবনে ইহা নিবৃত্তি পাইতে পারেন না।

মেবাবের রাণী 'গীরা বাক' একদিন কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হইবে লজ্জা মান বিরজ্জন দিয়া দ্বারে ভিখারিনীও বেশে বেড়িয়া গিয়াছেন। কহ মেবাবে দক্ষ ও তাহাকে রক্ষিতে পারে নাই। এ ঘটনা অসামান্য। কিন্তু পুরুষের প্রেমেও পাগলিনী হইয়া নারী গাথ বাহির হয় এবং বেইমিন সেই প্রেমের স্বপ্ন—নাশ অনেক সময় ভোগালখার নামান্তর মাত্র—টুটিয়া যায় যেদিন সেই হতভাগিনীর দেহ বিক্রয় ভিন্ন অন্নসংস্থানব আর কোন উপায় থাকে না। শুভাও সেই হতভাগিনী। সে কুল ভাগিনী, সমাজকে সে বড়ই উপকার করুক, তাহাকে চরম শাস্তি বহন করিতে হইয়াছে। অপমান, বেত্রাঘাত, প্রকাশ্য আদালতের লজ্জা ভোগ করিতে হইয়াছে। অজ্ঞায় করিলে নাথা পান্থিয়া অজ্ঞায়ের শাস্তি বহন করিতে হইবে ইহাই সনাজের সাধারণ নিয়ম। অল্প অনেক সময় হইয়া বাহিরেও দেখা যায়। কিন্তু নৈতিক ভগ্নতা বা Moral

worldএ শুভা কি দোষী? এই পোষ উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। তবে সামাজিক জীব—সংস্কারের দৃষ্ট আমায় মত গ্রহণ করিবেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

শুভার স্বামী অগাচানী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকলে অগাচানী মত করিতে পারে না, শুভাও পারে নাই। সকলের সহগুণ সমান হয় না। পুরুষ 'আপনার দিন' ভাষা ভাষা করিতে পারেন সেই দিন বড়ী দাদ পশু স্বামী ভাগ করেন, এটাকে নোহ বলিতে পারি না। অগাচানী সমাজে গরব বাহিরে বংশীর স্থান বারাক বা নতিমান প্রাপ্ত বড় দোষী নয়—বেদান্তের ভাষায় between Treadleman and Too Padee—শুভা সেই সনাতন পুরুষ অবস্থায় বসিয়া। সে জীবনে কঠোর কষ্ট অসম্ভব কাবল পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি। অগাচানী সমাজে নারী পুরুষের সহক 'ভিকার' ভক্ষকরা। বাঙ্গলা দেশের পুরুষ টেতা, টেতা, এবং নারীর সহিত কিকল বান্ধব করেন তাহা প্রায়ই অগাচানী ভোগে পড়ে। শুভার নাম সম্বন্ধ শুভাচানী বহন কাবতে বহন অগাচা ভুলিয়া গাই শুভন রক্ষাণের নীর স্থান কোণায় তাহা সহজেই অন্বেষণ। শুভা টেতা ও বহল বাবকে চিনিতে পারি না বাহতী নতুনকে বরণ করিল। কিন্তু "লুকের ভাগ্য" এর বীধিত্ত জনলে পুথিয়া বেশ, "দেখা কবল লুকের দৃষ্টি। এতদিন "লু" বীধিত্ত জীবনটা স্বপ্ন নয় এটি বাস্তব বস্তু।

I slept in front that life was beauty,

I ~~discovered~~ and found that life was duty.

তখন মাদার কীশানের প্রণেয় উপদেশ শুচিপার সেবা ব্রত ত্যাগের জীবনকে নতুন পথে চালিত করিল। শুভা মেলিল অর্থ, মর্যাদা, চশের মূল্য বড় করে যদি জীবনে প্রেম না থাকে। এমন সময় আবার নতুন আশ্রয় উপস্থিত। কিন্তু চপ্পার অর্থের জন্ত, মৈলীর, অর্থের জন্ত, শুভা আজ বলিদান দিল। যশ, মান, অর্গকে তুচ্ছ করিয়া সেবা ব্রত গহন করিল। Florence Nightingale-এর আদর্শকেই জীবনে বরণ করিল।

পত্নী মহাশয় লিখিতেছেন—“তৎকাল বৎসরের বন্ধের প্রাতি তরুণী পরকীর্যার আশঙ্কিত রসাতলেবেরই গণিতপট্ট করে।” Zola-র বা Pascal-পড়লে বুঝতে পারি পাঁচশ বৎসরের বৃহত্তী কেন নাট বৎসরের বন্ধের পোনে তদায় হইয়াছে—এ প্রেমের কথা শুধায়, সত্যত-ভ্রুতিতে আমাদের দেশেও দেখিতে পাউ তরুণী পত্নী বৃদ্ধ স্বামীর প্রেমে তরুণ। ইচ্ছা অনৈসর্গিক নচেৎ এত বসন্তভাবেরও সৃষ্টি করে না। ‘কিছু শব্দ’ মহাশয় বইখানায় পুনরায় পাড়তে এলেন। সত্যত-ভ্রুতিতে যে কোন দিনের ‘তরুণী পরকীর্যার কথা’ অরুণে বাবুর প্রাতি আশঙ্কিত হয় না, তবু বাবুর প্রেমকে শুভা গভীরতমের করিয়াছিল।

আগামের *Quintanians*-এ যে দিন অরুণে বাবু পুষ্কীর মিকট বিদায় লইতে গেলেন তখন সেটা হইল শুভার সঙ্গে। এ মিলন বড় চমৎকার! মিকটপুষ্কীর ‘শ্যামলী’ মনে পড়ে—অবশিষ্ট-এ প্রেমের মিলন হইয়াছিল ত্রিমালয়দ শিরের গুরু কেশ বৃদ্ধ বৃদ্ধার। অরুণে বাবুও

শুভার মিলন আশ্রমের উপহাসকার—একজন বৃদ্ধ আর একজন প্রৌঢ়। এ প্রেম মনে চণ্ডীদাসের ‘কামগন্ধ’ নাহি তার। এ জ্ঞানবাসী একবারে Platonic Laura-এর প্রতি Petrarcha-র মত। অরুণে বাবু বলিলেন ‘শুভা, মনে আছে তোমার সেই এক দিনের কথা, যখন আমি তোমায় আমার ভালবাসার কথা জানিয়ে ছিলাম। তুমি হেসে উড়িয়ে দিবে ছিল, বলে ছিলে, পুরুষ মানুষ ভালবাসে না, কেবল অধিকার চায়। আমি সেই থেকে বরং তোমায় ভাল বেছেছি। আজ তোমার বড় থেকে একটাবাব মনে যেতে চাচ্ছি যে তুমি বিশ্বাস কর যে, আমার ভালবাসা সত্য ও নিঃস্বার্থ। বিশ্বাস কর কি শুভা?’

শুভা কঁদিয়া বসিল—“আজকে যদি অরুণে বাবু হাস্যমুখে অপাঙ্গে নাড়না না দিলে এত দিন তখন পেয়েছেন তার জন্ত আমার যে নিঃস্বার্থ উপর কি রূপা হ’চ্ছে তা বলতে পারি না।” কই পরকীর্যার আশঙ্কিত দেখিতে পাইলাম না।

মৈলী ও চাপার চারও বেশ খুটিয়াছে। সমাজ বন্ধনের বাহিরে পারি-এক সে বস্তুসাহ ও চণ্ডীদাসের পুণ্যভাষা বিকাশিত হইয়া পাবে মৈলী ও চাপাও লেখক তাড়াতাড়ি দেখাচর্য্য-ছেন। এখানেও প্রত্যেক স্পষ্টত দেখাচর্য্য-ছেন যে বাহ্যিক জীবনের নারীর আদর্শ। চাপার সেবারও পার্থক্য জীবনের তুলায় কটিক মার। কাজেই সে ভুবনচক্রকে পাইয়া পুত্র বহু পরিণত হইয়া নারী জীবন সার্থক করিল। শুভাকেও কঠোর আর্থ পরীক্ষার পর স্বীকার করিতে হইল—যে স্বামীর প্রেম স্বামী প্রেমে

হানী রেবার, প্রকৃতি লক্ষ্যশীলী হওরাষ্ট্র। সে গাট হিসাবে এমনই আর একখানি চিত্র-
 নিজেকে নিজের মিল বে যৈলীর স্থার চেটা শীলতার বরণীর।
 করিলে সেও অনীকে মাহুয় করিয়া মইতে ছিল সমাজে ত্যাক্য হইলেও মানব সমাজে
 পরিণত। গ্রাহ্য হইবে—একং বাহ্যিকার মনীষি সমাজ
 পরিণমে আবার বক্তব্য বে “দোটাণা” ও এই উপভাস হইখানিকে ধরণ করিয়া
 “Perfume of vice” নাই, একখানি মইবেন।

মহাপ্রস্থান *

[দরবেশ]

প্রভুর আস্থানে ঐ চলিয়াছে ভূতা,
 উর্কে ছ'বাহ তুলি আকুলিত নৃত্য ;
 দোদুল চরণ তার, মুখময় হস্ত,
 সিক্ত সাধনা আজি, সার্থক দাস্ত্র।

থাসে থাসে নামাভাসে নামী আসে—সত্য,
 নিদানে বিধান নাম ঔষধ-পথ্য ;
 নামে মতি নামে রক্তি নামে অশুরস্ত্র ;
 নাম-গানে নেচে নেচে ঐ যায় ভক্ত্র।

নাম-নামী-নামদাতা নহে তিন ভিন্ন,
 সঞ্চিত-প্রারক সব আজি ছিন্ন ;
 সংশয় নাতি আর—নাতি তিল মাত্র,
 মরণ উপচি' উঠে জীবনের শাত্র।

বাজে ঘন করতাল মধুর মৃদঙ্গ,
 মস্তৌর ধুলে একি ত্রিদিবের রঙ্গ ;
 তক্ত্র নাচিয়া চলে ইফের সঙ্গে,
 ডেকেছেন প্রভু তারে নয়ন-ভ্রমঙ্গে।

* সত্যার্থ সাধু-স্বাধিকা নামে রায় শারদ্য ত-বক্ত্র মহাপ্রস্থান, জীহরিয়ায়
 কীর্ত্তন নৃত্যকরিত করিতে যুক্ত্য দর্শনে লিখিত। বারানসী ১২ই, বাহ,
 ১৩২৮।

বারাণসীধাম এই চির অবিমুক্ত,
রটন্তী-কোমল-নিশি তাহে যুক্ত ;
মঙ্গল হরিদাম শ্রীতারক ত্রঙ্গ,
মঙ্গল নর্তন—মৃত্যুর বর্ষ ।

মহান প্রয়াণ হেন মরণের স্থল,
হেরি মিটে জীবনের মত বিধা ধ্বল ;
জীবন মরিয়া রয় মরণের রাজ্যে,
মরণ কাঁচিয়া যায় জীবনের কার্যে ।

সার্থক নর্তন কীর্তনানন্দে,
সার্থক ও-জীবন মরণের স্পন্দে ;
জন্ম সফল আজি হেরি চাক দৃশ্য,
ধন্য শ্রীগুরুদেব ধন্য রে শিষ্য ।

সাহিত্য পরিচয়

নির্বাসিতের আত্মকথা—১, সিনকিন—১/০, বর্তমান সমস্যা ১০

[লেখক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

পাওয়া যায়—বিজলী কার্যালয়, ২৩১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

বাঙ্গালা সাহিত্য মাসিক পত্রিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখন প্রবল বেগে বাড়িয়া উঠিতেছে যেখানে বহু বুরি অসংখ্যের পর জলপ্রাবন হয় । অনেকজন মাসিক লেখক লেখিকার কথা বার দিলে আরও অসংখ্য জিনিষ পড়িতে হয় । অনেক সময় একখানা বই শেষ করিয়া শেষ করার ছুটি প্রাক্কাল্যের বড় কিছু পাওয়া যায় না । সুতরাং অনেকের মধ্যেই শক্তির অভাব, করার দলে সাধ আছে সাধনা নাই । অনেকেই জিনিস দেখেন না যে নতুন কোন idea বা চিন্তার

দ্বারা সাহিত্যের পরিপূষ্টি করিবার শক্তি যখন নাই তখন লিখিয়া লাভ কি । জানি এ উপদেশ অনেকেরই ভাল লাগিবে না । কাবণ হয়ত বা এ উপদেশের মধ্যে অনেকটা ফাঁকি আছে, এবং অনেকে বলিবেন বাঙ্গালী জীবনের এমন কি বৈচিত্র্য আছে যাহাতে নতুন নতুন চিন্তা যোজ গড়িয়া উঠিবে । কিন্তু যাকে যাকে চিন্তা প্রতিভার বিহীন ক্ষুদ্র দেহের চমকিত হইতে হয় । একবার পাহাড়ের উপর গিয়া দাঁড়াইতে একটি হ্রদের তীরে পৌঁছিয়া অনেক বসন্তের

নাই। সন্ধ্যা চোরে চোখে পড়ে একটা সতর
কোড়কের মিল। এ স্বকর্ম (amour)
বাকলা দাঁটা নতুন জিনিস, বেনা মুখে
হাসি, চোখে জল। শোনা গার লোলা বেশী
গরম হইলে গাহাকে white hot বলে, সেই-
রূপ তাঁর চোখ এত তাঁর যে তালা চোখের ওলে
প্রকাশ করা গার না বলিয়া হাসিতে ফুটিয়া
উঠিয়াছে। লেখক কানাইলাল সম্বন্ধে বলি-
তেছেন 'কানায়ের মত এমন প্রসন্ন মুখজবি
আর বড় একটা দেখি নাই। সে মুখে চিকার
রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চাকল্যের লেশ-
মান নাই, প্রসন্ন কমলার মত তাহা বেন
আপনার কানাইলাল কটিয়া বহিয়াছে।
ওনিয়াদিলাল জীবিত হইয়া বাহার কাছে তুল্য
কলাইয়া বিবাহিত সেই পরমহংস। কানাইকে
স্বামী বলে কথা মনে পড়িয়া গেল। স্বামি
করিয়া শুধু এত কথাই মনে হইতে লাগিল
কি চিত্তবৃত্তি নিগোষের এমন পক্ষ আছে
যাহা পাইয়াছি বাহির করিয়া দেন নাই।'
কানাইলার মনে এই লেখকের মত কথা এ
কথা। কানাইলার এ বৈদ্যের মতিন বলা
হইতে পারে। লেখক তাই না, কানাইলাল
মুগ্ধতা জানিয়া, তাই জগৎ মানস কানাই
কানাইলার সমর মনে হইত যে তার উদার
যে কর্তা দিন বাক্য আছে সে কর্তা দিন
যেন চা খাইয়াই কটিয়া বিতে গার
যাই।

সাবুর দলে জুটিয়া 'কড়া প্রসন্ন' পাঁচ
ভক্তিভা উল্লেখ্য অনিগ্র্য মান্যের এই
তপস্বী প্রসাদ যে সার বড় তাহা থাকে
না হাইতে খুশিও পায় বার, আর তাঁর
করম সমস্ত ভিজিয়া দাস হইয়া আসে।

কানাই এটা জগৎদের মতিন
সম্বন্ধে। 'বুনি সাংঘে সিদ্ধি' মতিন
গাহে কান কলাইয়া দিয়াছিল। কানাই
লেখকের মনে হইয়াছিল—গাহক মিত্তি কি
সোজা কথা।' আমরাস বলি

যখন ছেলেদের মাসিদের মতিন বন্দো-
বস্ত হইতেছে তখন উল্লাসকর সম্বন্ধ করিয়া
টিক করিতেছিল ইন্দ্রপেক্ষের সাহেবের মতিন
তিনমণ কি নাচে তিন মণ এবং জাহান
মোহর হৃদয়ে পাইয়াছে কি আরেকবার
খাইয়াছে। কানাইলার পবর ওনিয়া মতিন
নিশ্বাস ছাড়িয়া উল্লাসকর বলিয়া 'বাক্য দাব
থেকে বাঁচা গেল।' Birley সাহেব যখন
জিজ্ঞাসা করেন 'শেখরা কি মনে কর যে
তোমরা ভারতবর্ষ শাসন করিতে পারি?'
লেখক উত্তর দিয়াছিলেন 'মহাশয়, কেউ
ধরেন পূর্বে কি তোমরা ভারত শাসন
করিতে? না, তোমাদের দেশ হইবে আমবা
শাসন, কড়া দাব ওয়া 'অন্যমনস'
সাহেবের উত্তরটা পড়ন

উপদেশ প্রদানের বড় কথা টিক মতিন
করাব মানসে। দরবারেও বিদ্যে ও
উচ্চতর পাত্রের অগ্রগণ্য মতিন জানিয়া লুট
বাইরাও, মতিনের সময় ওকাল পৌজিত
মতিন প্রসাদ, একসঙ্গে উদয়ে সাধুগণ
কানাইলার মতিন করিয়াছে আজ রাষ্ট্র-
নিষ্ঠ করিতে গিয়া একসঙ্গে উভয়ে পুলি-
সে গার বরা পড়িয়াছে। কানাইলার যে
উচ্চতর একসঙ্গে উল্লাস কানাইলাল বাক্য
কানাইলার ওকাল তাহা তখন, কানাইলাল
এখন গার হৃদয় শাসনটুকু হইলে
বাক্যযেব সব লক্ষণই মেলে।

১০. বঙ্গ ট্রান্সলারের ক্ষেত্রে, এ বর্ষেরেক সমা-
কোটনা ভর না। তবে আশ্চর্যের কাজ
পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আশা কর এ-
কিটি জ্ঞানানন্দ আশির বিচিত্র দেশী ও
বাসিনী ভাষায় অন্যান্য ভাষাতে যথেষ্ট পরিচয়
করতে পারে। বঙ্গালীর কি প্রকৃতি? এমন
কি, এ দেশীতে যারা কাগজে কাগজে দাঁড়
উঠে বা বুকুর বন্ধ জমিতে বাঁসে। এ
জগতের স্রষ্টা কই?

১১. লরকের সিন্ধু-সংস্কৃত
কবিতা: উৎসাহিত, পদদ্বন্দ্বিত, আশ্চর্য
ভাষা বহুগুণের পুঞ্জীভূত অত্যাচারে সিন-
ধু-কূপে দেশী দ্বিধাচ্ছিন্ন হইয়া লেখকের
সমবেদনা পূর্ণ লেখক বঙ্গ ভূট্টিয়া উঠিয়াছে।

উৎসাহিত-না জানা-বাঁসিনী-অবশ্য পাঠ্য এক
পুস্তক।

১২. তাঁহার 'বর্তমান সমাজ'তেও অনেক
নতুন কথা আছে। উৎসাহিত শাসিত ভাষা
এই ভাষাতে এত অল্প কথায় এমন গুড়া
ইয়া কেহ বাসনাছেন কিনা জানি না।

১৩. পুস্তক লেখকের চিন্তাশীলতার
পরিচয় পাই। তাঁর মনোভাব ভাষা-
বহির্ভূত হয় তাহা 'thought provoking'
নামের নামে দেয়। তাঁহার ভাষাতে ভাবের
স্বাধীনতা - গলোয়াইবে দাঁড় - এক
আশ্চর্য - আশ্চর্য শব্দকোষের একা - মাটিয়া
দিয়া মনোভাবের একটি প্রকাশ্য কথা।

— প্রবন্ধ।

কলিকাতা

বেঙ্গল পিণ্টিং ইন্সটিটিউট, ১০ নং কামাপুর লেনে
শ্রীমন্তীবল্লভ লাহিড়ী দ্বারা মুদ্রিত।

কাশীধাম

"অলংকা" কার্যালয় হইতে চারুশর্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্তৃক প্রকাশিত।

8

SECRET

সূচী।

[বিশাখ ১৩০৯]

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। নবীনগর বাগ		১১৩
২। বৈদ্য (কবিতা)। দরবেশ		১১৫
৩। উত্তরোত্তর সাহিত্য। বিচারের মাপকাঠি		১১৬
অধ্যায়ক—শ্রীমৎশ্রী নাথ পণ্ডিতের ৩য় ভাগ		
৪। মরণ পুষ্টিগত মর্জনা	শ্রীমানিক ভট্টাচার্য	১২০
৫। কুরে (কবিতা)	শ্রী গিরিজা কৃষ্ণ	১২৪
৬। প্রেমালম্বনাম	কথাপট্ট—শ্রীমানিক ভট্টাচার্য	১২৭
৭। আমাব চানসাবা	শ্রী কলার নাথ বসু	১৩৫
৮। অশ্বারোহী কবিতা	শ্রীমৎশ্রী নাথ	১৪৭
৯। আশ্বিনদেশে	শ্রীমৎশ্রী নাথ	১৪৮
১০। কবির কৈকবৎ (কাব্য)	শ্রীমৎশ্রী নাথ	১৪৯
১১। অশ্ববৎ সমস্ত	আচার্য্য প্রমথ চন্দ	১৪৯
১২। মায়ের অধিকার	শ্রীচরিত্রী বসু	১৪৯
১৩। কান্দ পো	শ্রীমানিক ভট্টাচার্য	১৫২
১৪। বৈদ্য	শ্রীমান্য চন্দ চকবর্তী	১৫৭

অদ্বিতীয় “আমাশয়াস্তক বাটিকা” মহোৎসব

যে কোন পকারের জন্মের ৪৫০ নং ২৪ ঘণ্টায়, গারোগ্য হইবে, তাহা
মূল্য ফেরৎ দিব। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ১০ আনি মাত্র। ডাক মাণ্ডুল বন্দ।

অদ্বিতীয় “জরাস্তক চূর্ণ” মহোৎসব

আমাদের জ্বর, কুইনাইন আটকান জ্বর, আলামেন জ্বর, জ্বর এক
জরাস্তক সকল প্রকারের জ্বর ৪৮ ঘণ্টায় তাহা ৩৫.৫° সেন্টিগ্রেড মূল্য ফেরৎ
দিব। মূল্য এক সপ্তাহের ঔষধ ১০ আনি।

ডাক মাণ্ডুল বন্দ। একদে বেশী পরিমাণে ঔষধ লইলে কমিশন ফেরৎ।

প্রাপ্তিস্থানে—এ. কে. একা সফ ১৭২৭ চাকার ১৫১ বৈদ্যের দ্বারা।

প্রাক্তন প্রকাশিত

নূতন প্রকাশিত

বঙ্গের প্রাচীন ও নব্য সাহিত্যিক

বিখ্যাত কবী অসন্ন দাশগুপ্ত এম. এ. প্রণীত

[মূলধ্বনি অকস্মাতঃ] **চুস্তির দাবী** —মূল্য ১৫০

যাইকেন্দ্রের ভবিষ্যৎ, বাক্য এত দিনে সম্পূর্ণ হইল।

ঐচ্ছিক চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

[কাব্য] **ভদ্রাভঙ্গন** ২

স্বামিন ৫০

পূর্বিকা ৫০

তরু ৫০

স্বাস্থ্যমুক্তি ২

আমাদের অতীত প্রকাশিত নুতনের তালিকার কত আগনি আজই খর লিখুন এবং
আমাদের আট-আনা কল্লেরের গ্রাহক প্রেরী কৃত হউন।

এখানে স্বাধীন বঙ্গালী পুস্তক পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যমুক্তি কল, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা, ২২০ কণ্ডলালিস ট্রাট,
কলিকাতা।

সন্ন্যাসী **জরাস্তক সুখা** প্রদত্ত

ইহা জরুরে সেরা সেবন করিতে কোন প্রকার ভয়ের কারণ নাই। ইহা সেরা ন
নূতন ও পুরাতন জর, প্রীতি, যক্ষ্মা ও তদাশ্রয়ীক জর, ম্যালেরিয়া, কম্প ও জীর্ণজ্বর,
শালাজ্বর, কুইনাইনে-অটিকান জর, পিত্তরোগাদি ও আসামের কালাজ্বর, এস
ক-সকলবিধ জর, আরোগ্য হইবে।

সর্বদা সাধারণকে অস্ত্রের সহিত জানাইতেছি যে, যদি এই ঔষধ সেবনে বেলা
কালে না হয় অসুখ ফেরত ঘিরে।

মূল্য—১ শি ১

প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা শান্তিচৌধুরী জরাস্তক সুখা কাফালয়, ৩৪নং অগস্ত্য কুণ্ড।
স্বাস্থ্যমুক্তির জন্য সকলি গ্রহণ। ২নং স্বামী কৃষ্ণানন্দ লেন পোঃ বেলুড, হাওড়া।
বঙ্গদেশ—বি. আর. ৫৩ নং।

অস্ত্রের সহিত সর্বদা "সন্ন্যাসী"র উল্লিখিত কলিকাতা অফিসের হইল।

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1000

4

সত্যব্রত

संज्ञा-संज्ञा-संज्ञा

[illegible]

প্রভাতী

সচিত্র বাণিক পত্রিকা ও সমালোচনা

বাণিক পত্রিকা ইতি আন। প্রতি সাপ্তাহিক পত্রিকা ইতি আন। বিবিস্ময়ে সমস্ত
পেট্রা করি ন।

এই পত্রিকাতে। ইতিপূর্বে যখন মাসিক 'মহানবোৎসাহ' বাণবের তরফে। অধ্যাপক
মহোদয় করতর। দিল্লি হতে যেন। বিনয় কুমার করকার। হরিহর শাস্ত্রী। সুশোভন রায়। অধ্যাপক।
অমলেন্দু সেন। বিশেষ কুমার। আর। বরবেশ। কুমারদেব মলিক। ইতি প্রসন্ন যোগ। পৈলকাম।
কোরকার। ইতি "প্রভাতী" লেখক লেখিকা।

আইক প্রাচীকার। রক্তার যশেট উৎসাহ। দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের। কার
প্রসন্ন। প্রতি সাপ্তাহিক। বহু ছবি থাকে।

রায় এণ্ড রায় চৌধুরী

২৪নং (বোতাল) কলকাতা স্ট্রীট যাত্রি কলিকাতা।

প্রকাশিত হইতেছে

প্রকাশিত হইতেছে

সচিত্র বিশারদ। ইতিপূর্বে যখন মাসিক 'মহানবোৎসাহ' বাণবের তরফে। অধ্যাপক
মহোদয় করতর। দিল্লি হতে যেন। বিনয় কুমার করকার। হরিহর শাস্ত্রী। সুশোভন রায়। অধ্যাপক।
অমলেন্দু সেন। বিশেষ কুমার। আর। বরবেশ। কুমারদেব মলিক। ইতি প্রসন্ন যোগ। পৈলকাম।
কোরকার। ইতি "প্রভাতী" লেখক লেখিকা।

সর্বোত্তম

সর্বোত্তম। ইতিপূর্বে যখন মাসিক 'মহানবোৎসাহ' বাণবের তরফে। অধ্যাপক

আইক প্রাচীকার। রক্তার যশেট উৎসাহ। দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের। কার

প্রকাশিত হইতেছে

প্রকাশিত হইতেছে

শ্রীসুভেন চক্রবর্তী এণ্ড

মহানবোৎসাহ। ইতিপূর্বে যখন মাসিক 'মহানবোৎসাহ' বাণবের তরফে। অধ্যাপক

অলকা

“সম্ভ্রান্ত কুমরমুখরাঃ পানপা নিতাপুণা।

কংসশ্রেণী রচিতকরণা নিতাপুণা মলিতাঃ।

কেক্ষেৎকল্পা ভবনশিখিনো নিতাপুণাৎকলাপা।

নিতাপুণাৎকলাপাঃ প্রতিকৃতভমো হস্তিরমাঃ প্রদোষাঃ॥

প্রথম বর্ষ]

বৈশাখ, ১৩২৯

[এম সংখ্যা

নবীনের বার্তা

“অলকা” সম্পাদক

মান্যবরেয

আজকের জাকে আপনাদের পরেজানার
শেলুম লেখা দিতে হবে, তাহলে আমার আত্ম-
প্রসারের চেয়ে ভয়টাই বেশী হয়েছে;
সাহিত্যক্ষেত্রে এত দ্বন্দ্বী মল্লযুদ্ধী থাকতে
আমাকে নিয়ে চানচানি করা ত শোলন
সম ॥ তবে আমার সৌভাগ্য এই যে বাধা
কিছু একটু ছকুম জারি করে বসেন নি,
তাহলে আমাকে গাঢ়াকা দিতে হত, তার
আলোম কাকল আমি যুবক, বৌদনের চকলতা
আমার শিরার শিরার বর্ষে থাকে, বৌদরী
আমার আমার একমাত্র কৈফিয়ৎ এই যে
আমার বৌদরের পূর্ণ নয়, হাতরান আত্মক

আপনাদের বাধা-ধরা ছকুম মানতুম না।

আপনাদের “অলকা” হচনাতেই পৌষের
বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়ার পরশ। যদিও বা
বিষে জজ্জরিত হয়ে “অলকা” বেচে থাকে,
মৃতি হবে তার পেট ভাগুর এবং হাত পা
সক প্যাড়াগেয়ে ছেলোটর হত, আর আশনার
হেত্রিশ কোটি দেবতার চরণের চরণে ধরল
দিয়ে মাহুলীর রান্না রাজ্য করে এনে তার কলক
বুদোরের, ভরসা এই মাহুলীবরণ নোভোর
জোরে যদি তাকে কিনারায় ধরে রাখা যায়।

যেহেতু আমার দেবতা, আমি বৌদরী
সুজারী, কাজেই “অলকা”র এই হাতরান

যদিও পূজারীরা বলেন এই ভবিষ্যৎ জ্ঞানি
 মানুষের জন্মে পারেন। আশনারা বা
 বড়ি কান্ডের, যাকে প্রাণের পান দিয়েছেন,
 তাঁকে কইর ভাবনার পুঙ্খল থেকে মুক্তি
 দিয়ে আসেন, কাতাল, বর্বনের কানে ছেঁচে
 দি। সে মুক্তির নিখিল কেনে বাঁচুক, উদ্ধার
 কাকারধর নীচে বহিত হলে জানবেন
 শক্তির হৃত হবে সে। ভবিষ্যতের ভাবনার
 মন বাহ্য, তালু জন্মগ্রহণ, এই যৌবনের মন
 নিখিল কোথাগুলো তাদের স্থান নেই,
 তারা জানে শুধু আশারভনের স্রষ্টা করতে,
 পাকের পানের ছর উঠলে তারা পারে
 শুধু তার গলা ধিগে করতে।

জাতপঙ্কা পৃথিবীর নিখিল। তার গড়বার
 সাহস নেই সে জাততেও পারে না, তার
 কল শুধু ধীর, জাত প্রাচীরের সহস্র
 কাটল তারই ফেঁসা দিয়ে বোঝান। নূতন
 পুরাতনের অনন হৃদ চলেছে, হাত প্রতি-
 শাতেরও ক্ষয় নেই; নবীন হারা তারা কি
 এই যুগের ভরে, তাদের জন্মগত অধিকার
 যৌবনকে ভাগ করবে? দেশে আজ দিকে
 দিকে আহ্বান ছেঁগেছে; উদ্ধৃত, উদার
 প্রায়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যৌবন দেবতা
 ডাকলে প্রাচীন গ্রীক অলিম্পিয়ান ধীরের
 মাঝার পাতার বিজয়বৃষ্ট-পরামর্শ-মত নবীনের
 লম্বাটে "রাজ টিকা" একে দিতে; মল্লিন,
 মল্লিন হোফা, আরোপের রঙে রঙানি কাগ-
 রারের নতুন্যার দাঁড়িয়ে বাঁচুক ডাকছে
 তার মনকে জ্ঞান যৌবন নিলদ পারে গড়িয়ে
 দিতে। মনে হলে আজ লোক—হুটুয়ে,
 তার ভবিষ্যত নেই, জন্ম নেই, যে মুক্ত,
 সে পারে গলাটে শুধু একটা চন্দনভিটার—

জন্ম তার ভবিষ্যত-ভাব, "জন্ম" তার
 মেধে বরষা দিবার নিমিত্ত পুঙ্খল থেকে
 বোধ করে।

আর সে যৌবন প্রত্যেকের পূজার
 সময়ের বা দিগে থাকে, যার সেবার কত
 যে উদ্ধৃত জন্ম করে, তাকে নিখিল জন্মে
 আবার সেই জন্ম, সেই জন্মকার। "জন্মকা"
 যদি এই জন্ম, এই জন্মকারের পতাকা
 হবে জন্মগ্রহণ করে থাকে, হুচনা তার
 উপস্থিতি হয়েছে, চিত্তার ভিতর যার জন্ম,
 তার গলাটের চিত্তার আঁকজোঁক, তার
 অকালবাঁচকা কেউ খোঁচাতে পারবে না।

আর 'জন্মকা' যদি যৌবনের বাঁজা,
 প্রাণের পরশ বুকে নিয়ে করে, ধীরের
 মনে সঞ্চিত হবে সে আপনই বাঁচবে। তার
 গতিতে নিখিলিত করতে হবে না, তার জন্ম
 তার ভবিষ্যত প্রয়োজন নেই। যৌবনকে
 আপনই তার অঙ্গের ভূষণ হয়ে উঠবে।

দেশপূজার জন্ম যে নূতন ব্রাহ্মণের
 গড়ে উঠছে, বৈদ্য ও অমূল্য তাদের
 ব্রাহ্মণবীত, মুক্তির বাণী তাদের দেবতা
 পূজার নৈবেদ্য, প্রথম সর্বোপর আসেন তাদের
 ধর্ম, যৌবন তাদের প্রাণ। দেশের মন্দিরে
 মন্দিরে তাদের পূজারতির ফটা বাজছে,
 তাদের শুকগানে ধ্বজার আকাশ ছায়া হয়ে
 আসছে। "জন্মকা" কি নিজের বুকে এই
 নূতন পূজারীর আসন গোতে দিতে পারবে?
 নূতন ব্রাহ্মণের এই সেবার "জন্মকা" যদি
 নিজেকে জালি দিতে পারে, যৌবনের এই
 জাগরণকে যদি নিখিল করে মুক্তির জন্মের
 দাঁড়িয়ে বসতে পারে, তবেই "জন্মকা" বিজয়,
 তবেই তার জন্ম সার্থক হবে।

ইতি
 আশারের নাম

দৈয়ী

[দরবেশ]

ওরে মন, কহ শুনি সত্য পরিচয়,—
জীবনের গতি হেরি পেয়েছ কি ভয় ?

রোগ শোক দুঃখ ছালা,
অভাব অশান্তি ঢালা,
পদে পদে অপমান দৈন্য পরাজয় ;
শুখ—তা'ও দুঃখময়.
উদ্বেগ ব্যর্থতা ক্ষয়.

সত্যতার মূল্য নাই সদা মনে হয় ;
জীবনে ঝঞ্ঝাট হেরি পেয়েছ কি ভয় ?

//
ওরে মন, কহ শুনি সত্য পরিচয়,—
সবারে বাসিতে ভাল পেয়েছ কি ভয় ?
যারে নিবি বুকে ওরে,
সে ফিরে হৃৎশিবে তোরে.

করিবে না বিন্দু স্নেহ কেহ অপচয় ;
যা' কিছু মনের গতি,
মিটিবে না এক রতি,

হয়তো চোখের জলে বাড়িবে সংশয় ;
তাই ভালবাসা দিতে পেয়েছ কি ভয় ?

ওরে মন, কহ শুনি সত্য পরিচয়,—

মরণ আসন্ন হেরি পেয়েছ কি ভয় ?

নীতল নিধর দেহ,

সঙ্গী মাথী নাই কেহ

আগুনে মাটিতে মিশি হয়ে যাবে লয় ;

কেবা জানে পরপার,—

আলো কিবা অন্ধকার

কে জানে শক্তিভ ভাগো কি আছে মকর ?

তাই কি মরণ ভাবি পাইয়াছ ভয় ?

ভয় নাই—ভয় নাই—হও নিঃশেষ,

জন্ম—প্রেম—মৃত্যু—এই তিনে নাই ভয়।

জন্ম যে প্রেমের লাগি,

বিশ্বের ভিত্তিতে ভাগী,

প্রেম মরণের মাঝে মোতে চিরজয় :

মরণ সোহাগ ভবে,

জীবন বরণ করে,

এ তিনের যে নিঃশেষ—সে মঙ্গলময় ;

জন্ম—প্রেম—মৃত্যু—তান দাপ্ত পবিচয়।

ইউরোপীয় সাহিত্যে বিচারের মাপকাঠি।

[অধ্যাপক বিষ্ণুপদেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ]

আর্ট বা শিল্পকলা জগৎ সংস্কারের
স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, মঞ্চাভিনয় ইত্যাদি
বুঝায়। নাট্য কলা, বাগ্মিতা ও নৃত্যের মধ্যকার
আর্ট হিসাবে ধরা যায়। কামরূপ ক্রমোন্নতি
রুচির, তাঁতী, সাদৃশ্য ও চিত্রবৈচিত্র্যের মধ্যে
আর্ট আছে। আমরা ইতর আদির কারি কার-
এগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাছে
লাগে। Hegel বলেন সাহিত্যের আসল
মহত্বের উপরে। এই কথা কবিতা, নাটক ইত্যাদি
শিল্প আমাদের একটি বর্ণের মানসিক নিয়ম
মনকে দোলা দেয় মাত্র, কিন্তু সাহিত্য
আমাদের মানস প্রাজ্ঞা এমন একটি মানসিক
লোকের সৃষ্টি করে যাহা ভাষায় প্রকাশ
করা যায় না। মনে হয় এই জগতই মনোবী

Hegel সাহিত্যের আসল অর্থের আর্টের
সংজ্ঞা দিতে পারেননি।

গ্রীক পণ্ডিত Simonides বলেন
"Painting is silent poetry and poetry is painting that speaks"—
চিত্র নীরব কাব্য, এবং কাব্য এমন চিত্র
যাহা নিজেকে ভাষায় প্রকাশ করে।
স্থাপত্য Parthenon, St. Peters বা
মন্দিরগুলি ভাস্কর্য্য Athene Parthenon,
Venus of Milo, Laocoon বা ধানীকৃষ্ণ
চিত্রে Raphael এর Madonna বা
অক্ষয় চন্দ্র, বসন্তের Beethoven বা
হানসেনে যে মানসলোকের সৃষ্টি হয় নি,
এ কথা বলিলে সত্যের অবমাননা করা হয়।

সৌন্দর্য্য এই শিল্পকলায় বিকশিত হয়ে উঠেছে, এবং চিরদিনই তুলি আশা দেয় বলে কল্পিত দেবে। কিন্তু এ কথাটি সত্য নয় যে এই সব আর্টের উপাদান বস্তুই মূলিকথা মাত্র। এই হিসাবে সাহিত্য বানানো হয়। সত্যের কাণ্ডের ভিতর দিয়া মননে পশিয়া আশার আনন্দ দেয়, সত্যের দ্বিত্ব ইত্যাদির দ্বারা দিয়া তাহাকে পৌছিতে হয়। কিন্তু সাহিত্যের রস একবারে মনকে ডুবিয়ে দেয়। এই খানেই সাহিত্যের বৈচিত্র্য বিশেষত্ব। আর সব প্রাণের গাছ তরু সাহিত্যে আনন্দের অল্প লোকের সত্য পবিচার করাইয়া দেয়। আর যবে পাই সীমার আনন্দ, সাহিত্য দেয় অসীমের আনন্দ।

কবি কালের গম্ভীর মানেন না, দেশের সীমার সব্দ নয় না। তাঁর মোক্ষ তুলিকায় বুদ্ধ, মোটে, Montaigne সজীব হইয়া উঠেন, Babylon, Athens, Alexandria ইত্যাদি আনন্দের চোখে দেখেন। ভাসিত উঠে। বিশ্বমানের দৃষ্টান্ত চিত্রা ধারণে যে সাহিত্যের কৃষ্টি ও পুষ্টি।

Goethe বলেন "a traveller does not take anything out of Rome which he has not brought with him" তিনি রোমে যাবেন তাঁকে সেই বস্তুই ফিরে নিয়ে যেতে হবে যা তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। ঠিকই তা আমরা যা ভেবে থাকি, তাই তা পাই। মনে পড়ে পুরীতে একবার রান্না দাতার সময় স্ত্রীতে পেলুম। আমার পাশের ছটি ঘরক বলাবলি

কাজে "পাখুরা ঠাকুর" কটাকে যদি দেখে যে ছোটো পাখোয়াজ ও একটা ঘরলা বৈদ্য কবি। থায়া জিনিষ হলে। আবার কালের চাষি পাশে নয়নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি সেই কপলীন নিম্নকালের ঠাকুর দেখিয়া তাহাদের নয়নে ফলগায়া। আমার সামনেও ঠাকুরটি ও মাটির টেলি, আসল ঠাকুরটির আসন যে আমার মনে।

কাব্যের রস অনন্তত করা যায়, কিন্তু যতটা বৈচিত্র্য কোবে দেখান যায় না। তাব কে কপ দেওয়া বসন্ত নয়। কাব্যের সৌন্দর্য্য মনকে আনন্দ করে, এমন একটি রসে সৃষ্ট করে যাতে আর কোন উপাদানের প্রয়োজন হয় না। বলাবলিই পরম আনন্দ।

এখন প্রথম বাড়িক সাহিত্য বিচারের রীতি। Plato বলেন সাহিত্যের সঙ্গে কল্পনা ও সত্যের যোগ থাকি চাই। সাহিত্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে কি নাবে সৃষ্ট করে ও সংকেত কি রূপে প্রকাশ করা হয় তা দ্বারা সেই গুরুত্ব বিচার করা হয়। তিনি গ্রীক সাহিত্যকে আদর করিতে পারেন নাই কারণ Attic নাট্যকারেরা অদ্বৈতের জর বোধে কোর্বেছিলেন, গানের জর নয়। মনে হয়, Plato একটু ভুল করেছেন। প্রথমতঃ জগতে সত্যের ধর্মের জর হয় না। আমাদের Institutional জগতেই ধর্ম জরী বহ। দ্বিতীয়তঃ ইঞ্জিয় (Senses) দিয়া সত্য অবগতির এক বহু এবং চিন্তার (Ideas) দ্বারা সত্য প্রকাশ আর এক পথ। অর্থাৎ Logic ও আর্টের যথোপযোগ্য তিনি তাহা দেখেন নাই।

তাই মত সাহিত্য আমাদের ভাবুকতাকে
কর করে দেয়। Intellect বা বুদ্ধিবৃত্তিকে
উন্নত করে। এক কথার সহ্যকে প্রকাশ
করই সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং এই সাধুকাটি
সিদ্ধির সাহিত্যের দোষত্রু বিচার করা উচিত।

Aristotle এর Poetics বহুখানা সম্প্রদায়
সাহিত্যে “কাব্য প্রকাশের” মত—সাহিত্য
সমালোচনার মূল স্বতন্ত্রতা উহাতে পাওয়া
যায়। তাঁর মতে সাহিত্য অন্তরকরণ বা
পুনরাবৃত্তি মাত্র। ইহাতে বস্তু (Plot) চরিত্র
(Character) ভাষা (Diction) এবং ভাব
(Sentiment) থাকে এবং নাটক ইত্যাদি
সম্বন্ধে ও নাট্যকলায়ও বিচার কোড়ে হয়।
তিনি বলেন আটের উদ্দেশ্য আনন্দদান
নিজজীবনের চুলচেরা সত্য ও আটের সত্য
অনেক প্রভেদ। আটের ঘটনা অপেক্ষা বড়
নাটক যোজনা ও প্রকাশের প্রয়োজন বেশী।

এখানেই ইতিহাস ও কবিতার পার্থক্য মনে
হয়। ইতিহাসিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য
কাব্যের ন্যায় কবিতাও একেবারে সাহিত্য
সিদ্ধি সাধন করিতে পারে (particular),
কাব্যের সত্য বিশ্বজনীন (Universal)।
তিনি Tragedy বা দ্রোণের মত বড়
সম্বন্ধে বলেন যে, কোন Tragedy-র আনন্দ
ময় দেখিলে আমাদের এক কথার সাফল্য
(Excess of emotion) হইতে হয়।
পাত্র। যখন তাইব, “অতঃপর” ১৯৩০
বছর নব্বই এবং “ইন্ডিয়া” ১৯৩১ খ্রিঃ।
সিঁথুনা দেব এর “অতঃপর” ১৯৩১ খ্রিঃ।
দেখ।

যোশেফ ও ক্রিস্ট (১৬ বিঃ খ্রিঃ) আলোচনা
উল্লেখিত। Cicero, Quintilian, Horace ও Longinus এর “De Sub-
lime” এর ইহার পরিচয়। কিন্তু
Aristotle এর উপর কোন কথা সত্যকার
সাহস তখন ছিল না। ইউরোপেরও মত
করে Aristotle ছিলেন প্রাপ্তবয়স্ক। Ren-

aissance বা নব্যযুগের দিন—
বেদীতে বসেছিলেন Plato

আধুনিক যুগে অষ্টাদশ শতাব্দীর
Addison, Milton এর Paradise Lost
বিচার করিবার কালে একটা কথা
বলেন যে আটের প্রাচীনতা আমাদের
কল্পনা বৃত্তিকে জাগ্রত করে। এই কল্পনার
বলেই কবিতা কারাগারে গেলো এবং কবি
আঁকড়া পারে যাঁহা বিপদে পড়ল।

তিনি উচ্চা কোরে যে কোন কবিতা
প্রকৃতিকে সাজতে পারেন, কারণ সে কবিতা
ঠান নিজের হাতে। বেবল একটি কথা মনে
রাখা চাই যে খুব ব্রাজিলিউ কোলে হস্তা-
স্পন্দ হইতে হয়। কবিতা কাঁচা কোড়ার
মত লাগে হয়ে উঠলো—বা “পায়ে চাপে
সাগীর ছাড়াই মূল পুস্পের মত চাপটা
ইয়ে গেলো। ইহা দি পমা original মনে
নাই, কিন্তু কালিদাসের সঙ্গে মোটেই মেলে
না। কল্পনাকে জাগ্রত কোন্সার শক্তিই কাব্যের
প্রাণ এবং প্রাধান্যই সাহিত্যে অনন্ত বিন্দে
প্রাধান্য হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৩৬)
জন জন্মান পণ্ডিত Langens (১৭৪৬)
than the Wise এর সঙ্গে কবিতার
এবং আটের Laocoon এর দ্বারা সাহিত্য বিচার
এবং পার্থক্য স্থাপন করেন। একথা সত্যই পাণ্ডিত্য-
পূর্ণ পুস্তকের সংখ্যা খুব বহু। Laocoon
নামের গ্রাসদ ভাস্কর্যের উপর কবিতা কোরে
বিচার কোরেছেন। Virgil এর Aeneid
এবং বিদ্যার সঙ্গে Laocoon এর চিত্র দেখান
কিহেতে, যেখানে দাঁড়ী ১৩৩৩গা Laocoon
জন্মের নিচর পীড়নে জাহাঙ্গীর জন্মেন।

ভাস্কর এই রূপটি আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন। কিন্তু মূর্তিতে চাঁৎকা দেখান যায় না। কাজেই ভাস্কর Laocoon এর মুখে তীব্র বেদনা ও নিরাশার মাঝে একটা হেঁচকা প্রকাশ পাচ্ছে। Laocoon এর সর্বনাশ হয়েছে, চোখের সামনে সপা যাচ্ছে দুই পুত্র মরণের কোকে ঢলে পড়েছে। সর্প Laocoon এর সর্বনাশ জড়তির তাহাকে পিষিয়ে মারিতে বাইতেছে, কিন্তু Laocoon হার মানলে না, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত নিচুর অদৃষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। ‘মনসার ভাসানে চাঁদসদাগরকে মনে পড়ে, Lessing বলেন ভাস্কর Virgil হঠাৎ ঘটনাক্রমে নিয়েছেন, কিন্তু আটটি তা’কে নূতনরূপ নিয়েছেন। জনতে পণ্ডিত Shakespeare তাঁর আখ্যান বস্তু নিয়েছিলেন Holinshead’s Chronicles ও Plutarch এর জীবনী সংগ্রহ হ’তে। রবীন্দ্রনাথের ‘প্রাক্ষণ’ ‘অনিস’ প্রভৃতি উপনিষদ বা অবদান করলেন হ’লে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা অতীতের কালক্রমকে এমন রূপ দিচ্ছিলেন—এই কঠিনীর মধ্যে আর এমন সূত্রে উল্লেখ—যা মূলে না। Quarry (পাথরের খনি) ও finished statue বা মূর্তিতে তফাৎ—যেন এও তেমনি। আরো বস্তুটি কি এইখানেও ধরা যায়।

Lessing এর সঙ্গে তুলনা হয় Aristotle এর বেদন Platonr সঙ্গে মেলে Victor Cousin ভিক্টর কুসে ১৮১৮ সালে Du Vrai, du Beau, et du bien (সত্য, সুন্দর, শিব) নাম দিয়া করেকটি বক্তৃতা দেন, ১৮৩৩ সালে ইহা পুস্তকাকারে বাহির হয়। তিনি বলেন ফাটিষ্ট বা শিল্পীর

পক্ষে সত্যবেশ (Ideality) মধ্যে যে ভাব বা Idea আছে তাহাকে প্রকাশ করা অনেক ছাটিয়া অনেক বাছিয়া তবে এই ভাবটাকে প্রকাশ কোত্তে হয়। কারণ এই ছাটি ও বাছার (Omission ও Selection) শক্তির নামই আর্ট। আর্টের উদ্দেশ্য নীতিগত সৌন্দর্যের সাহায্যে নৈতিক সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া শোনা। এক হিসাবে আর্টের শক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে বশী, কেন না আর্ট Pathos বা কল্যাণ বিচিত্র রূপে প্রকাশ করে। এবং এই Pathos এর দিক দিরাই বিচার করতে হয় শ্রেষ্ঠ আর্টের কলায় প্রকাশ এক কঠিপাথরেরই সৌন্দর্য বিচার কোত্তে হয়।

Wordworth বলেন কবি এর বড় কবি বা সাহিত্যিককে প্রকৃত অগনিধী ভোগ কোত্তে হয়—সেটা চোখে বোঝান। সাধা গভীর মাকে যে মন ধোবে তাহা নতুনকে নিয়ে চায় না। সেইজন্য প্রথমে একদম পাঠক শ্রেণী কোত্তে হয়, তারপর মনে (sensation) জাগরণ হয়, তবে এখন আরও যান্ এক সত্যক আনন্দ পান্। কিন্তু সত্য সমাজে কোন কখনোকে প্রকাশে দুঃখেরই হবে না, সাধারণ পাঠক ধরাতের মনে আনন্দ দিতে হবে।

Mathew Arnold এর মতে কবির সাহিত্য সেই যগের সমস্তটা যিনি কোত্তে হয় অর্থাৎ কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংগত নির্ণয় করা গাই। উদাহরণ স্বরূপ তিনি Grayর কথা উল্লেখ কোরেছেন—Gray সাহিত্য যে যুগের কোন সম্বন্ধ ছিল না কাজেই তাঁকে একলাটি

কবিতা কেবলই—একটা উচ্চ প্রতিভার বিকাশ হতে পারে নাই। তিনি আর একটা কথা বলেন—Poetry is the criticism of life—কানীমানব জীবনের সমালোচনা মাত্র। কবির ধর্ম আমাদের সুখ দুঃখের জীবনটাকে বুঝিয়ে দেওয়া এবং যিনি যে পরিমাণ এই কথাগুলো বুঝিয়ে দেন তাঁকে সেই ভাবেই আমরা বিচার করি ও তাঁর কবিতা শক্তির পরিচয় পাই। Wordsworth বাঁকে বলতে চান “The breath and finer spirit of all Knowledge.”

Ruskin ও William Morris এর মধ্যে দেখি Platoর আদর্শ নীতিবজ্জিত আঁট মিথ্যা এই—কথাটা Ruskin বার বার বোলেছেন। তাঁর মতে জ্ঞানের জন্য মানুষের প্রবৃত্তি (Passion) ও আশার মধ্যে। সেই আটই সব চেয়ে বড় বাহ্যতে বেশী ভার আছে (which contains the greatest number of greatest ideas)

আমরা আর একটা কথা প্রায়ই শুন্তে পাই Art for Art's sake. বোধ হয় Theophile Gautier এই তত্ত্বের জন্ম দাতা এবং Swinburne ইহার প্রচারক। Swinburne বলেন, ‘কোন একটা কবিতা বুঝতে হোলে ইহার উদ্দেশ্য বা নৈতিক অর্থ দেখিবার প্রয়োজন নাই। সব বড় কবির ভিতরে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য (Harmony) ও আধ্যাতিক জীবনের আভাস আছে,—তাহার মানুষকে কী বলতে চায় না এবং এমনই তাহার শক্তি বাহ্যিক উদ্দেশ্যে উগ্র বলিলে কবির প্রতি

অবিচার করা হয়। কেবল কবির যত্নের মধ্যে কোন সমালোচকের মত ঘেলে না বা জনসাধারণের মতের সহিত বিরোধ হয় বলিয়াই যদি কোন কবিতা বা অল্প কোন সাহিত্যটিকে প্রাসঙ্গিকি দিই তাহা হইতে প্রাসঙ্গিকবর্গের মুক্তকণ্ঠে একাংশ পাই। ‘জীর পত্র’ চিত্রাঙ্গনা ‘বয়ে বাইরে’ এমন কি ‘শিকার মিলন’কে বুঝতে না পেয়ে আমাদের সাহিত্যে কত আবক্ষনা আছে! আমার ‘ভাল লাগে না’ অতএব ‘সকলের ভাল লাগা উচিত নয়’—এটা বোধ হয় Neo এর। এই কারণে Christalul, Ode on immortality বা ‘সোনার তরী’কে অপসৃত মনে হয়। এবং আমরা দেখতে যদি ভুলি তাহা হইলে কবিতার এই জন্ত Shelley তাঁর কবিতার একটা Glossary of words তৈরী কোত্তে বলেন। ভয় হয়, একদিন প্রবীক্ষনাথকেও হয়ত পাদটীকা দিতে হবে। এককালে Southey, Wordsworth ও Kingsley সমালোচক সমালোচকের ভরের কারণে হয়ে উঠেছিলেন।

Mrs. Browning তাঁর Aurora Leigh এর এক প্রান্তে বলেছেন “The poets are the only truth teller left to God”—অর্থাৎ ‘চলমানের রাজ্যে কবিতা সত্যপ্রদ। সেইজন্য সত্যকে প্রকাশ কোরবার ভার তাঁর উপর। আমাদের কবিতার অল্প নাম কবি—তাঁরা ছিলেন সত্যপ্রদ, নব্বের মধ্যে সত্যের পরগণি প্রকাশ করেছেন।

Meredith এর Diana ও the

Greenways এর কয়েকটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন সাহিত্য সেই যখনই সার্থক যখন 'এহা' আন্দোলনের দ্বিত্বের দৃষ্টান্তকে জাগ্রিত দিতে পারে। 'আ' জুসি দিয়ে গুব কই করনা কোরে কোন ছবি আঁকিলেই হয় না। কখন চোখের ভিত্তিতে ত মাহবের অন্তরের কথা মেটে না। কোন স্থলী বর্ণনা পাড়তে আমাদের সারা চকল মন বন হাঁপিয়ে উঠে। সেইজন্য বিনি প্রকৃত ববি যেমন Shakespear, Dante বা রবীন্দ্রনাথ একটি কি দুটি লাইনে চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলেন।

এই প্রসঙ্গে Schlegel, Sainte Beuve, Dowden, Raleigh, ও Bradleyর উল্লেখ প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাহুল্যভয়ে চাপা দিলাম। তবে আমাদের মনে হয় সকলের মত একত্র করিলে এই সত্যটিকে সার্বজনীন মনে করা যেতে পারে—
The supreme test of merit is agreement with the general sense of mankind অর্থাৎ যখন কোন সাহিত্য বিশ্বমানবের চিত্তের সত্যটিকে দৃষ্টি মেল তখনই বুঝিব সেই সাহিত্যের গুণ। কারণ তাহা বহুলোকের আনন্দের উপদান।

বর্তমান সাহিত্যের দিকে তাকাইলে আমরা দেখি যে ইহা আমাদের বৈদ্যনিক জীবনের সহিত কিরূপ ওগোড়াভাবে জড়িত। এখন দেখা যাউক যে সাহিত্যের কোন কল্পিত পাত্রের মাজিয়া সাহিত্যের দোষ-গুণ বিচার কোন্ডে হয়।

প্রথমতঃ দেখিতে হয় সাহিত্যের নূতন সৃষ্টি

বিধানকে। সাহিত্যের নূতন সৃষ্টি এবং ইহা আমাদের জগৎকে বদলাইতে পারি কিনা। যে সাহিত্য আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত কোন সম্পর্ক নাট এবং যাহা সার্বজনীন ও বাস্তবিক কোন দৃষ্টান্তে পদস্থিত করে তাহাতে বড়ই অল্প কথকতা না কেন তাহা ভাষ্য—কতকটা বাস্তবীয় হয়। এই হিসাবে 'পঙ্কতিনক' ও 'গৃহদাহ' সার্বজনীন।

দ্বিতীয়তঃ আর্দ্রের দৃষ্টান্ত কিংবা ভাব (idea) প্রকাশ কোন্ডে হয়। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সহিত তাহার সমাজ ও জাতির সঙ্গে একটি অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে কিনা দেখতে হয়। এক কথায় ব্যক্তিগত (particular) অভিজ্ঞতার সহিত বিশ্বজনীন (Universal) অভিজ্ঞতার যোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। রমেশ চন্দ্রের 'সমাজ' বা প্রভাতবাবুর 'সিন্দুর কোটায়' তাহা নাই।

তৃতীয়তঃ সমাজ বা জাতীয় সমাজের দৃষ্টান্তে অভিজ্ঞতার মূল। সেইজন্য সাহিত্যিকের হাতে বুদ্ধি ব্যক্তিকের লাঞ্ছনা দেওয়া ও পাপীর জর দেওয়া আগে বড় আপাত লাগে এবং এ দ্বারা সমাজের মঙ্গল হয়, সেইজন্য তাহা বৈধ। জাতীয়, জগৎ ও সাহিত্যের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন জীবিত বদান। বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি।

চতুর্থতঃ সাহিত্যের কাটামো বা Symmetry বিচার কোন্ডে হয়, কথার মলে মনি আঁকনের বেগ, noble words set to perfect music। শুধু ছবিখানা ভাল হলেই চলবে না, তাব d'rame খানাকেও ভাল কোন্ডে হবে, তবেই ছবির সৌন্দর্য্য

খুলবে। সাধারণ সৌন্দর্য্য এক একটী
মত। কীর্ত্তির দ্বারা অনুভূত থাকে—কখন
বৌদ্ধধর্মের ‘কথিকা’ রচয়িতা সেনের ‘অনুভূত’
স্বাক্ষর দেখি কাগজমোর জলে মানুষী উপ-
দেশকালি কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
সেখানেই শিল্পীর বাহ্যচরী যখন তিনি কোন
কথা না বলে কেবল ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেন। এই
‘না বলা’র (Suggested বা Implied)
সৌন্দর্য্য যে আমাদের কাছে সব চেয়ে বড়।

জানি ভাল ইংরেজী চাই। আমার দোষে
Robert Browning—বিশেষতঃ তাঁর
Sordello—অনেক সময় অবোধ। জানার
জগৎ Tennyson কত মনোহর বর্ণিত
আমরা স্বীকার করে চমকানিলায় Brown-
ing এর স্থান অনেক উচ্চ।

পদ্ধতিঃ—সাহিত্যে আদর্শ ও জীব (Idea-
lisation) বিশেষ কোরে বিচার করা
সবকার। সাহিত্যের কাজ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি
করা (objective) কিন্তু তার চেয়ে ও
বড় কাজ আমাদের আনন্দ দেওয়া (sub-
jective). Bacon বলেন কাকা নৈতিক
উদ্দেশ্যে সাহায্য করে এবং মনোভঙ্গ সঙ্গী
তার প ও হ’তে সৃষ্টি দেয়।

এখন মোটের উপর দেখা গেলে যে
সাহিত্যে যখন মত উল্লিখিত করি তখন
কিছু তথ্যের ব্যবহাৰ (matter) সুলভ,
কাঠামো বা ভাষার বাঁধনি যখন ভাল লাগে
তখন বর্ণিতে চাইবে রূপটি (manner)
কেন মনোহর হয় তাহা এবং যখন সামান্য
মুখ্য চাই তখন বুঝি সাহিত্যিকের মনে জাবের
রূপটি (Idealisation) কেমন সহজ
হয়। ছন্দ (Rhyme) ও রচনার
রীতি (Style) সবচেয়ে দুটো কথা বলে
এ প্রবন্ধ শেষ কোরে চাই।

ছন্দ আমাদের কীভাবে সহজ দেখা
দিয়ে। যুগপাঠ্যনির গান শুনে শিশু বাবের
কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, বাজনার তালে তালে পা
কেল সৈনিক মনোরম বৃত্তে কাপিতে পড়ে।
আমাদের বাড়ীতে আমাদের বন্ধুসম্মানে
সেই ছন্দের শোণ। প্রতি নিখাস প্রকাশে
সেই মনোরম ছন্দে লীলা আবহমান কাল
চলে আসছে। কারি তার ছন্দ দিয়ে স্বাধা
দের অন্তরে বীণার স্বরভাষা জোড়েন বলিয়া
তিনি আমাদের এত প্রিয়।

উপজ্ঞান, নাটক ও প্রবন্ধের মধ্যেও
একটা গতি আছে—আমাদের বেশ আমাদের
মনকে জুলিয়ে দিয়ে যায় এই একটি বেশ
মান হয় ইহার নামই Style. কিন্তু এই
Style জিনিসটা কি অস্বলয় করা যায়,
বোঝান যায় না। Raleigh এর জাতি
সাহিত্যিক সাহিত্যের ধীর Style দেখান। এমন
অপূর্ণ হয়েছে যে Arnold Bennett মুগ্ধ
হয়ে বলেছেন যে বর্তমান ছাপাতে না দিতে
যদি চাও যে নিচেন ও হাতেই একটা
উপকার দেও এবং তার পুনামও অকল্প
পাও। এই Style জিনিসটা পরিষ্কার
কোরে বুঝান বড় কঠিন। যেমন সঙ্গ
দেখে কোন লোককে চিন্তে পাতি, কোন
জাতির শির বা স্থাপত্য দেখে সেই জাতির
Culture এর পরিচয় পাই সেইরূপ The
style is the man. অর্থাৎ যে যেমন
লেখক পাতকের কাছে ধরা দেন সেইটাই
তাঁর Style.

উদাহঃ—Temple Classics এর
একখানা খুব ছোট কিন্তু বেশ ভাল বই—
Worsfold's judgement in Liter-
ature এই প্রবন্ধের মূল উপাধান।

ময়ূরপুচ্ছের মহিমা

[ত্রিমাণিক ট্রাচার্য বি এ, বি টি]

ই আই রেগাডের একটা মাঝারি গোর্ডের ষ্টেশনে একখানি ডার্টন প্যাসেঞ্জার ট্রেন থামিবার জন্য এক ভদ্রলোক খুব ব্যস্তভাবে গাড়ীর মধ্যে শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি খুঁজিতে লাগিলেন। সে দিন পূজার ছুটির শেষ দিন; ট্রেনে অসংখ্য ভীড়। তিনি আরও একটু দৌড়াদৌড়ি করবেন, এমন সময় ট্রেনের সিটি পড়িয়া গেল। অল্প বেগী করা চলে না। লম্বুখেই ইংরাজীতে কেবল ইয়ুরোপীয়ানদের জন্য থা একটি ছোট কামরা একবারে খালি দেখিয়া 'চুপা' বলিয়া ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন। ট্রেন ছাড়িয়া গেল।

ভদ্রলোকটির বয়স বৎসর বিশ কি বিশ দশ হইবে। পুরুষ সামান্যই দেশীয় পরিচ্ছদ। এক চক্রে মাঝারি গোর্ডের একটা বাগ, অপর চক্রে একগাছি মজবুত পট্ট—যাহাকে ছোটখাটো লাঠিও বলা যেতে পারে। ইয়ুরোপীয়ানদের কামরায় উঠিয়া বোধ হয় মনটা তাহার একটু খুঁত খুঁত করিতেছিল, তাই ট্রেন ছাড়িয়া দিলেও বাত এখান পথায় বায়কষেক ভাকাইয়া তবে দ্বিঃ হইয়া বসিলেন।

কতকগুলি ষ্টেশন আসিল ও পার হইয়া গেল। রুদ্ধমান হৈশনে গাড়ী অনেকক্ষণ থামিয়া যখন ছাড়িয়া দিরাছে এমন সময় অপর একজন আরোহী সেই কামরায় উঠিয়া পড়িলেন। "Shall be back to-morrow"

(কাল ফিরিব)—কথা করটা জাহাজে বলিয়া ছয়ার বন্ধ করিয়া লোকটি ইংরেজী পড়িলেন। আরোহীট দেবার ফিরিঙ্গি টিকি কায়েতের কাঠির বোতল "ব্রাসী চুটি" লইয়া কাঁধী দ্বিগুণে কলিকাতা বাইতে ছিলেন।

দ্বিঃ হইয়া বসিতেই কামরার এককোণে উপস্থিত বাঙালী ভদ্রলোকের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। ফিরিঙ্গি যুবকটির একটু ইংরেজী দেখা ছিল। ভদ্রলোকটির বাঙালী পরিচ্ছদে প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ইয়ুরোপীয়ান?"

বাঙালী ভদ্রলোকটি বিনীতভাৱে উত্তর দিলেন—“জাঙ্কে না, আমি ভারতবাসী।”

“তবে এ কামরায় উঠিয়াছ কেন? জাননা কি ইহাতে শুধু ইয়ুরোপীয়ানদের ইতিবাচক অধিকার?”

“জানিতাম, কিন্তু অজ্ঞে কোথায় উঠিবার স্থান পাই নাই এবং জানার এই টোপেই যাত্রার বিশেষ প্রয়োজন সে বস্ত্র ইহাতেই উঠিতে বাধ্য হইয়াছি। তাড়াতাড়ি ইহা এক ঘরে খালিও ছিল।”

“যখন খালি ছিল, ইহাকে খালি রাখা উচিত ছিল—অজ্ঞে: ভদ্রলোক আমায় এত না উত্তীয়ায়। তোমাদের জন্য সমস্ত গাড়ী খানা ছাড়িয়া দিয়া দ্বিঃ হইয়া এক ঘর রাখিয়াও নিস্তার নাই। এত জল তোমাদের সন্তান কিছুতেই আমায়ের মিল হইতেছে না।”

“এই কথা করিলে মিল হইবেও না, কারণ

এইরূপ সামান্যতক সিন্ধুর পান চিনিবই
কর করিয়া থাকে।

সাহেব এখার চুটিয়া গেছেন। মেয়ের
পড়িত জিজ্ঞাসা করিলেন—এই দুলালার কোন
কাজ করিয়া লাভ করিল।

ভারতীয় বাদী ও ইউরোপীয়ান বাদী
দুইজনের জড় বিড়ির প্রকরণের ব্যবস্থা দেখিয়া।
কহিয়া দেখুন কত লোক হানাজাবে টিপনে
পাড়িয়া গিয়াছে, আর এই দুইজনকে কে
কখন কোন ইউরোপীয়ান, আরসেব এই
একরপার খামি পড়িয়া থাকিবে। জড়
কি আশনি উচিত মনে করেন।

“নিশ্চয় কবি। তোমারি বক্তৃতা যথেষ্ট
শোনা গিয়াছে। এখন তো বসিবার লোক
হইরাছে, এখন তুমি নামিরা বাইতে পার।”

তত্ৰলোকটি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন
—“মাপ করিবেন, এখন তো নামিবার
অধিকা নাই।

কুহু হইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—
কখন তোমার অধিকা হইবে?

“যতদূর পৌছিবা মাত্র।”

এবার সাহেব কোণে জলিয়া উঠিয়া
বলিলেন—“একটা মাঝারি ট্রেনে থামিবা
মাত্র যদি জেমাকে জোর করিয়া নামাইয়া
দিব।”

তত্ৰলোকটি বিনীতভাবে উত্তর দিলেন—
“আমার এতদূর।”

তত্ৰলোকের বিনীত কিন্তু কিঞ্চিৎ
পরিচয় পূর্ণ উত্তর জানিয়া অত্যন্ত কুহু
হইলেন সাহেব জেমাকে আর কোন কঠিন
কাজ বলিতে পারেন করিলেন না। মনে
মনে হির করিলেন, যে ট্রেনটির গাড়ী অত্যন্ত
৫ মিনিট থামিবে সেখানে নামিরা গাড়
থাকিবার সাধ্যের উচ্চকে নামাইয়া দিব।

সাহেব কখনো কখনো কহিতেন।

কতকালো বোট খাওয়া এখন তুলিয়া
গেল। সাহেব পড়িত হইয়া বসিয়া গেলেন।

তত্ৰলোকটি গাড়ী আসিয়া থামিলে সেখানে
খিনিব পত্র তুলিতে ও নামাইতে অত্যন্ত
মিনিট পাচক সেটা হইবে অনুমান করিয়া
সাহেব নামিরা পড়িলেন ও তাড়াতাড়ি
গাড় সাহেবের নিকট অভিযোগ করিতে
হুদিলেন।

তত্ৰলোকটি নামালার দিকে একটু
সরিয়া আসিয়া সাহেবের কিংগপতি লক্ষ্য
করিয়া মূহ হালিলেন। একটু পরেই দেখা গেল
সাহেবের দিকে আসিয়া হইয়া সাহেব সজাবিত
বিজ্ঞপকের সেই দিকেই বিরিতেছেন।

তত্ৰলোক নিশ্চিত মনেই বলিয়াছিলেন।
গাড়কে লইয়া সাহেব ক্রমশঃ কামরাটির
কাছাকাছি পৌছিতে তিনি ব্যাপ হইতে
একটি তত্ৰ পাতলুন বাহির করিয়া দ্বারে
দ্বারে পারিতে আরম্ভ করিলেন।

একটু পরেই মশকে হুয়ার খুলিয়া দিয়া
সাহেব বলিলেন—Here is that ob-
stinate fellow (এই দেখুন সেই এক-
গুণে লোকটা।)

একগুণে লোকটার পাতলুন তখন হইয়া
পর্বত উঠিয়াছে।

গার্ডসাহেব চক্ কপালে তুলিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—what are you doing Bahadur?
(একি করিতেছ বাবু?)

বাবু মূহ হাসিয়া উত্তর দিলেন—
just becoming a European man
(এই সাহেব ইসলাম আর কি।)

গরজন করিয়া আরোহী সাহেব বলিলেন

—What the devil do you mean by that? (কেন এমন এক কথার প্রয়োগ কি?)

কোনও পক্ষ প্রতিকূল তুলিয়া লইয়া
কহিলো—“কিন্তু যখন বলিবে—‘আমি
এ আমি হ’লেই হারিয়ারানী।’ যেটুকু তখন
হিস—যাহা পরিচয়—তাহা এখন বুঝিয়া
গিয়াছে। এখন অস্বস্তি আমার সল
আমার অপ্রিয় হইবে না। আমার ভিতর—

কিন্তু হারিয়ারানী কিনা আমনি সম্মান করি
কিন্তু যখন বলিবে—‘আমি হ’লেই হারিয়ারানী।’
আমনি কহিলো—

সাহেব হারিয়ারানীর সান্নিধ্য উপর
নের কত চাছিলে হারিয়ারানীর গাফিল
যাহা বানী বাক্যইয়া দিয়া পরিচয়—

Now, there is no help for
Smith-1

দূরে

[শ্রীগিরিজা কুমার বসু]

চুপ-চুপ—কহিও না কথা ;

এ নাম এনোনা মুখে কারো যদি বাজে বৃকে
থাকে কেহ অধোমুখে
শুনে পায় বাধা।

কার তাতে কিবা আসে যায়
আমি যদি চিরদিন থাকি দূরে দীনহীন
বেদনায় বিমলিন
নিলাীন ধূলার।

তা’রা আজ হ’য়েছে তো সুখী
জৌখো জৌখী হ’লে পরে পলাইত যারা স’রে
রহিত বিরাগভরে
হ’লে মুখোমুখী

যায় যায় ! মাথা খুঁড়ে ব’লে
তু’টো কথা কহি পাছে অসিত না তাই করে
তা’রা ত ভালই আছে
আমি নাই ব’লে।

তাহাদের অশ্রুত সান্নাই
 হৃদয় হৃদয়ে নর হৃদয় হৃদয়ে
 তাহাদের হৃদয়
 অশ্রুতে সান্নাই।

তাহাদের হৃদয়ে সান্নাই
 আজ ত' কেহই নাহি— হৃদয় পরশ
 চরণে মাগে না ঠাই
 কোন অভাজন!

অভাগা ত' আজ আর কেহ
 একটা চন্দন মাত্র বাচেনাক' দিবারাত্র
 কহে না—“এ প্রাণ পাত্র
 ভরি, দাও স্নেহ”!

শতভুলে তাহারা ত' আজ
 যায় না পলায়ে আর ডাকিলে ত' বার বার
 গৃহান্তরে লুকাবার
 নাহি কোন কাজ!

কি শেল যে বেজেছে এ প্রাণে
 চুপ-চুপ-কড়ু ভুলে তা'দের বোলো না খুলে
 তা'দের হৃদয়-ফুলে
 কাঁটা কোন্‌খানে!

হৃদয়ে থাক' তারা প্রাণে প্রাণে
 থাক' তারা হৃদয়ে আমি হালান্নাই বুকে
 দাঁত তিতা, রব চুপে
 প্রেমের স্থানে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ

[অধ্যাপক শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম.এ.]

(১)

এই দুঃখবশ সন্সারে বাস করিয়া দুঃখ কি, তাহার তাপ কত তীব্র তাহা কাহাকে বলিয়া দিতে হয় না। শব্দী, নির্বন, বালাক, বুদ্ধ, প্রী, পুরুষ—সকলেই আপন সংসার অহুলাহে, আপন আপন কর্মনির্দিষ্ট কক্ষার কেহ সন্সার গতিতে কেহ বক্রগতিতে এই দুঃখেরই আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য ধাবমান হইয়াছে। সন্সার কর্মভূমি, মলা চকল—এখানে সকলই অপূর্ণ, অভাবগত। তাই আপন অভাবমোচনের জন্য ঈশ্বরিভক্তকে লাভ করিবার উদ্দেশে সর্বত্রই একটা উন্মাদময় স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে যেখিতে পাওয়া যায়। অতি ক্ষুদ্র পরবাসীর কল্পন হইতে অতি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের আলোড়ন পর্য্যন্ত এই একই প্রেরণার অধীন। তাই দুঃখ সকলেরই অতি পরিচিত জিনিষ।

কিন্তু দুঃখের অবসান কি হয় না? শান্তি কি একেবারেই হ্রাস? জগতের নিকে দৃষ্টপাত করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর চিত্তা করিলে অবশ্যই বলিতে হয় যে দুঃখের বিদ্যমান আছে, শান্তিও একেবারে অদৃষ্টিচর নহে, কিন্তু একথা সত্য যে এ শান্তি পূর্ণ নহে, আংশিক মাত্র। ইহা দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক বিদ্যমান নহে। যৌর অহুলাহর নিশীথে, মেঘাচ্ছাদিত গগনমণ্ডল হইতে কলপ্রভার কলিক প্রকাশে যেমন বিদ্যমানের আনন্দ লাভ হয় না, তদ্রূপ

তাহাতে দৃষ্টির লব্ধে অহুলাহর আনন্দ লাভ প্রাপ্ত হয়, সন্সারের লব্ধিহীন অহুলাহর শান্তির আনন্দও তেমনি। বক্রগতি হইতে কামনার ভ্রম নাই, সন্সারের উন্মাদতা নাই, চিরানন্দের অবতাস নাই—সকল সাময়িক এবং আংশিক দুঃখ নিরোধ মাত্র আছে। ইহা চাপা অবস্থা, উন্মুক্ত অবস্থা নহে। রোগের ব্যাধিতে অকৃতিত্বের উপশমে যে প্রভেদ সন্সারদৃষ্ট শান্তি ও ব্রহ্ম উপশমের মধ্যেও সেই প্রভেদ।

এই দুঃখনিরুক্তি কি প্রকারে সম্ভবপরিত ভাবে হইতে পারে তাহার উপায়াদির বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা বর্জন পাঠের উদ্দেশে। বর্জন শাস্ত্র যুক্তিপ্রধান। অপরোক্ষ ভাষায় বর্ণন সত্যের অহুলাহি হয়। তখন তাহাতে সন্দেহের উদয় হইতে পারে না। তাহার এইভাবে তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়াছেন তাহারাই ঋষি বা বোগী নামে অভিহিত। তাহাদের উপলব্ধি তাহার সহায়ত প্রাপ্ত হইলেই উহাকে আগর বলা বাইতে পারে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ অথবা আশ্রয়কে জল সাধারণের পক্ষে কিয়ৎংশে বোধগম্য করিতে হইলে উহাকে বুদ্ধির দ্বারা সজত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু চিত্তবুদ্ধির সন্সার অহুলাহে কতি সকলেরই পূর্ণক পূর্ণতা তাই বুদ্ধির কোন অভিভাবকি পাইয়া বাক্য না পরিষ্কার অহুলাহি ও সন্সারের

শক্তির স্বরূপ বিচারে যথেষ্ট প্রকৃত শক্তি।
আরও ইহারই নামান্তর। এই আনন্দই
জীব জায়। ইহা জীবাত্মক সংকৃত পদার্থ,
সত্যবাহন নহে। তাই জানিয়া হটুক, না
জানিয়া হটুক, যখন যে নামে হটুক, জীব
আনন্দেই আধা—এই আনন্দই তাহার প্রেমঃ
ও ঘটে, প্রেমঃও ঘটে।

ভোগ ও মোক্ষভেদে এই আনন্দ অজ্ঞান
দৃষ্টিতে বিবিধ বলিয়া প্রকৃতিতে হয়, তাই
পূরুষার্থও দুই প্রকার। ভোগ ঐচ্ছিক ও
পারজিক দুইপ্রকার—ঐচ্ছিকভোগ আবার
কামিনী (কাম) ও কাঞ্চন (অর্থ) এই
দুই ভায়ে বিভক্ত। পারজিক ভোগ এক
প্রকার (ধর্ম্য)। এইভাবে সাকল্যপূরুষার্থ চতু
বিধ—ত্রিবিধ ভোগ অপর পূরুষার্থ, আর মোক্ষ
পরমপূরুষার্থ। ইহাই প্রসিদ্ধ চতুর্বর্গ সল।
ইহার মধ্যে ভোগাত্মক আনন্দ বিনশ্বর, মোক্ষ
নিতা। একটি হেয়, অপরটি উপাস্যে।
যেখানে ভোগ্য সেখানে মোক্ষ নাই, যেখানে
মোক্ষ সেখানে ভোগ নাই। বুদ্ধি ও মুখ্য
পরম্পর, বিরুদ্ধ—ভোগ ও মোক্ষও বিরুদ্ধ।
একাধারে যুগপৎ উভয়ের সমাবেশ সম্ভবপর
নহে। বিশেষতঃ ভোগ অজ্ঞানমূলক। মোক্ষ
জ্ঞানমূলক—সুতরাং উভয়ে সমঞ্জসা নাই।
যোগশাস্ত্রে এই জ্ঞানই বিভূতিকে কেবলমাত্র
অস্তরায় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

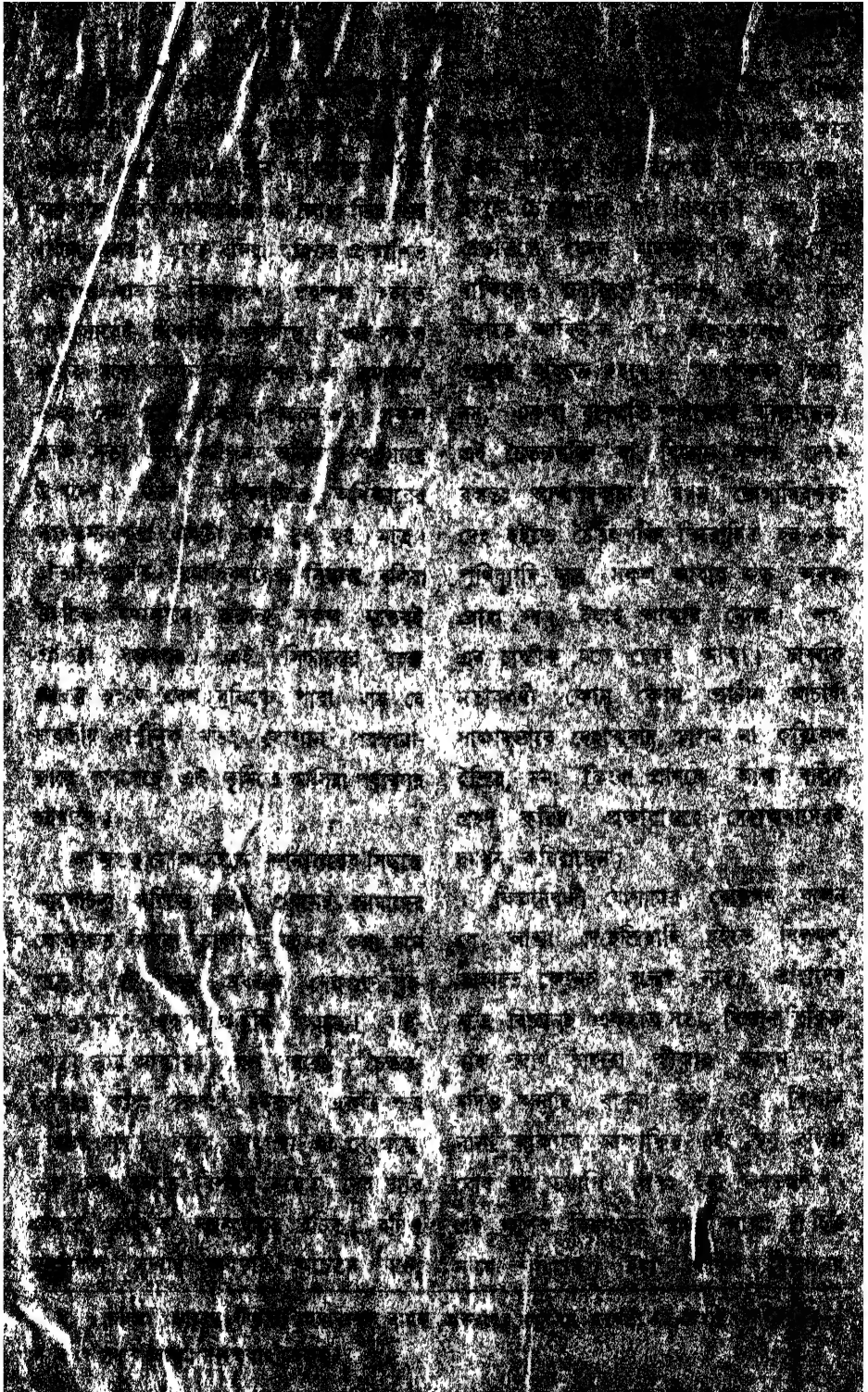
সত্য কথা। কিন্তু আগম বলেন ইহা
চন্দ্র সত্য নহে। ভোগ ও মোক্ষ একই
কালের চিরসঙ্গত দুইটি সিক্তমাত্র। যে মুক্ত

সেই মুক্ত হইয়াছে—কিন্তু জ্ঞানিন পদার্থ,
বুদ্ধিশূন্য, অজ্ঞান আধার ভোগ ভোগার?
যে আনন্দবিশুদ্ধ, প্রতিবিম্বময় পরিভ্রমণীয়,
যাহা ইচ্ছাশক্তি কল্পমাত্রকে যে ভোগসামর্থ্য
কোথায় পাইবে? যতদূর এই ভোগাত্মক
হইতে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক সত্যমুখ হইয়া
চিন্তকপ্রবণ না হইতে পারিলে পরমার্থভোগের
আনন্দান পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র সত্য
চিন্তাধারী পরমার্থতঃ জ্ঞান ও চৌকি,
জিহ্মবনী এবং আত্মব্রহ্মপূজা সত্য শক্তিই
একমাত্র ভোগ্য। সত্য সত্য ভোগ্য ও
ভোগ্যে কোন ভেদ নাই, কোন বারহান
নাই—“ভোক্তব্য ভোগ্যরূপে সমস্ত সর্বত্র
সংস্থিতঃ।” নূলে একই স্পষ্টকায় স্বত্ব
*(মাতৃস্বাতীত) অশ্বিন ভোগ্যেতৎ
প্রকাশ ও বিমল অথবা শিব ও শক্তি এই
উভয় অংশের সাম্যরূপে বিরাজমান জ্ঞানেন।
তিনি নিত্যমুক্ত, অখণ্ড নিত্যধর্ম্যসম্পন্ন।
তাহার স্বরূপের আভাসত পূর্ণাহস্ত্যমৎকার
বা আনন্দানন্দ। স্মৃতিপারিতোষে আচার্য্য
শঙ্করকেও এই স্বকৃত্যকে মহাবিকৃত বা
পারমার্থিক বলিয়া বর্ণনা করিতে হইয়াছে,
এ কথা আমরা ভুলিকার গোচর্য্য করিয়াছি।
অতএব বাহ্য মানবের পরমপূরুষার্থ তাহা
যে একাধারে ভোগ ও মোক্ষ উভয় নামেই অভি
হিত হইবার যোগ্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(২)

চিন্তাধার বরা। কি? ইহা জ্ঞানে
পারিলেই পরমপূরুষার্থের স্বরূপও বুঝিতে

+ যক্ষ কে যেখানে পূরুষার্থ বলা হইয়াছে সেখানে প্রকৃত কায় ভোগ হইয়াছে বলা হইতে হইবে।
কম্পন ও সৌন্দর্য্য থাকাই অবশ্যক ভাব্যমি স্মৃতি শব্দে প্রকৃত সিদ্ধান্ত বা বৈদিকবিচার্য্য আনন্দ পরমপূরুষার্থ হইতে
ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন।



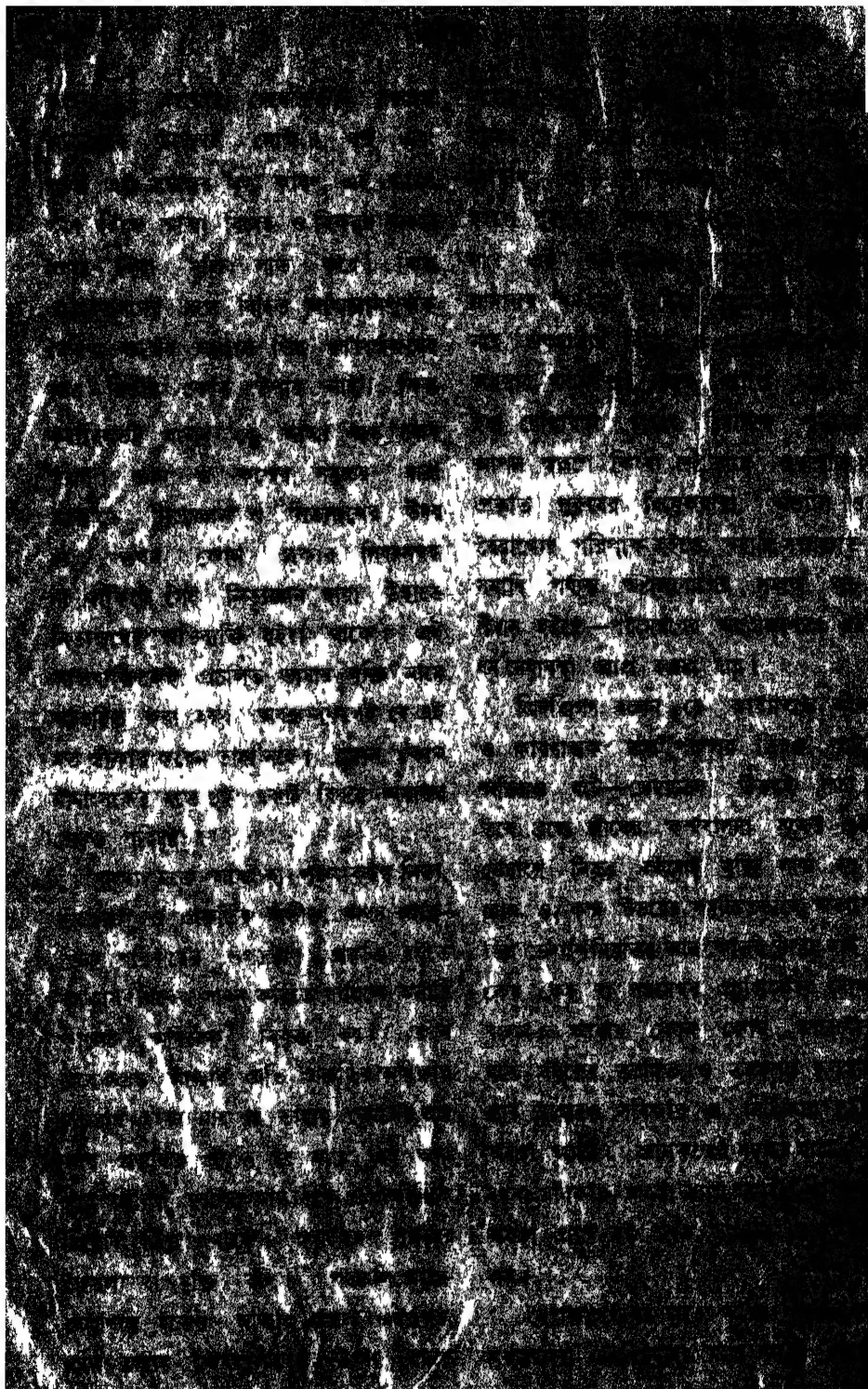
[illegible]

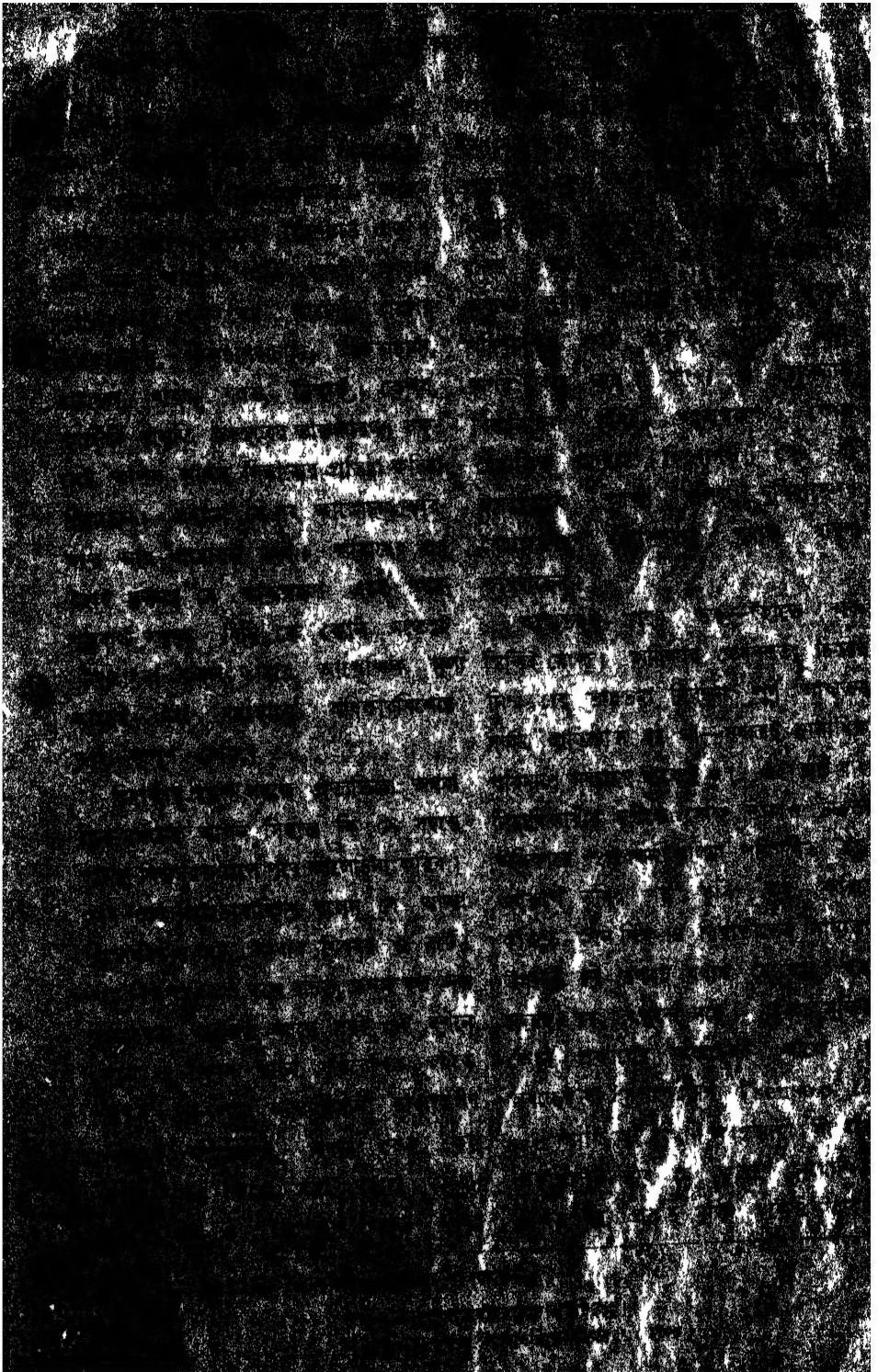
১. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবনযাপন করার অধিকার।
 ২. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবনযাপন করার অধিকার।
 ৩. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবনযাপন করার অধিকার।

१. संविधानसभा : संविधान के निर्माण के लिये गठित
 २. संविधानसभा : संविधान के निर्माण के लिये गठित
 ३. संविधानसभा : संविधान के निर्माण के लिये गठित
 ४. संविधानसभा : संविधान के निर्माण के लिये गठित

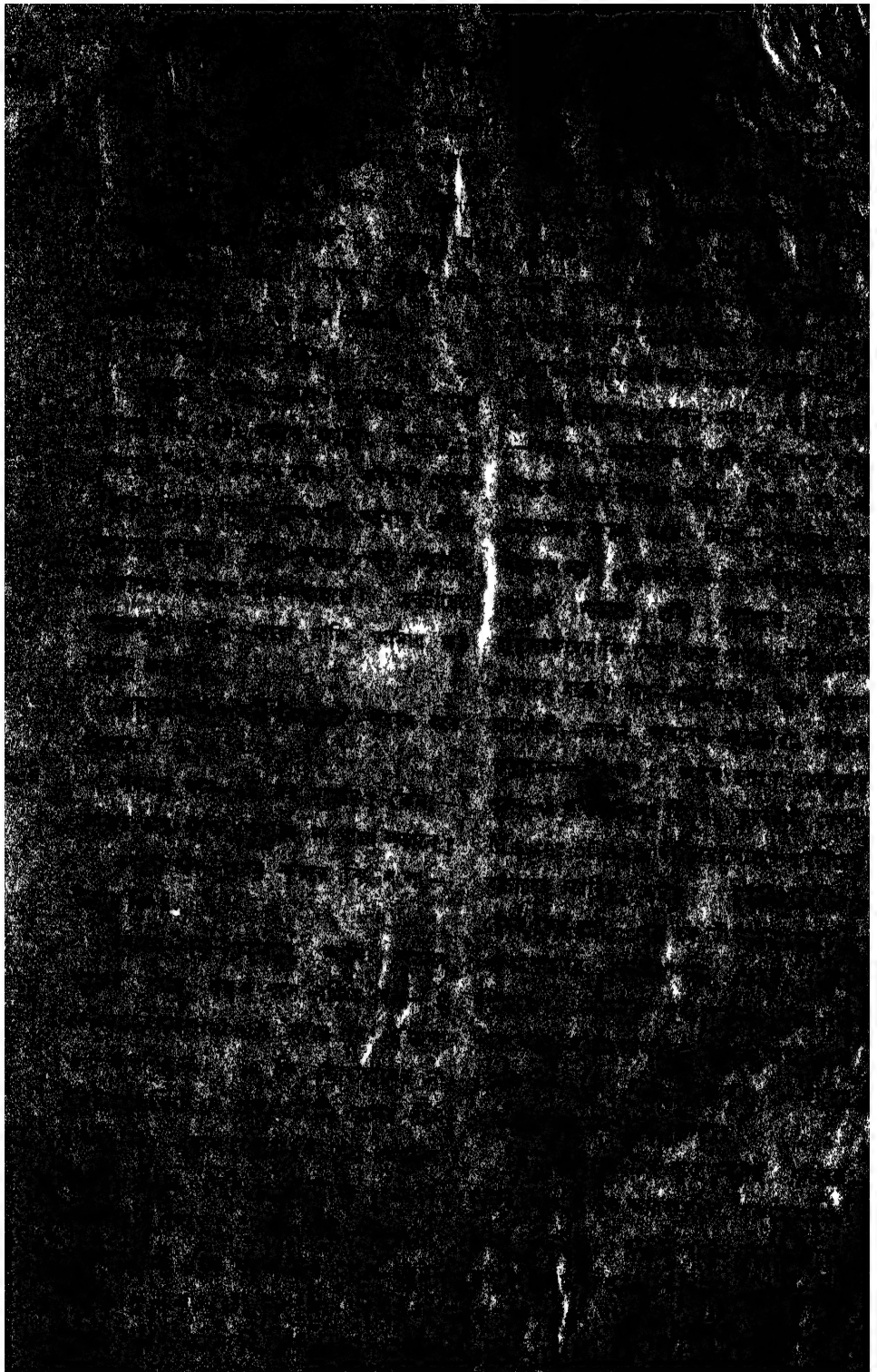
[illegible][illegible]

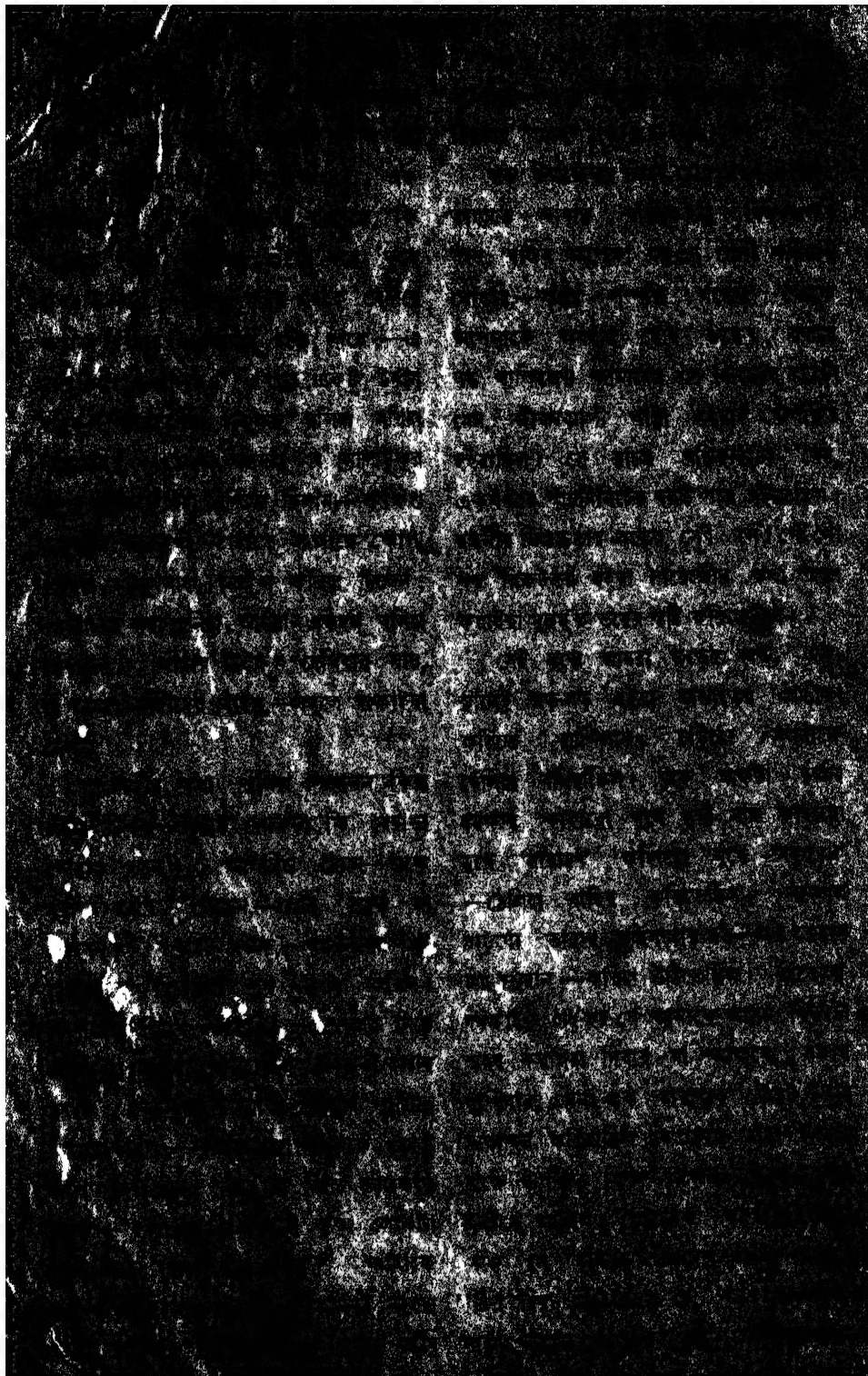
১৮৮১ সালেই প্রথম প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, গ্রীস, ইত্যাদি দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। ইংল্যান্ডে প্রথম প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল। ইংল্যান্ডে প্রথম প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল।

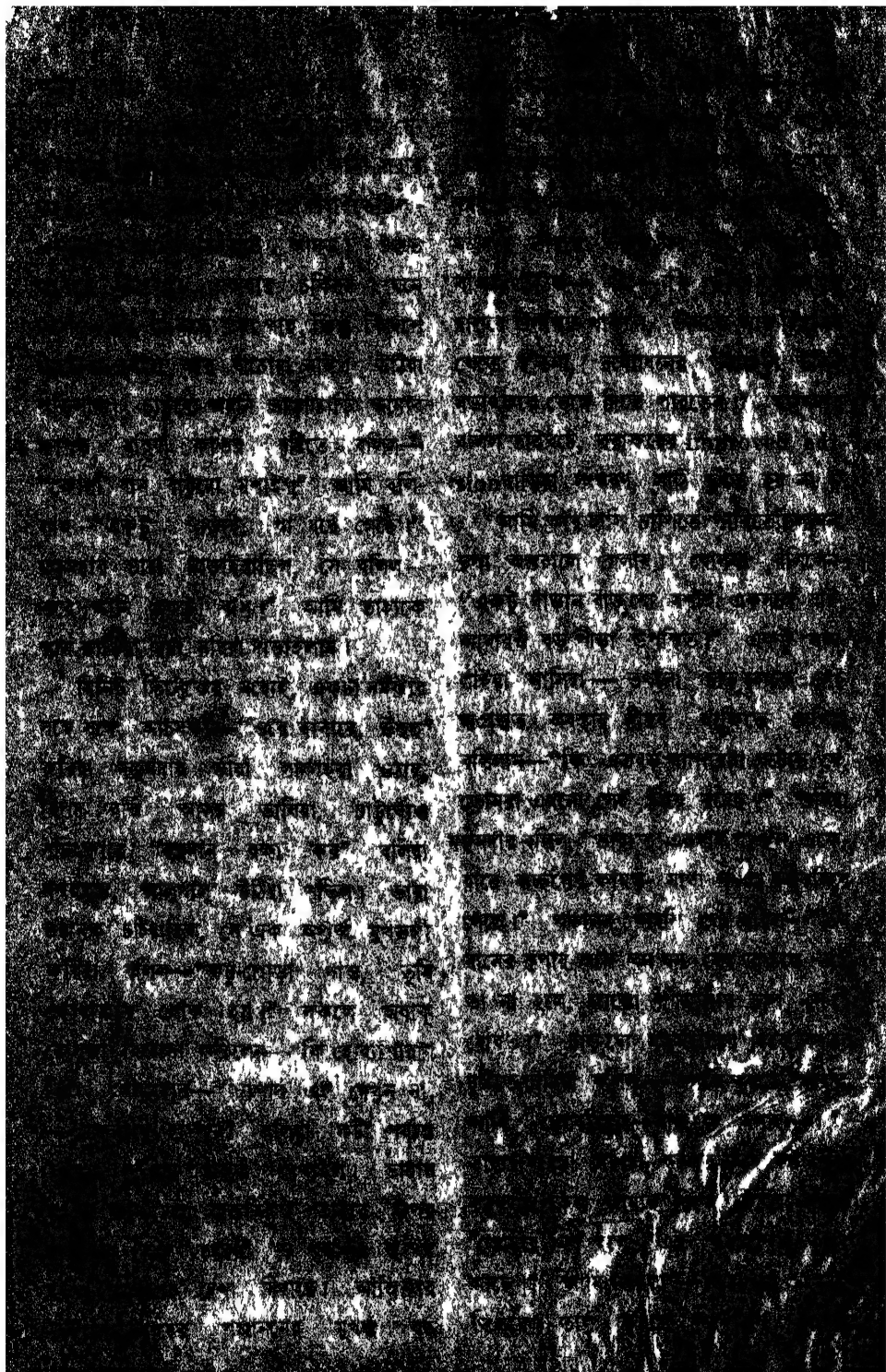


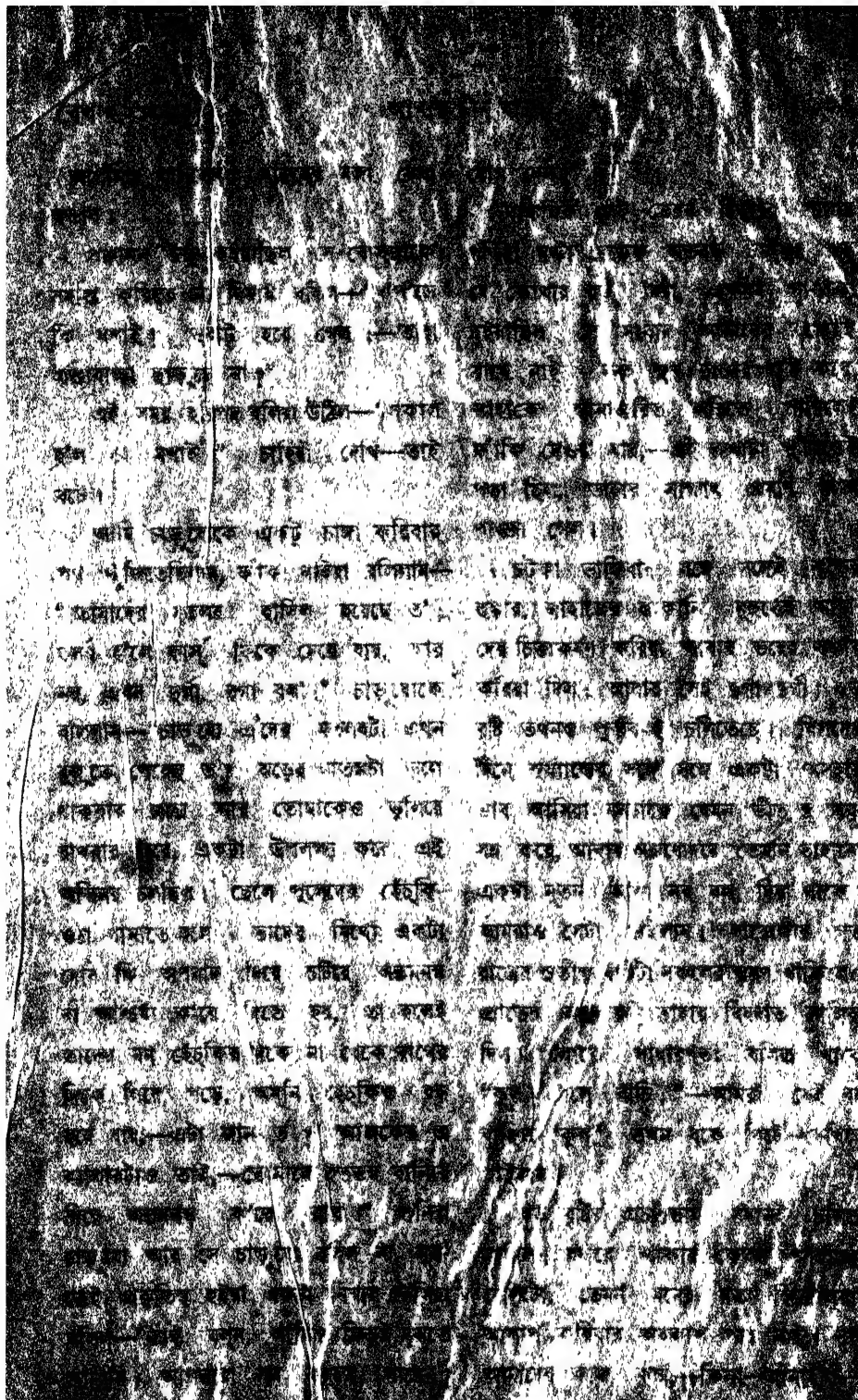


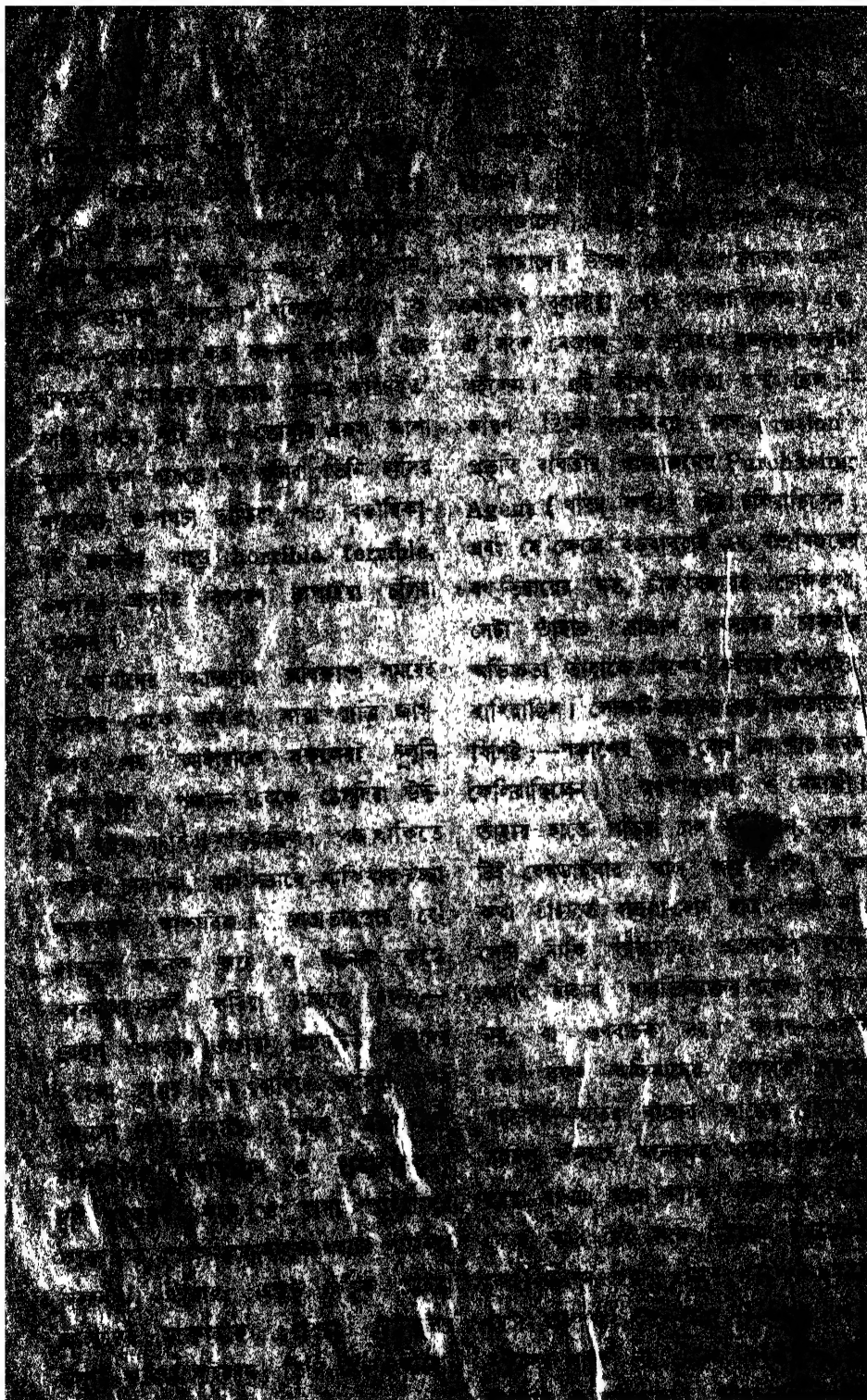












আবল দেশ

[শ্রীকামাখ্যানন্দন বসু সঙ্কলন]

কোন সন্ধানের অসীম রেখা দিয়ে আঁত ঘেঁষে রাণী
নীলের পারে নীলের চানে সীরা ভোমার অক্ষয়ানি ।
আকার কোড় কোড়ি জোমান বাগমাণের বৈভব ঘটেছে
সেই স্রোতেতে চন্দ্র মাথা— ভোমার বুক ভাঙে ফটেছে ।
অসীম কোড়া মোর ভূমি অগারি কপল প্রোতদিক
চন্দ্র তারে নেচে ঘোরে ছুঁড়ি আঁতে কক্ষয়ানি ।
জাহাঙ্গীর ভোমার কোণে বসার একটি পদ লক্ষ্যী মেয়ে,
কতি কি তার ভোমার পাশে—সব ভেঙ্গেছে আঁতে ভেঙ্গে :
অশ্রু সে যে চাইছে সমস্ত কোকিল কোল চাইলে মেয়ে,
চন্দ্রের ছেলের চাইতে ভাল মেয়েও নং একটি মেয়ে ।
শিখার ওপরে লক্ষ্যী-বাণী কপ সাংঘাতী নীলাম্বরী
জাহাঙ্গীরের এই কথাটি—ওরে ভোমার পাশে মসি ।

আবল দেশ

[শ্রীকামাখ্যানন্দন বসু সঙ্কলন]

জাহাঙ্গীর প্রচুর এ মকরান্দ বনে
পারস্যের সাগর বেলায় ।
কি স্রুতি গাণিমা ওঠে তখনই মনে
কোন অশ্রু অশ্রু ভোমার ।
নসি স্বাম শল্যোপরি প্রাকাকুষ্ঠ তলে
কীর্ণকায়্য নররের পাশে ।
চোখ থাকি স্বপ্নাতুর দৃষ্টিখানি নেলে
সমস্তগে শূন্য-গর্ভ ভাসে ।
হায়, আবরের তরী! ফলে বসেছিলে
এই ঘন জীবন ছায়ায় ।
প্রথম নদের বিয়া কেমনে করিলে
কোন বৃগে—বিল ভা' জামায় ।
সেই স্বপ্ন-বুকে নিয়ে আঁহুও'জনে একা
কাটে মোর দিবস শরীরী ।
জোয়াহরী রাতে ভেঙ্গে থাকি, যদি লাই দেখা
—কুণ্ডলি নারি । আবরের শরী ।

[illegible]

3. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839

[illegible]

ধন্যজন উপায়ে আদিত্যের আশিক, যাকরের সৌম্য আদিত্য
আর সিন্ধু নদ, এই মনে করো অতিথি তোমার বসতি
চৌদিকে ঘেঁটে গরাজের সৌন্দর্য—নন্দনর রোমের রোম
আর মাঝখানে প্রবাহের সিন্ধু স্রোতের অদ্বৈত স্রোত
আনি করো প্রাণে একই মনে রাখো যে, তুমি মন
জুগ্ম-দানবে দ্বন্দ্বের করো বোধে যে, তুমি মন
আনি মন এই ছটি কেউ গান হইতে পারে না

অন্ন বস্ত্র সমস্যা ।*

[আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ।

প্রকের পণ্ডিত মহনমোহন মালব্য আমাকে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের Hony : professor কোরেছেন, কয়েকই বছরে এক বার কোরে এখানে আসতে হয় যে কয়েক গত বছর ছাড়া উপর উপর কয়েক বছর আমার কাশীতে আসা ঘটেছে । বরং বোনো বছরেই আমার তাগে এমন সুযোগ ঘটেনি । আজ কাশীতে এই রকম একটি দিবাট সভায় বিশেষতঃ মহিলাগণের সামনে আমার বক্তৃতা দেবার সৌভাগ্য ঘটেছে বলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি ।

আমি এই কয় মাস ধরে আমাদের অন্ন-সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করছি । বাঙ্গালী ভারতের মধ্যে অনেক বিষয়ে অগ্রণী—আপনাদের মধ্যে অনেক জানেন যে একদিন প্রাচ্য-মহাদেশ মহানভি গোথলে বলেছিলেন “What Bengal think to-day, whole of India thinks it to-morrow.” অর্থাৎ বাঙ্গালী যা আজ ভাবে সারা ভারতবর্ষ কাল তাই ভবিষ্যতে আরম্ভ করে । কিন্তু অন্ন-সমস্যার ব্যাপারে বাঙ্গালী দিন দিন হ’তে যাচ্ছে । কলিকাতা বাঙ্গালীর রাজধানী বাঙ্গালার মঞ্চের মধ্যে উহার স্থান—কিন্তু এ ছেন সহরে বাঙ্গালীকে আজ কেবল, অথবা বুলমাটির ভিন্ন জন বশে দেখবার সুযোগ

ঘটে না । পৃথিবীতে বাঙ্গালীর মত এমন দুঃখী—অনশ্বরকিষ্ট, মা-লেবিয়াগ্ৰস্ত, দারিদ্র্য-প্রলীড়িত জীব বোধ হয় আর কোথাও নাই । এক জন তাদেরই অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেছেন—“the most pitiable condition in the world.” হিন্দুরা অন্ন-সমস্যার পাথে এতদূরে—আমি ভরজীর্ণ, তুর্ভিক্ষের কবল গ্রাসে কবলিতে ।

যেমন অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যাও তিক্ত হেয়মন্ট হাঁড়িয়েছে । আমি আজীবন বিজ্ঞান চর্চায় কাটিয়েছি । আমি যখন Laboratoryতে কাজ কোত্তে থাকি তখন বাইরের সমস্তই ভুলে যাই কিন্তু বাঙ্গালার আজ অন্ন ও বস্ত্রের দৈন্য দেখে আমি আর বিজ্ঞান আগারে থাকতে পারিনে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে ।

যখন মহাত্মা গান্ধী সকলকে চরকা স্বতো কেটে কাপড় তৈরী করে পরতে বললেন আমি তখন যুধ কোঁতুক পছন্দের করেছিলাম ; আমি কল-কারখানার অভিজ্ঞতা নিয়ে সে কথা হেনেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম এখন আমার সে ভুল ভেঙেছে, আমি এখন মনে করি যে চরকা অসাধ্য সাধন কোরে পারে । আপনারা এই যে চারদিক দেখছেন এটি আমার গ্রামবাসীর বুনে দিয়েছে ।

আমি আমার খামবাসীদের বেওয়া এই
চাঁদর থানি এই ওজনের সোনার চাইতে
বেশী লাভী মনে করি।

গত বৎসর আমার একজন আত্মীয়
ছাত্র ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র খোদা ১০০ টাকার
গেজের চাকরীর মমতা খুলাব বস্ত্র ব্যবসায়
ক'রে এই চরকার মশাব্রতে দীক্ষিত হয়ে
ছিলেন। তিনি আজ কাল গ্রামে গ্রামে
গিয়ে কোথাও ৮ মন কোথাও ১০ মন
কোথাও ২০ মন কোথাও চব্বি কান্ড হুতো তৈরী
করছেন আর তা থেকে কাপড় তৈরী কোরে
গ্রামের বজ্রাভাব দূরীকরছেন। প্রায় এক
শত বছর আগে আমাদের প্রাচুর্য শাশী
খোলা প্রস্রববে কেন, বিদেশের কোটি
কোটি টাকার কাপড় চালান হতো। সে
ব্যবসায় গেছে, তা'তে আমাদের দেশের পিস্তর
শাছে; আমাদের দেশের লোক তা কোড়
দিনে বিলাতী সস্তা মাল কিনে পাত্তে
লাপুলন আর সব তাঁতী ছোলা তাপান
কোত্তে লাগলো। শাঁরা তাদের চরক
পল্লীকে নিজেরাই দূর বোঝে দিয়েছেন।
এখন Manchester কাপড় না পাত্তে
বুঝি বা দিগ্বন্ধ হ'তে হয়।

আজ কাল কেবল কাপড়েই ভারতবর্ষ
থেকে ৬০ কোটি টাকা বিদেশে যাচ্ছে আর
তার মধ্যে বাঙ্গলা থেকে প্রত্যেক বৎসর ২০
থেকে ২৫ কোটি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। আমরা
এক একখানি বিলাতী কাপড় কিনছি তাতে
ক'রে আমরা প্রত্যেকবার ছ'টা ক'রে টাকা
যেন মশিঅর্জার কোরে বিব্রতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।
কিন্তু এই ২০ কোটি টাকা বিদেশে না পাঠিয়ে
ঘরে রাখতে পারা যায় তা'হলে আমাদের ২০

কোটি টাকা প্রাতঃ বছর থেকে যায়। এই
২০ কোটি টাকা ক'রে ব্যবসায় গেলে অল্প
সিকার কাপড় দেশেই তৈরী হতো হয়।

প্রথম ক'রম একজন লোক এক খণ্ড
১৫ কোলা হুতো কাটতে পারেন। এক
জনকে এক খণ্ডের দ্বি-তুল্য সস্তা হুতো
তোলা পূর্ণায় কাটতে দেখেছি। এক ঘণ্টা
কোরে ১০০ কাটতে পারেন। ৪৫ তোলা
আর এক বছর ১০০ হুতো হুতো হয়।
১৫ পো হুতো এক খানা কাপড় হ'লে
১০৮ ছটাকে ১৮ খানা কাপড় হয়। তা'হলে
দেখা গেল এক জন লোক রোজ এক ঘণ্টা
চব্বি চালান এক বছরে ১৮ খানা কাপড়ের
পরিমাণ হুতো অনায়াসে কাটতে পারে।
একবার হাত এলে স্বচ্ছন্দে সস্তা হুতো তৈরী
করা যেতে পারে আর তখন ঘণ্টায় হুতোলা
১০০ হুতো বেশ সহজে কাটতে পারা
যে। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট কোরতে হবে
তার সব আপনি মনে রাখে।

আমাদের হিন্দু সংসারে প্রায়ই ২১ জন
বিববা থাকেন তাছাড়া 'দিদিমা' 'পিসিমা'
'মাসিমা' ও আর আর অনেকেই আছেন।
তানা যদি চব্বি করেন জাতলে তাঁদের আর
পরের গলগল হয়ে থাকতে হয় না আর
দেশের টাকা বাচিয়ে কতকটা দেশের সেবা
করতে পারেন—পরীষ দেশও বেড়ে যায়। আমি
হিন্দু এইখানে সমবেত দমস্ত হিন্দু মহিলাদের
আমি এই বোলে অনুরোধ করছি যে
আপনারা প্রত্যাহ অল্প অল্প এক ঘণ্টা চরকার
হুতো কেটে তার কাপড় তৈরী করে পারেন।
আমার অনুরোধ দেশ বাহুকার অল্পে বিলাতী
কাপড় আর পৌর্কেন না।

গামের মধ্যে এমন এক লোককেও অনেক
কক্ষীয় একটাই নিঃস্বামী পাড়া দ্বারা নাক
এই বর্ষের জমীদারী আদায়ের সময় বাপাদের
গাছ লাগানো। এই বাপাদের গাছে প্রথম
বছর প্রত্যেক গাছে একসের পাত্রে তিন সের
পাণ্ডা তুলে দেয়। এই রকম ১০০০ টি গাছ
কাপাদের গাছ পুঁততে পাণ্ডা তুলে দেয় আর
অন্যটন হ'ল না। ১০২০ টি গাছ কাপাদের
গাছে প্রথম বর্ষের পাত্রে তিন সের পাত্রে
লোক পুঁতই কম দেয়। যদিও এই গাছ
শাপনা বনবন লাগবে একটি চাবকা। এই
রকম করে স্বজনে আপনাদের গাছ লাগান
হাঙ্গলীস পরিষেয় বড় নজর দিতে প্রস্তুত
করতে পারবেন।

কবি বলেছেন—'না জ্ঞান, না শক্তি, না ধর্ম
লগন। এ ভাবনা আপনাদের জ্ঞান, শক্তি
অন্য আপনাদের প্রতি আশা। এরা এক
নিবেদন যে আপনাদের চরিত্রের জ্ঞান, শক্তি
আপনাদের উপরেই অর্জন করা যায়
করছে—এই চরকাব প্রচার।

এখন কাপড় দাবা বুনবে—জেনে যা
তাই তারা চরকার প্রত্যেক প্রথম প্রথম
চাইবে না সে জেনে আপনাদের কাপড়
কাপড় পরা একেবারেই বজ্রন বেড়ে হবে।
বিলাসী কাপড় দাবা, বিলাসী স্বতোর কাপড়
তাই। আপনাদের কাপড়ের প্রতিক্রিয়া করুন যে
মাগের নামে বিলাসী স্বতোর কাপড় অবি
শেষকেন না। এই চরকার স্বতোর চাকায়
আসিন হয়েচে, শুধু হাত আসা চাই। আর
কই করে কিছুদিন একটা মোটা পরা চাই,
পরে হুন্দর মিহি কাপড় এই দেশেই চরকা
আর তাতে তৈরী হবে। আমি মহাশয়

গামীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছি যে অবশিষ্ট
জীবন বাঙ্গলার ঘরে ঘরে চরকার প্রচলন চেষ্টা
বর্ধাই। এত বাজের মধ্যেও তিনি আমাকে
নিজের হাতে এতখানটা খব বড় চিঠি
লিখেছেন তাতে তিনি বাঙ্গালার রমণীদের
অন্য প্রশংসা করেছেন। মহাশয় জেনে
লাবাব পক্ষে সমস্ত ভারত বর্ষীকে ঘরে ঘরে
কই চরকা লাগাই করতে বলেছেন। এর
মতো বাগানী ক'বুই নেই—যেমন নিজের
জেনে বড় নিজেদের দেশের কবি জেনে দেয় দিয়ে
ক'বুই বানিয়ে দেন। আমি ক'বুই দিয়ে
এই চরকার প্রচার করিনি। নিজের গাছের
কাপড়ের নিজের হাতে বাপ কাপড় দেন নিজের
কাপড়ের কাপড় বর্ধাই করে দেন। কথা নেই।
আমাদের কাপড় বর্ধাই কিছু বর্ধাবার নেই।
শ্রম আমাদের ঘরে, আমরা তাই বোন পুজনীয়
চরকারে আমরা বর্ধাই শুনেচে এসেছেন, ঘরে
এই আমাদের বর্ধাই কটা একটা ভাববেন,
আমি আর কই বলব। আমাদের নিস্তা হবে
নাচবে? আমি দেখি বাঙ্গলার গামীতে
পল্লীতে হাত পাটা ঘুম, হাতের কাল পরানিলা,
পর চুল্লা এই রকম কোরেই ত আমরা সময়
কাটাই। বাঙ্গালী-স্বতোর অবসর আছে—
জানেন? চূপ করে থাকলে চপবে না
তাদেরই এখন জাগতে হবে, কখনও হবে
হবে। এই জাতীয় জাগরণের দিনে দলাদলি
হলে চলবে না ছোট বড় সকলকেই দেশ-
মাতৃকাব সেবায় ধাক্কা দিতে প্রস্তুত
করতে হবে।

মায়ের অধিকার

[স্মিটাকশশী বন্দোপাধ্যায়]

(১)

"নাও, বরো ভাই, একবার কোলটা
সার্থক করো।"

একখানি ফোলাপী ঢুকটিকে তেঁতুলের
উপর শোয়াটায় অপব্যয়িত করে গুহাফ
নাকিয়া বড় শখা অপরায় ঘর্ষণের পর
তোকেকে "আমরা" বন- যত্নের পোষ
বিয়া দিতে গেল, "নাও" একবার বিশুদ্ধ
করণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে দেখে না হইয়া
দাঁড় থাকিতে পারিল না— "কখনো, কখনো
হাসিয়া কহিল, "ঐ তথ্যে দাঁড় মন পাত
পাতের।"

"শু বাপেরো! আর মনে মাঝে মাঝে
পেড়ে তো মাকে—" "মিষ্টান্নের কলমে মাঝে
মাসে মাঝে মাঝে—" "এমন নিত্য নিত্যের মতো
তো, মাঝে মাঝে সে তো ছেলেবেলা, তেঁতুলের
গন্ধন চোখের জলে কখন কখন মাসে
হবে।"

"না দাঁড়, মিন্—"

"পেটে একে মুখে পাজ কেন? 'ঐ'—
নাও, এহ আমি অতীতকে মুখ ফিরিয়ে আছি"
—বালয়ই মাকে ডাকিয়া কহিল, "আ মা,
তোমার জামাই কেমন নাকি নিয়ে এসেচে,
একবার দেখবে এসো গো।"

"না দাঁড়, মিন্—"

"আহা! নাও, ভাল কোরে ধরো, পেড়ে

নাও,—ডেকে গড়াতে গেল, "নাও জামো
নাও"

নাও! কহিলেন, "জামো, বাঁচাইকে
আর কষ্ট দাঁড়—" "কেন? যে এম প—" "মিন্"
বপাল দে আঁখি হাঁপে হাঁপে "আঁখি"
পারিলি। কমলুই জামের ছেলেমাঝে, "ওঁর
দেখার ছেলে" "কত ভাল বোধে, এই সেহের
কোলে মনে তেঁতুলে পুণ তথ্যে—" "এই মধ্যে
তো—" "নাও" "তুইই" "নাও" "এই
আমার ভাগি" "নাও" "কখনো, কখনো
খানিক কখনো, আঁখি" "কখনো" "আর মুখে
উঠবে না।" "আমি" "এই" "কখনো" "নাও"
"বে" "কখনো" "নাও" "কখনো" "নাও"
"নাও" "কখনো" "নাও" "কখনো" "নাও"

অল্পপূর্ণা কহিল "দাঁড়, কি—" "কি—" "কি—"
বাপেরো! "কখনো" "কখনো" "কখনো"
কখনো মাটি, একটু ছোট বাঁচো—" "কখনো"
"নাও" "কখনো" "কখনো" "কখনো"
একজন "কখনো" "কখনো" "কখনো"
কখনো টাইট, "কখনো" "কখনো" "কখনো"
কখনো কখনো "কখনো" "কখনো" "কখনো"
কখনো চালিয় দিল—" "কখনো" "কখনো"
গরিবানা তো ছেলের মাথাখানা দেখে একটু
যেন ভয়ই পেরেছিল—আবার থেয়েও যে বড়
জিদি "কিনা" উঠতে বললে উঠবে না, "কখনো"
বললে কখনো না—এই যদি "কখনো" "কখনো"

একটু উঠে হঠে চলাফেরা করছে, তাহলে
কি আর বাঁচাছুটো অবশি নিনে। তা, এই
তো প্রথম, ত্বিই বা এমন সময় নিরেছে?
কতলোক অমন সাতদিন ঘিঁধিনে, আশ্বাসে
তো রেহুর লো—

“হয়েছে তো দিন, এইবার নিন্।

“না রে, যাপ। একটু ছেলে নিয়েছে
তো এই নাকবান্নে খসে থাকে। পাও,
যাপের কাছে যেওনা পোক। অমন যাপের
কৌশলে যেতে হই, যেমন আচ্ছা, না
পোকাব নামেও নাকবান্নে আবার আতঙ্ক
চোখা আছে। আর, ক্ষণিকের হাত লাবা,
তুই যেমন এম কত কিচিৎ বেগে দেবে,
আতঙ্ক চোখা তো আকোছো। বন?”

কোন কানিয়া উঠিলে অমূল্য কতিন,
“অ বন, এম কত কিচিৎ পোকাব কিচিৎ
পেরেছে।”

যাপের যাপ পোকাকে কতটা হাইতে
নাকবান্নে কতটা কহিলে, যদি কোন কি, একটু
পাখটক হই।

“কেন না হয়েচে না?”

“যাপি কি সকলের সমুখে দেবো নাকি?
না, এম হাইতে?”

“না, এম হাই দিচ্ছা বন?”

“আচ্ছা, দেখা য়া, ন লো দেখা লাবে।
যখন কেনে কচিয়ে উঠবে তখন কোথাক
তেবে পোকাব থাকে দেখে নেবো। অম
দেখিলে, আচ্ছা কতদিন যাপ দাঁতিনকে পেরে
ছেলেটার দিচ্ছা হাতে একটু জাকতে যেন
কলিননি।”

“অকুই যদি মায়া তো তুমিই শুকে নিয়ে
যাকো না।”

“দারি হাইতে?”

“কেন দারিবো না?”

“ইন্?”

“ইন্ আবার কি?”

“আচ্ছা থাক, এখন তো নে, বড়
কানছে।”

“তুমি একে এখান শুয়ে দিয়ে যাওনা।

“আচ্ছা, এই নে।”

কমলা তাহার কোলের কাছে শুইয়া
সমিজের বোতাম খুলিবেই অমূল্য হই।
দোবটা মুক্ত করিয়া দিয়া পলাইয়া গেল।
হাইবার সময় যতীনকে বালিল, “কই, ঐ দূরে
যাও—নিশেষ দরকার।

“কেন?”

“আচ্ছা, যাগে যাপ তো জাপের, কেনও
উৎস পাও।”

“যাপি বো এম নে বেশ মায়া।”

“যাপি কি বলছি দক্ষ দ্যাক, আমার
এম এম কচিৎ আচ্ছা—যাপি। অমূল্য
যতীন উঠিয়া কমলার খাপ দেবে। সে যাপের
কপড় টানকে টানতে বাতির হইতেছে
দেখিয়া কতিন, “কানছে যে, শুনে যাপি।”
কমলা কেনও উত্তর দিল না।

না আসিয়া কহিলেন, “নব যেন কি,
ছেলেটা অমূল্যটা বোর কানছে, একটু যেন
কানছে নেই।”

রাগাঘরে লইয়া গিয়া কমলাকে কহিলেন,
“নে, গলা শুকিয়ে গেল, চোখে কি দেখতে
পাওনা?”

“না, ছানি পড়েছে।”

“মায়াতে দারি না তো মা হইছেলি
কেন? নে দারি গির, জালিয়ে কলি।”

“আমি শারিনো।”

অল্পপূর্ণা আশিষ্য স্বিতমুখে কহিল, “নে বাবা, বাট হয়েচে, আর কখনো করাবো না।”

চোখে একরাশ জল লইয়া উঠিল। মাইতে মাইতে কমলা কহিল, “আমি কি খামল না ছুধ, না কি, যে সকলে আমার পেছনে লেগেছে? আমি নেবো না, বাও—”

কমলা চুপিয়া গেলেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “এ মেয়ের ছেলে হওয়াই বা কেন?”

কক্ষবহর অল্পপূর্ণা বলিয়া উঠিল, “তোমা-দের সবি ঘন বাড়াবাড়ি বাপু—তোমারি কোন বেড়াবড়নে ছেলে হয়েছিল তো?”

অল্পপূর্ণার শাক্ততা আশ্রয় কামনা, শ্রুতীয় কোমর ঘেঁষে বাপু আশ্রয় কামনা, এবং এখন আশ্রয় শুকে মৃদু কবেই এনো। সুরেনের মতো আশিষ্য থেকে ফেরবার সময় হলে, তুমি যাবে কখনও বেয়ান কই লো, কই জালা কোরে মতি দেখা তোর—

“এসো ভাই এসো, এই যে আমার কোলেই আছেন। ওরে কয়, এতটা আসন এনে দে তো রে? ভাল মেয়ে বাপু, কোলে কোলে শের পেছু পেছু কি ঘুরেই বেড়াতে হবে! দাখা আমার কৈদে-কৈদে ঘামঘেঁ পড়লো—নাও ভাই একবার কোলে কবো, ছুজনকার দিনখাণ আর দেখতে হবে না, সগাইট হয়ে যাক। ওরে কয়, এতটা আসন—”

যাবে গিয়া অল্পপূর্ণা কহিল, “না না, দিখে আয়।”

“তোমার শাক্ততা, তুমিই শাও না।”

ভাকতেন হেঁচক—আমি, বাবো

কেন?

“মাতৃ ভ্রমরজি হয়েচে।”

আব শের বাবা মাটা ক’ক, না হ’

“জানো হ্যা, রেবু আয়।” সেপেক কোলে করিয়া মিষ্কামা করিল, “জানো রে, ঠিক বলতো, তোর বাবা হ’লে আমি মল লাসে, না তোব মা?”

“মতিমা বাবা কেমন আদকে আমার একতা ছতো কিনে এনে দেবে।”

“তোব মা তোকে কিছু দেব না না?”

“না দেয়—মতিমা থেকে। কই? আমি কেমন কোলে কবো? পালি, আমি ওলো প্রমতি কি না?”

“তা সে হোকম, এমন আমার কথার জবাব দে—তোব মা তো তোব মা কে ক’ব গোয় না, তোব বাবোকে না?”

“না, আমার কাজেতে, দিখে দিলে মেয়ে, আমি মান কবো না, দিখে দিখে না। আমি মেতমতাদের কানে দাই—”

রেবু, নামিবার চেষ্টা করিল। অল্পপূর্ণা আসন দিতে গিয়াছিল, আশিষ্য কহিল, “নাও ভাই, আশিষ্য আসনার সময় কোলো, মাই চাকাজাকি কোবছেন—

রেবু আয়।”

“আমি মতিমাল কোতে থাকবো, কই, কাদবো না বা।”

হ্যা, তাহলে তোমার মতি আমার সঙ্গে রাখবে কি না?”

“না মা, আমি থাকবো।”

“তা, থাকনা দিদি—”

“না লো না, বাব হই জতো না মা।”

10-10-1964

“আমি হই যে, বাস্তবিকের তোর
 আমি ও কুরার সকলকে আত্মতে পারকে যেন
 বহুই।” অাম, আমন। পালাই—”

নিজেরি বয়েন তাকে অস্বস্তি ধরেছে
তাই বলে না কেন।”

কমলার ছিকট। জেং নাড়িয়া, দিয়া
কমলার কহিল, "জাহ্ন। বলি ভাই, রাতে
কমলার একট মেরিল।"

সন্ধ্যার সময় আকিস হইতে অশ্রুস্রা
সন্ধ্যার কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে ডাকিলেন,
একবার এনিকে এনো তো মা।

কমলা আসিতে কহিলেন, “ঐ বাগানে
যাড়া দাঁড়াইরের জন্তে বাজার যুজ্জ্ব তুলে
গেলি। দেখো কেমন হলো?”

"आपके लड़के हैं।"

“আজ্ঞা, তাই থেকে দাও, গম্বুজটা
করেছিলে তো?”

100

ইলীয়া কোথায় ?

सुखानन्दे विरिञ्च कथम् बलिम्, "आनि
आनि।"

ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା
 ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା
 ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।

“আমি বিবাহ করি না—তুমি এখন
করো না—তুমি কবে করবে বলছিলুম।”

১৯৮০ সালের ১৫ জানুয়ারি
 ১৯৮০ সালের ১৫ জানুয়ারি

[illegible]

प्रीति - प्रेम - प्रीति - प्रेम - प्रीति - प्रेम

प्रादेशिक विकास योजना

ଆମ କେଶବନ, ଯେଉଁ ଶେଷବାର ବୁଲିବା ନା, ସେହି

निम्न राशीतः किं निम्नवारे ज्ञेय एवम् आसि

এখান থেকেই বিজয়ন কলকাতা কোয়ে।

এখানে থাকতে তোমার কোনো কি সমস্যা

হোতে পারে ?”

"ना, आपल्लि किजेव ?"

"তাতে নিশ্চয় বার, কানাই আর ছেলে

—ତଳାଂ ତୋ ଦିଲ୍ଲୁ ନୟ । ଆସି ଓ ବଡ଼

শালবামি। তা, কিছু দেখেছে কি?

Journal of Management Studies, 19(1), 67-80.

“आज्ञा, बुद्ध शानिकटः प्रकाशः साधनः”

বেড়িয়ে এসো।”

সোনামিনী কহিলেন, "আমি খোকাটক

দেখচি, তুই যা, যতীনের বিছানাটা একবার

উত্তরে বলে নে।”

"दुर्मिहं शास्त्रना।"

‘তুই কি এখানে চুপ কোরে বসে বসে

শু. আচনের চাবিকাঠি খোঁজারি

धर्मवाद विद्यायाः कर्तृत्वेन, "विद्यायाः, वि

1945 9"

"इदं आचारं किं ?" नेत्रोत्पलकं च देहस्य

उत्तर, यथोदय

वि. नि. प्र. प्र. प्र. प्र.

1000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100-443887-100

1970

14-00000

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম দিকেই—একটি
স্বাধীনতার এই স্বপ্নের প্রেরণা দিয়েই—আমরা
একাত্তরিক যুদ্ধের : স্বাধীনতার প্রাণ
প্রদানকারী যুদ্ধের : সত্যিকারের স্বাধীনতার
প্রাণের দিকেই

কমলা ন্যায় প্রতিমা সাজিত অমর, পলক
 দেয় মিলি আশিয়া হোকবত লোকের হৃদয়।
 চাহিলে যবে চাহিলে যেনেব।

জাহাঙ্গীর নাজীন বিলাসরাম বাড়ির বাসিন্দা।
 মাসেকার হান্না স্মের, বড় বাড়ির দান বাড়ির
 বড়ো বাড়ি। বাড়ি বাড়ির, বাড়ি বাড়ির
 বেড়া। বাড়ির বড় বাড়ি। বাড়ি বাড়ি
 বাড়ি। বাড়ির ও বাড়ি বাড়ির বাড়ির বাড়ি
 বাড়ির বাড়ি বাড়ির বাড়ি বাড়ির বাড়ি বাড়ির
 বাড়ির বাড়ি বাড়ির বাড়ি বাড়ির বাড়ি বাড়ির
 বাড়ির বাড়ি বাড়ির বাড়ি বাড়ির বাড়ি বাড়ির

[illegible][illegible]

"কম্পন বেলা প্রাণকে কাঁপে করিয়া যায়"
 "আশিষ্য করিল, "হৃদয়ে পতনীর হৃদয়ে চালাই"
 "দিনে ৩০"

কিন্তু অল্প দিনেই বুঝ গিয়েছিল, বি
আমর-কাজেই কবির, "বি জমি।"

"कि जानि कि सोई मंडान होत अ
कपाळ छिति कपटकुल बनिवत न। ते दि
वा-सोड " सोई मंडान होत अ
"आहा, राजा यदा ।"

100

सादा डिवा बाक-



THE

SECRET

THE



দেখুন খারিয়ারিয়া চিঠি ফলিয়া খরিয়া
কোনো কছিক, "খতীম গেলো কেনে বে?"

আরেক মুখে কসলা উঠায় ছিল, "আ
খামি কি জানি।"

"আমিও না, ছেলে বুঝায়।"

"কি লুকোয়?"

আজ্ঞা, খানার কাছে ঘুরতে চান
মুখে একটা এটা ভণ্ড বন্দে রাখি কণ্ড, খার
কাছে লুহোচা নাম পর্যায় মুখে আনতে
কেনই তার কাছে খেন এমনটা করিদিন।

কসলা বেথকে কোণে ভুগিয়া আশ্রয়
কিন্তু খারিয়ারিয়া হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে
কসলাকে পাক্তা করিয়া গোলা বন্দে বরিয়া
খরিয়া পড়িল, সে আশ্রয় দিকে একবার
চাহিয়া দেখিল—কিন্তু কিছু বাসিল না।

লুকুপী আশ্রয় পাইল, "আজ লাই, এ
কাছটা আমাকে দিবে হ। না। যতই আশ্রয়
আশ্রয় আমায়, সন টাপি কাছে—মাকে
বুঝানি আমায় দিকে বাজে প্রায় বাপা
দেব কি কাণ্ড কিনি জাই। খার, নিতান্ত
দরদর হাফে কুট, একটা দরদরকে চলকে
চেষ্টা করিস। কই, চাইতে দেখি?"

"এ বাস্তব উপর রয়েছে, নাও না।"

কাসরাফ খুলিয়া কীলখ চিঠিখলা
সে আকোপাক্ত পড়িল। হাসিয়া কহিল,
"তুই ছেলোনাছ, জুটেছে দল নয়? তুই
কি মিথ্যাস?"

"কি লিগবো আবার?"

কেন, কেন—খারিয়ারিয়া শুনে বড়
ভাবনা হয়েচে, কিবো এলো, সমস্তই নিষেকের
একটা জব্বলে বাপা-সাগরেই হোই এমন
আমায়, কিকবীজ, আর ছাড়তে পার না

কসলা কহিল, "আজ, শুধু মাঝে মাঝে
বাহিরের খিগরিয়া খুলিয়া ফেলি পাশের
কবলি।" অতঃপর, কসলাই দিকে পলকায়
খালা দিল।

কসলা তাঁ লুপে একটা দরদর
দে—কোণায় টি না পেয়ে বড় জাবদ,
চিঠি সেই বেমাঝি চিঠি খুলে খারিয়ারিয়া
বোনের আমার বড় জর। "কই, ছাড়টা
কাপিয়ে কাপিয়ে গিথিয়ান লিখিন—কিন্তু
কসলাই মুখ খানায় দিকে তাকাইয়া চাহিল,
আরো আশ্রয় কুলাইন না, হঠাৎ রপহাফ
নিরুৎসাহে সে কহিল, "না, থাক, ডাই,
আমায় কথায় চট্টিস, না?"

"কি গলর-গলর করে কতকক
বোকতেই জাখদাসো।"

কিছুক্ষণ খারিয়ারিয়া খালা কসলা
"আজ মা রেব, লাই। বেলাক পাক্তা হলো।"

"কেন, এই মাতের কো, এয়ে?"

"আ জলেকখন জাখি, উটি, কো,
আয়—"

"কাল করবে?"

"বাপু আর কারে গলর করবো, এর খার
নিজের হুজির চলবে, তাকে কার কি
ফলসে যায়।"

সৌদামিনী কহিলেন, এটি মতো ওকি
কেননা?"

"কেন, আর কি কহাজ? কিছু বাসে
না বেছিল যেনে মাতের আর বিদ্বি, খার

হুজির জেলা নিজে করে গলর বেমাঝি
আছে।"

কসলাই আশ্রয় মারক একবার
দাখিয়া পড়িল, কসলা কহিল, "আমায়

খাবে। আমারও হাদার কাছে পারিয়ে দাও।
শিখারের দিবে মন কতক তা ছাড়িয়ে দাও।

কেন কি হয়েছে ?
কিন্তু এইজন্য আর দেবোঁ পারিমে, বাপ...
হেঁতের আমায়কে তো তাড়ালে, আর যে
মেয়ের মুখে বা পর্যায় নেই, ওয়া, ভাকে
কিনা চোখের জল ফেলা... ফেলতে যেতে
হোলো—কেন, তোমো কি খাড়া নয় ? এমন
একবারেই মেয়ে আমার পেটে জন্মাবে যদি
আপো জনমতুম তো আঁতুড়বার মুন গিলিয়ে
মেয়ে গণতুম। আপ্তকুটুধের কাছে যার
অন্তে মন ছেঁটু হয়, তার মুখদর্শন করলেও
পাপ। থাক, এমতো বখাবকির দরকার
নেই, আমাকে বিদেশ করো—”

দখাবও কিঞ্চিৎ উফ উঠিয়াই কহিলেন,
“আচ্ছা, অফিস থেকে এই এলুম, এখনি কি
তোমার গলাবাঁজি না বরণে একবারেই
ফেরো না ?”

“আমিই তো বড় গলাবাণ করি, মেয়ে
একবারেই মৌনী, কথা বলেন না শুধু কানড়
লিহে জ্ঞানন। এত বড় আপ্পদা মেয়ের,
আমাকে বলে কিনা, তুমি করো কেন ? আরে
মোজা, আমি কি মাগে করি ? তোম ছেলে
বাজে বেগে কহি—আমার জাণ কদিন ?
তিনবাল্যের এক... থেকেচে, শাসাবাগে
শাসিতের হারগণ কি আমি সেরে রেখেচি ?
তোম ছেলে কতক নিতে ধাবো—আমি ?
কেন, আমার কি ছেলে কখনো হয়নি ?—
বহুদিনের বিশ্বস্ত একটা কলমওও অরক
করিয়া উঠার চোখে... এমতাবে “ভবিয়া
আসিল।

“থাক, এখন কি খাবার হয়ে পো ?”
সোদামিনী উত্তর দিলেন না।
“কেন কি পারো না ?”
“আচ্ছা, দেবে কখন।”
“তুমি যাছো কিনা ?”
“আমি পারিমে।”
কিন্তু মনে মনে না ছাড়িয়াই, বখাব
কহিলেন, “আর কিছু চাইলে না, এমতান একটু

খাটাবার জল পোতে দিও, সোদামিনী

“থেকেচি।”
“কই থেকে ?”

“আমি আর দিবে নেই।”

ঘটির জল চোখ মুচিয়া কহা ছাড়া
চাপটে মটপা কহিলেন, “কপালী, কপাল
নিষ্ঠাই মন না, নিষ্ঠাই মন।”

আজ বাদলের আর বাধাধি ছিল না
গলীর রাজে সে ঘুরিতে ঘুরিতে মশারি
জড়াইয়া কখন যে প্রদীপের কাছে গিয়াই
এবং একবারে লজ্জাকাত্ত বাধাইয়াছে বোলা
গেল না। ঘরে দৌয়া দেখিয়া মশাবাদ
সামান্য সেটুকু তজ্জাবেশ ছিল তাহাও উধাও
হইয়া যায় এবং সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য সম্পূর্ণ অসমর্থ
করিবার পুর্কেই, তিনি চীৎকার করিয়া
লালিয়া উঠেন, “ওগো, ঘরে আশুন
লেগেচে যে !”

মুহুরের মধ্যে সোদামিনী বাঁককে লইয়া
মণ্ডারের বাহিরে আসিয়া পড়িয়া কমাগকে
সজোরে এক ধাক্কা দিয়া তুলিয়া দিয়া কহিলেন,
“নে, ছেলে বর—”

কমলা চিহ্নর জন্ত একেবারেই প্রস্তুত ছিল
না—আড়ষ্ট, ওগতন্ত, সঙ্কুচিত সে বাদবাক
কালে তুলিয়া লইতে “বেন বাধা হইল
সোদামিনী জন আশিরার জন্ত ভাঁড়ার করে
ছুটিয়া গেলেন। তারপর একটা অম্বক
কোলাইল, অনন্তক হুড়াহুড়ি আর ত্রুণ বাস
পেশাসের লুককাটা শব্দ।

কিন্তু আজ এই প্রথম, কমলা জা চোখ
মেলিয়া চাইিয়া দেখিতে পারিল না, তাহা
নিগাস যেন নিঃসৃতই নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে
ছিল—কমলাও বর্গীম ছটায়, তাহারই কোলাই
ওইরা, তাহারই লজ্জাকাত্ত বদল, তাহারই
দিকে চাইিয়া সে কি হাসি...
ওই জা, আপ্পদা, মশাবাদ...
ওই ত্রুণপরিচিৎ মটু বিবাস...
মণ্ডারের পলাইয়া—মণ্ডার

কালো বো

শ্রীমানিক ভট্টাচার্য্য কি এ. বি. টি.

তিনি যখন বলিলেন নিচুন এক ব্যাগিষ্টার
অপেক্ষায় বসে আত্ম ভ্রমে ওগালে বেড়িয়ে
আমি তখন যে বিজয় বাবুকে দেখিব তাহা
সেটেই ভাবিলাম। প্রথমটা সত্যই একটু
চমকিতা উঠিয়াছিল। ভাগ্যে উনি সেটা
দেখিতে পান নাই—নহিলে হয়ত একটা
সিদ্ধান্তে বলিতে হইত।

মৎস্যের দশ হইয়া গিয়াছে, বিজয় বাবু
তোহা প্রায় ভেঁসনই আছে। মুখের সেই
যে একটা কঠিন ভাব, বাংলাকে অন্তলোকে
কলে দুলুতা, কিন্তু আমি বলি অহঙ্কার
সেটা সেইরূপই আছে।

তাহার ক্রীকও দেখিলাম পূর্বকথা
আমি ত বেশি করিয়া মনে পড়িয়া
গেল। এতদিন পরে আবার মনে সেই
কিছোর ক্রোধের উদয় হইল। সেদিন
মৎস্যের রূপ, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের উৎস
যে একটা তাহিলোর সঙ্গত অন্তর
কল্পিতাম, সেটা মনে আবার স্বাভা-
বতর কল্পিতা বাজিল। তাহার দ্বী অন্ততঃ
কিছু সুন্দরী হইলেও মত ততক্ষণ মনে
হইত না। কিন্তু ইনি একবারে 'কালো'
—নাম না জানিলে 'কালো বো' বলিয়া
উচ্চারণ চলে।

আমি তখন তখন ছই বিজয় বাবুকে
দেখিলাম। তখন তিনি কি এ পরীকার
করিয়া গিয়াছিলেন। সেইরূপ বিলাত
হইত। তাহা হইল তাহাকে। তাহা

আমার কাছে বাবা আমার সহিত উহার
বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। উনি
আমার বাড়ী আসিয়াছিলেন; আর ঐ মানাই
তাঁহার সংসারে একমাত্র আশনার বলিতে-
ছিলেন। নামটি একটু অল্পত প্রকটন
লোক। অপরের প্রতি তাঁহার কি কতখান
সেইটুকু করিয়াই শুধু দ্বন্দ্ব হইতেন।
অপরের উপর তাঁহার কি দাবি তাহার
হিসাব কোনো দিন রাখিতেন না। বাবী তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা ই কথা বলিতেই তিনি বলিলেন
'এ তো সৌভাগ্য। আপনার দয়া। আমি
বিজয়কে জিজ্ঞাসা ক'রে কালই একথা
আপনাকে বলে যাব।'

পর দিন আমিও তিনি বলিয়া গেলেন
যে বিজয়ের উচ্চারণে অনিচ্ছা। বাবারও
কি বকম নৌক হইয়াছিল। তাঁই পুনরাব-
তিনি বলিলেন—'তুমি বোধ কর তেমন করিয়া
বল নাই। নহিলে অনিচ্ছার কি কারণ
হইতে পারে। আমার মেয়ে খুব সুন্দরী,
আমি গরীবও নহি।'

তাঁহার নাম একটু ইতস্ততঃ করিয়া
বলিলেন—'সে বলে খুব ধনী, মেয়ে বা
খুব সুন্দরী মেয়ের সে উপযুক্ত পাঠ নহে।'

বাবার ছোখ মত হইয়া লাল হইয়া
উঠিল। আপনাকে ঠিক যেনাশুটি মত
করিতে পারিলেন না। একটা তাহার কল
তাঁহার স্বামীর প্রতির শোকে। বাবার
একটু বেশী কলমারই বেশী কলমার হইত।

আমিও সেইরূপে আসিলাম।
কিন্তু আমি দেখিলাম সেই কবিদের পাঞ্জাবী
আর চিত্রও। তাঁদের দ্বী আরও একটু
উপরে উঠিয়াছেন। বাঙালি দেখিলাম খালি
পায়ে থাকেন। হাফ, গফারমান বলিলেও
চলে। স্বামীক বিশেষ অধ্যয়ন থাকিলেও অল্প
পুরস্কারে সন্তুষ্টে বাহির হন, নহিলে নয় কথা
বাঁহাণের দরর কথা। নাম কবিতা ন
‘অদুর্ভাগ্য’। ও নামটি আর গাফিল নন।
‘না’ আমি ‘কালো’ সেই বলিব।

গাফিল হিন্দুদের মহ কাণো বৌ আমাদের
প্রণাম করিল। তাৎপদ স্বরূপে তা প্রাপ্ত
কবিরা আমাদের কজনকে ও বিজয় বারকে
মিল। আমান আমান। যেন এটুকু হাল নাগিয়া।
আমিরা বসিলাম—‘আমনি খায়ে ন্য, যখন
তখন আপনাবা হের কষ্ট ব’লে ঐশ্বরী কব
পেয়ে আমাদের পক্ষা করচো।’

কাণো বৌ আমান স্বামীর গানে একবার
জাহিরেই আমান গিয়া উঠিলেন উনি ‘চি
খান না।’

আমরা গল্প করিতে করিতে তা গান
করিতেছিলাম। বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম
কাণো বৌ তাহার স্বামীর বধ্যবস্ত্রা শুনিতে
শুনিতে এক ইকবাৎ তরঙ্গ হওয়া লাইতেছে।
পদ্য সত্যই চকু উঠিতে, এমন একটা
জোয়ারে ফুটিয়া উঠিতেছে যাতে অত কাল
নাথকেও এক একবার মুন্দর বলিয়া ‘না’
কহিতেছে। আমান স্বামীর চকু সেটুকু
প্রভার নত। তাহার মনোভাব একটা
গাফিল।

কাণো বৌ নিজেই হইতে বধ্যবস্ত্র বড়
একটা কাল নাই কিছু নিজস্ব করিলে

খুব শিষ্টভাবে উত্তর দিয়াছে। এই পর্যন্ত।
এমন সময় একটা বছর ‘পোচকের’ জেজ
আসিয়া কাল বোকে আড়াইয়া গিয়া বলিল—
‘না আর পড়াবে না?’

কাণো বৌ জেজকে দূরে তুলিয়া মুখে
চুষন দিয়া বলিল—‘আজ পদ নিয়ে পেনা
করণে। আজ ও দেখা পড়াবা। তাৎপদ
কাণো বৌ চুপি চুপি কি বসিয়া দি,
জেজটি কোন বসন্ত নাগিয়া আমাদের
জুতার ওত দিয়া পথায় করিয়া চানিয়া পেনা।
বেশ জেজটি।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—‘এব কথ
যাটার বাগেন নী?’ বিজয় বাব বলিলেন—
‘না’। আমান স্বী নিজেই পড়ান। আরও
এসে তা দেওয়া, তাহা য় ১০৫ বাঁচাওয়া
নিজে জেজ পড়ান। আমান স্বামী
বড়ই বাড়াবাড়ি বলিয়া পেনা হইতে। তাহার
উপর অল্প আশ্রয় সন্তুষ্ট প্রাপ্ত সব
সময় স্বামীর কাছে দাঁজন বা তাহার
মথের গানে চাইয়া থাকে।—‘একটা বদ
অশোভন গাফিল। আমিকে এবার তাহা
বাসিয়া থাক। সেটা আর তাহার করিবার
ক’ দরকার না।’

ওই বকিতে উপবাস্য হইতে লাগিল।
আমি কাণোকে বলিলাম ‘তখন আপনাব
বাড়ী তিনের দেখিয়া আসি।’

ভিতরে আসিয়া নিপুণতামানী কেথিয়া
নিয়িত হইলাম। কালী পাছ পূজা করি
বার এই পর্যন্ত আছে দেখিলাম। আমি
আগেই শুনিয়াছিলাম জিজ্ঞাসে কোন যত্নে বিজয়
বাব জুতা পরে যান না। বাঙালি জুতা রাখিয়া
বাঙালি পায়ে নাকি গরে প্রবেশ করিতে হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “রান্নাও ক’তে হয় নাকি?” কালো জোঁ বালিক—“একটী তর-কারি রান্না, মিলে ওর ডাল খাওয়া হয় না।”

“বলেন বড়ি রান্নাও? খেতে পারি না ব’লে বলাই হ’ল একরকম।”

“না তা কিছু বলেন না। এটা ভাল হয়নি, বা এটা আমি খেতে পারি না—এ সব কথা জুখনো ওর সুখে শুনি নাই। ভোগবিলাস ওর কিছুই নাই।”

“এ বড়ি মন দিয়ে মন বুঝ করেন? আচ্ছা আপনি ত’ এত করেন। এর পর-বর্ত্তে উনি কি করেন?”

“ও’র ভালবাসা প্রশান্ত সাগরের মত।
হঠাৎ হিরে কিন্তু দিগেরে তাসীল। এ

আমাকে না ক’তে দিলে আমি হুঃখ যান সেইজন্য বারশ ক’তে পারেন না। কোনো রকমে আমি ও’র যোগা নই—আমার চেহারা দেখেই তা বুঝতে পাচ্ছিন। তা ও’র এত ভালবাসা।

কালো বোয়ের চক্ষে অশ্রু ফুটিয়া উঠিল আমি অন্তরিক্তে বুঝ ফিরাইয়া হাসিলাম।

উঠিবার সময় কালো বোঁ আমাদের তজনকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

মোটরে কিরিবার পথে স্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কেমন দেখিলে?” আমি নাক সিটকাইয়া বলিলাম—“বজ্র সেকেনে।”

তিনি একটু গম্ভীর হইয়া শুধু বলিলেন—
“ভাঁ।” (ক্রমশঃ)

বৈচিত্র্য

শ্রী আময়চন্দ্র চক্রবর্তী

(ক)

১। “স্বরোপ মানুষের সব জিনিষকেই বিজ্ঞানের স্তরকথেকে খাচাই করচে কিন্তু মানুষ পদার্থটা যে কেবলমাত্র দেহতত্ত্ব, কিম্বা জীবতত্ত্ব, কিম্বা মনতত্ত্ব, কিম্বা বড় জোর সমাজতত্ত্ব নয়, লোহীটী তোমাদের সেকথা কুলো না।” (ববীজনাথ)

২। বিজ্ঞানের আধুনিক পদম পানিশব্দে আগে পৃথিবীতে যে সব দৃশ্যবিরোধ হত সে-বেন একটা ঘরে অনেকগুলি ছুরক চেলে কুটলে বেমন বগড়াবগড়ি করে তেজনি। তারা পদম্পরের সেইটুকুই অনিষ্ট করতে পারত যেটুকু শুধু নিজের শক্তির দ্বারা করা সম্ভব। বর্তমান যুগ কি করেছে? না

সেই ছুরক চেলেগুলির প্রতি জাতীয় দেহ পরবশ হয়ে এক বার্থ মঙ্গলকামনার পরি পূর্ণ হয়ে তাদের কাছে এসে বলেছে—“ওগে ছোট ছেলের দল, বর্তমানের এই সভ্যতার যুগে জায়া শেষে কিনা তোমরা সেকেরে বকলদের প্রথা অনুসারে ঝুলহ করছ?—এও কি তোমাদের মানায়?—তোমরা মাছ সব মত, বুদ্ধমানের মত, সভ্য, সুখের সুসভ্য জীবনের মত আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিজ নিজ মনোমালিন্য দূর করতে লোণ বাও, আমবাও বেশি, আমাদেরও দেখে একটু সুখ হোক!”—এবং এই বলে অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষীর মত আনন্দদীপ্ত মুখে তাদের প্রেক্ষাগরে একেবারে নতুন কলে মতন

শিল্পের তৈরী চক্ৰকে বিষয়বাহিনী ছোঁয়া ছুঁটি
আশুগ্ন রাগানো বোমা, বিষয়বাহিনী যন্ত্রপাতি
প্রভৃতি যুদ্ধবিহারণ ও শাস্তিরক্ষণের বিচিত্র
অধ্যাত্মিক কাজসরঞ্জাম বেশ বগেই পড়িয়াছে
দিয়ে গেছে।

এইবার যন্ত্রকার বহুরূপ হয়েছে বড় এবং
হার নেশাও জমেছে খুব, এখন শাসক-
মীনাসার একেবারে পূর্ণ সমাধানের সমস্ত
বুঝি এল বলে। (ওয়েলস্)

৩। সভ্যতার সম্পর্কে সবে তার বিশদ ও
হাতে হাতে এগিয়ে চলেছে। (নেটারথল্ড)

৪। কোথাও একটা কাজ খুব দ্রুতভাবে
কোনোমতে সবে কেউতে চেষ্টা করলে
সেটা শীঘ্রই অতি পুরাতন এবং জীর্ণ হয়ে
পড়ে। এই কারণেই আধুনিক কলকার-
খানার সভ্যতা এত “উন্নতি” হওয়া সত্ত্বেও
তার সঙ্গে মানুষের আদিম বর্জ্যতার এমন
একটা সৌন্দর্য্য চোখে পড়ে। (চেস্টারটন)

৫। আধুনিক যুগকে শিক্ষা এবং
উন্নতির মধ্যে ঘোড়দোড় বলতেই চলে,
দেখা দিতে কে জেতে। (ওয়েলস্)

৬। কিন্তু জাইভারটার মোথার বাড়ি
দিলেই যে এঞ্জিনটা তখন আমার বশে
চলবে এ কথা মনে করা ভুল। বস্তুতঃ
জাইভারের সৃষ্টি ধরে ওখানে একটা বিস্থা
এঞ্জিন চালাচ্ছে। অতএব শুধু আমার
রাগের আশুগ্নে এঞ্জিন চলবে না, বিস্থাটাও
দখল করা চাই, তাহলেই সত্যের বর পাব।
(রবীন্দ্রনাথ)

৭। বিজ্ঞানের জগতানে ভলে স্থলে
মাকালে আজ এত পথ খুলেছে, এত রূপ
ছুটেছে যে ভুগোলের বেড়া আজ আর বেড়া
নেই, আজ কেবল নানা ব্যক্তি মন, নানা জাতি
কাছাকাছি এসে জুটল, অন্তিম মানুষের
সত্যের সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞা-

নিকশক্তি বাদের একত্র করতে তাদের এক
করবে কে? (রবীন্দ্রনাথ)

৮। যে সমস্তা এবং সত্যের সহজ
উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হয়ে এগিয়ে চলেছে
সেটা আমাদের সমস্ত অসুস্থ কল্পপ্রবণতা,
সমস্ত চিত্তশীলতা এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির
উদ্বোধন। জ্ঞান আমাদের সমস্ত সাধনার
একটা আত্মসাহাযী মল। বিশ্বজগতের সঙ্গে
এই অস্থানিক বাস্তব জিনিষের এ বিষয়ে
মিল আছে; বাক্যের অর্থ বাক্যের বাক্যে দেখে
লেই তাকে দেখা যায়। একবার জ্ঞানের
পরে তাকে প্রথম দেখি। পৃথিবীর নানা
জিনিষকে বস্তুগতভাবে এবং সংলগ্নভাবে
সংগঠন করা যায় ওই তাদের ভিতর-
বার মত একা হস্তের সন্ধান মেলে, এবং
ততই তাদের জটিলতা দূর হয়। সত্যের
প্রকাশ চিরদিনই আশ্চর্যজনক এবং উদ্ভেলক।

এইজন্তে একেশ্বরবাদীতার চেয়ে চিরবিশ্বর-
কর জিনিষ আর বিস্তার নেই;—যেন নানা
অসংলগ্ন সামঞ্জস্যহীন রেখা সমস্তির দিকে
তাকাতে তাকাতে তারা চোখের সামনে
এক একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা
বিশেষ স্থানবন্দে পরিণত হয়ে উঠে।
(চেস্টারটন)

প্রাচীন কালে একদল ধর্ম্মবীর কাছে একবার
হয় গিয়ে চিরকালের মত চুকে বুকে ধার তা
নয়, এতোক কালের যোকের কাছেই বাধার
ভিতর দিয়ে আঘাতের ভিতর দিয়ে সত্যকে
নতুন করে আবিষ্কার করে হবে। (রবীন্দ্রনাথ)

১২। মানুষের আদর্শের যেমন সত্য
সেই আদর্শের ব্যাঘাতও তেমনই সত্য—মাহাত্মা
সই ব্যাঘাতের ভিতর দিয়েই যেন যেমন
আদর্শের দেখিতে সা পায়ে, তেঁাৎ বুজিয়া স্বপ্ন
দেখা জাড়া তাহাদের আর গতি নাই।
(রবীন্দ্রনাথ)

